প্রথম প্রকাশ
১৯৬০

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাত ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

শুভঙ্কর বসু
জে. জি. প্রিণ্টার্স
১৮৯ অরবিন্দ সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬

এক

এক

যদি সেদিন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন না হতো

জঙ্গি শাসনের দুরাচার আমাকে বিবমিষাযুক্ত করে, বাংলাদেশে যা-যা ঘটছে, তার অনেক-কিছুতেই আমার সায় নেই। তা হ'লেও এই স্বীকারোক্তিতে গলা কাটা যাবে কি, দূরদর্শনের অনবচ্ছিন্ন হিন্দিবিক্রমে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, ইদানীং প্রায়ই আমি বোতাম ঘুরিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের আশ্রয় যাচ্ঞা করি, পরিমার্জিত বাংলা বচন শুনতে পাই। হয়তো কোনো আলোচনা, হয়তো কোনো শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, নয়তো কোনো কথিকা, অথবা অনেক-অনেক ক্ষণ ধ'রে রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের গান প্রতি মুহূর্তে আমার মাতৃভাষার আস্বাদে হ্লাদিত হই। কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় বেজিংয়ে এক ভোজসভার ছবি ভেসে উঠলো। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতা চীন সফরে গেছেন, তাঁর সম্মানে ভোজ, প্রথামাফিক ভাষণ-প্রতিভাষণ হচ্ছে। হুসেন মহম্মদ এরশাদ অতি-পরিচ্ছন্ন বাংলায় তাঁর ভাষণ পড়লেন। আমার দেশের নেতা নন, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিনিময়-প্রতি-বিনিময়ের প্রাঙ্গণে আমাদের ভাষা, আমার মাতৃভাষা, বাংলা, সুপ্রবিষ্ট, হলোই বা তা পরস্মৈপদী আনন্দ, সেই আনন্দের কথা আমি লুকোতে যাবো কেন? এবং আনন্দের সঙ্গে মিশ্রিত যে-খেদ তথা বিষাদ, তার কথাই বা? নিজেকে চোখ ঠেরে কী লাভ, নিজেদের দেশে, ভারতবর্ষে, আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে আমরা একটু কুঁকড়ে আছি। হাজার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, হাজার বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নন্দিত ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত আমরা। বৃহত্তর সত্তায় নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে এক মস্ত চরিতার্থতাবোধ, তার স্পর্শে আমরা ধন্য। বিভক্তির মধ্যে ঐক্য আমাদের অন্বিষ্ট, ক্ষুদ্রতর সরোবরের মোহ পরিহার ক'রে এক মহাসমুদ্রে জলকেলি সম্পন্ন করার দিকে আমাদের আগ্রহ, ইতিহাসের কাছে আমরা সেই অঙ্গীকার করেছি। তা হ'লেও মাঝে-মাঝে ঈষৎ অন্যতর এক আবেগ মাথা ঝাঁকুনি দেয়। ঠিক এমনটি তো কথা ছিল না, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি তো অন্য রকম ছিল, হিন্দি আমাদের দেশের অন্যান্য ভাষার গলা টিপে মারবে, আমাদের সরকারি প্রচারপ্রতিষ্ঠানে ঐ ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে, অন্য প্রত্যেকটি ভাষা দুয়োরানী, স্বাধীনতা-উত্তর যুক্তরাষ্ট্রীয় যে-ভারতবর্ষের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তার সঙ্গে তো বাস্তবায়িত ঘটনাবলীর কোনো মিল নেই। পশ্চিম বঙ্গে, এবং আশেপাশে আরও ছড়ানো নানা রাজ্যে, সব মিলিয়ে এই ভারতবর্ষে আমরা ছ' কোটিরও উপর বঙ্গভাষী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে-শ' দেড়েক সদস্য-রাষ্ট্র, মাত্র গুটি দশ বাদ দিয়ে তাদের অন্য সকলের জনসংখ্যা আমাদের জনসংখ্যার

চেয়ে কম, তারা দিব্যি নিজেদের ভাষায় অবাধে কলকল কথা বলতে পারছে, নিজেদের বেতার-টেলিভিশন কেন্দ্র খুলতে পারছে, অথচ আমাদের ক্ষেত্রে সে-গুড়ে বালি, এমন ধারা তো হবার কথা ছিল না, কিন্তু তা-ই হয়েছে।

অদ্ভুতকিম্ভূত ব্যাপারস্যাপার। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের মানুষজন লাঠি-গুলির মুখোমুখি হয়েছে, তরতাজা অনেক প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে, তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়ানো মাতৃভাষা, বাংলাভাষা সম্পর্কে গর্বঅভিমানভালোবাসা। এখন সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার চর্চা, মাতৃভাষার সুপ্রোথিত প্রতিষ্ঠা। অথচ আমাদের পশ্চিম বঙ্গে হইরই কাণ্ড, যে-মুহূর্তে রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেন প্রাথমিক স্তর থেকে একমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে, ঢিঢিক্কার প'ড়ে গেল, এমন সর্বনেশে কথা নাকি কেউ কোনোদিন শোনেননি, শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবিস্তার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পরিখা তৈরির আয়োজন-উদ্যোগ শুরু হলো, শিক্ষাবিদ্-সাহিত্যিক-নানা রথী-মহারথীর সমাবেশ ঘটলো, অনেকটা আগে-কে-বা-প্রাণ-করিবেক-দান গোছের উন্মাদনা পশ্চিম বঙ্গের মধ্যবিত্ততালাঞ্ছিত আকাশে জড়ো হ'তে লাগলো।

এখন অবশ্য বিতর্কটি থিতিয়ে গেছে। মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষাদানের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কিছুটা নিশ্চয়ই করা হয়েছিল নিছক রাজনীতিগত অসূয়া থেকে, যাকে দেখতে নারি, কে না জানে, তার চলন বাঁকা। কিন্তু মার্ক্সীয় বীক্ষণ তো পাশে সরিয়ে রাখা চলে না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বাবা-মা'র মনে তো যথার্থই ভয় ঢুকেছে, সাংসারিক হিশেবগত ভয়, বাংলাভাষায় পড়াশুনো চালু হ'লে হিন্দি-ইংরেজিতে সন্তান তেমন দক্ষ হ'তে পারবে না, পরিণামে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে, ভালো চাকরিবাকরির আশা তা হ'লে পরাহত।

বৈদেহী ভাবনায় নিজেদের পুষ্ট ক'রে নিয়ে আমরা এই মানসিকতার নিন্দা করতে পারি, মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশ কত 'বিজাতীয়' হচ্ছে তা নিয়ে কপাল চাপড়াতে পারি. কিন্তু অপত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন বাবা মাকে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায়, কোনো বিকল্প পরামর্শ সত্যিই কি আমরা দিতে সক্ষম? তাঁদের মনে যদি একবার ভয় প্রবেশ করে, গরিবগুরবোদের লেখাপড়া শেখাবার পণ্ডশ্রমে রাজ্য সরকার অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শ্রেণীভুক্তদের সর্বনাশ ঘটাবেন, মাতৃভাষা নিয়ে নাচানাচি করতে গিয়ে হিন্দি-ইংরেজিকে অবহেলা করবেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা এই অবিমৃষ্যকারিতার ভুক্তভোগী হবে, এই ভয়ের যে বাস্তবভিত্তি আদৌ নেই তা তো বলা চলে না। জাতীয় অর্থব্যবস্থার সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর হাতে, তাঁরা হিন্দি-ইংরেজির সংকীর্ণ বলয়ের বাইরে নজর দিতে আগ্রহী নন, এবং দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন নয় যে মত পরিবর্তনে তাঁদের বাধ্য করানোর সম্ভাবনা হঠাৎ উদয় হবে। বাংলাদেশে

যা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ, আমাদের পশ্চিম বঙ্গে আপাতত তা-ই অলীক আকাশ-কুসুম। বেহদ্দ বোকা না হ'লে কেউ এখানে মাতৃভাষার সম্মানরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গে সম্মত হবে না, স্কুলকলেজ থেকে মাতৃভাষা হটিয়ে বিদায় করা হোক সেরকম কোনো আন্দোলন সংঘটিত হ'লে তাতে সোৎসাহে যোগদানের উদ্দেশ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবক বরঞ্চ সহজেই মিলবে।

এই বিমর্ষ সিদ্ধান্ত থেকে অবশ্য অন্য চিন্তায় পৌঁছে যেতে হয়। ইতিহাস তো নিজের থেকে ঘটে না, সাধারণ মানুষই ইতিহাস রচনা করেন। পশ্চিম বঙ্গের, এমনকি, গোটা ভারতবর্ষের, ইতিহাসও সম্পূর্ণ অন্যরকম কি হ'তে পারতো না যদি, বিংশ শতকের গোড়ার দশকে, আমাদের পিতৃপিতামহেরা যা ভাবছিলেন এবং করছিলেন, ঠিক সে-রকম না ভেবে, সে-রকম না ক'রে, ভাবনাকর্মপ্রবাহে একটু ভিন্নরকম উদ্যমের আগ্রহ দেখাতেন? রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবশ্য বকুনি দিয়েছেন, 'কী হবে আর কী হবে না, কী রবে আর কী রবে না' সেই উটকো চিন্তায় সময়ক্ষেপণ না করতে; কী হলো অথবা কী হলো না, কী হ'তে পারতো কিন্তু হ'তে দেওয়া হলো না তা নিয়ে জল্পনাও হয়তো তাঁর বিবেচনায় অসমর্থনযোগ্য। যদিও পিছনে ফিরে গিয়ে নতুন ক'রে ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়, অতীতে-কৃত ভুলগুলির বিশ্লেষণ থেকে আমরা তো অন্তত ভবিষ্যতের জন্য কিছু-কিছু নিশানা খুঁজে পেতে পারি। সুতরাং ঈষৎ কল্পনাবিলাসিতার পক্ষে মোটামুটি একটি যুক্তি দাঁড় করানো তেমন কঠিন নয়; মানুষ ইতিহাস রচনা করেন, কিন্তু অন্য পক্ষে ইতিহাসও তো মানুষকে কান ধ'রে এটা-ওটা শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়।

১৯০৫ সাল আধুনিক বাঙালি চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশে আছে। ঐ বছরটি, লোকপ্রবাদ যদি বিশ্বাস করতে হয়, বাঙালির পক্ষে গভীর শোকের স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু বাঙালি উজ্জীবনের অধ্যায়ও নাকি ঐ বছর থেকেই শুরু, একটি কাহিনী কার্যকারণ সম্পর্কসূত্রে অন্যটির শরীরে বিধৃত হয়ে আছে। বঙ্গভঙ্গের বছর ১৯০৫ সাল। কার্জন সাহেব বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, পূর্ববঙ্গ ও অসম নামে একটি নতুন প্রদেশ তাঁর ফরমানে গঠিত হলো। কী ছিল বিধাতার মনে তা নিয়ে এখন চর্চা চালিয়ে তেমন লাভ নেই। হয়তো প্রশাসনিক স্বার্থে যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পঞ্জাব থেকে বড়োলাট অলগ্ন করেছিলেন, ঐ একই উদ্দেশ্যে বাংলার উপর দিয়েও তিনি অনুরূপ পরীক্ষা চালাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। অথবা হয়তো তিনি বাঙালি হিন্দু জমিদার সম্প্রদায়কে একটু লেজে খেলাতে চেয়েছিলেন। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিসংবাদ সৃষ্টি ক'রে শাসন কায়েম রাখা তো সাম্রাজ্যবাদীদের অতি ধ্রুপদী কৌশল: হিন্দুরা একটু বেশি তড়পাচ্ছে, বাংলাদেশের হিন্দুরা বিশেষ ক'রে; ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া যাক, এমন মানসিকতা সত্যিই হয়তো কার্জনের উপর ভর করেছিল। তবে এটাও হ'লে হ'তে পারে, পূর্ব বঙ্গ ও অসমের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্তদের অনগ্রসরতা তাঁকে ভাবিত করেছিল,

তাঁদের ঘনঘোর তমসা থেকে ঈষৎ জ্যোতিতে উত্তরণ করবার নিকষ লক্ষ্য মনে রেখেই কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

কোথায় যেন উল্লেখ দেখেছিলাম, এই শতকের গোড়ার দিকে অখণ্ড বঙ্গদেশ থেকে জোতদার-জমিদাররা প্রতি বছর আট থেকে দশ কোটি টাকার মতো উদ্বৃত্ত ছেঁকে তুলে আনতেন, এই উদ্বৃত্তের নির্ভরেই বাঙালি হিন্দু উচ্চ-ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের জীবিকার সংস্থান করতেন। এই টাকার পরিমাণ এখন পরিহসনীয় তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু তখনকার মূল্যমানের হিশেবে আদৌ তা নয়। লর্ড কর্নওয়ালিস-কৃত মৌরসি পাট্টায় একশো বছরের বেশি সময় ধ'রে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকেরা অভ্যস্ত, বঙ্গভঙ্গের তাৎক্ষণিক পরিণাম নিয়ে তাই তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। পূর্ব বঙ্গ ও অসম আলাদা প্রদেশ হয়ে যাওয়াতে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অবশ্যই খানিকটা ক'মে আসবে, মুসলমানরা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাবে, একটু-আধটু লেখাপড়া শিখবে, সরকারি চাকরি-ইস্কুল মাস্টারি-পাট ইত্যাদি সংক্রান্ত সদাগরি দফতরে ভাগ বসাবে; এধরনের অঘটন ঘটতে শুরু করলে ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে বলতে পারে। অর্থকরী এই বিশ্লেষণ মনে চাপা রইলো, যা প্রকাশ্যে রূপ পেলো তা সদ্য-ইংরেজি বই-প'ড়ে-রপ্ত-করা ন্যাশনালিজমের বাঙালি হিন্দু রূপকল্প। জননীকে রামদা দিয়ে কেটে দু' টুকরো করা হয়েছে: বাঙালি রোমকূপ শিহরিত করবার পক্ষে এই কল্পনাই যথেষ্ট। হুলুস্থুলু প'ড়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলন সূচিত হলো, মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত বাঙালি যুবকরা আখড়া খুললেন, বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করতে শিখলেন। বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ ছুটে এলেন। তাঁর অনুজ কয়েক মাস আগেই এসে গিয়েছিলেন, তিনি স্বদেশী ডাকাতিতে হিন্দু যুবকদের মক্সো করিয়ে দিলেন, বোমা-গুলির অধ্যায় শুরু হলো, ক্ষুদিরাম বসু—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে ঝুললেন, অগণিত আরো অনেকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। বাঙালির ঘরে-ঘরে প্রতিনিয়ত অরন্ধন, বাঙালি হিন্দু মহিলারা অবিশ্রান্ত শঙ্খ বাজালেন, উলুধ্বনি দিলেন। বঙ্গভঙ্গ মহাপাতক, এ বড়ো শোকের দিন বাঙালিদের, ওঠো, জাগো, এই পাপকে দূর করো, অঙ্গীকৃত হও, মন্ত্রের সাধন, অন্যথা শরীর পাতন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও নিশ্চেষ্ট রইলেন না, রাজপথে নেমে এসে তিনি রাখীবন্ধনের আয়োজনে নিযুক্ত করলেন নিজেকে, একটার পর একটা গান লিখলেন, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, এক হউক, এক হউক হে ভগবান—' স্বদেশী গানের তালিকার শীর্ষে চ'ড়ে বসলো।

বিলেতে জমানা বদল ঘটলো, কার্জনের বিরোধীপক্ষভুক্তরা সরকার গঠন করলেন, ভারতবর্ষে একজন মোলায়েম-ধাঁচের ভাইসরয় পাঠানো হলো। ১৯১১ সালে মহামান্য ভারতসম্রাটের নামে পর-পর দুটো ঘোষণা বাঙালি ইতিহাসকে নতুন খাতে বইয়ে দিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো, অসম আলাদা প্রদেশ হিশেবে

থেকে গেল। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ ফিরে এলো বঙ্গদেশের অঙ্কে। অথচ, পাশাপাশি, অন্য যা মস্ত সিদ্ধান্ত, বঙ্গভঙ্গরহিতসংগ্রামবিজয়ী আনন্দে-পাগল-হয়ে-যাওয়া বাঙালিরা আমলই দিলেন না যাকে, তা ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার : রাজধানী চ'লে গেল যাক, জননীর বক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সন্তানকে তো ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। ১৯১১ সাল বাঙালিদের বড়ো আনন্দের বছর। সদ্য-সিংহাসনে-সমাসীন পঞ্চম জর্জের কাছে ভূম্যধিকারঅভিমানমণ্ডিত হিন্দু উচ্চবর্ণ-ভুক্তদের কৃতজ্ঞতার অবধি রইলো না। রবীন্দ্রনাথ-কথিত ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে মুচকি হাসলেন।

এখন যখন দূরদর্শনের আর্যাবর্তঅহমিকার পরাক্রম থেকে সাময়িক পরিত্রাণের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে পলায়নপর হই, ঢাকা থেকে উচ্চারিত নিটোল বাংলা ভাষার আস্বাদে প্লাবিত হই, আমাদের পিতৃপিতামহদের দূরদৃষ্টিহীনতাকে দুয়ো দেওয়ার ইচ্ছা সংবরণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাঁরা যদি বঙ্গভঙ্গজনিত সম্ভাব্য শ্রেণীগত ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়কে একটু কম গুরুত্ব দিয়ে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে গোটা বাঙালি সম্প্রদায়ের শিক্ষাশ্রীসম্পদবিকাশের সমস্যার চিন্তায় নিজেদের যুক্ত করতেন, তা হ'লে কি সম্পূর্ণ এক অন্য চরিত্রের রাজনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্যে নিজেদের দেখতে পেতাম না আমরা? কল্পনা করুন, জমিদারদের আর্তনাদের সঙ্গে গলা মেলালেন না মধ্যবিত্ত হিন্দু যুব সম্প্রদায়, তাঁরা বঙ্গভঙ্গ সাদরে বরণ করে নিলেন এই বিবেচনা থেকে যে ব্যাপক মুসলমান গণজাগরণের তা মস্ত সহায়ক হবে, যে-জাগরণ থেকে বাঙালি-সমেত সমগ্র জাতির সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক প্রগতি তীব্রতর হ'তে বাধ্য। কার্জন সাহেবের ফরমান টিঁকে থাকতো, কিন্তু একমাত্র ভূম্যধিকারী শ্রেণীর তাৎক্ষণিক দুর্ভোগ ছাড়া তার অন্য-সমস্ত ফলই শুভব্যঞ্জক হতো। পূর্ব বঙ্গ ও অসম জুড়ে লক্ষ-লক্ষ মুসলমান কৃষকপ্রজা পরিবার শতাব্দীর গোড়া থেকেই একটু মাথা তুলবার সুযোগ পেত; তখন থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটতো, সরকারে এবং সরকারের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত মুসলমানরা একটু-একটু ক'রে চাকরিতে প্রবিষ্ট হতেন। অর্থাৎ যা-যা ঘটেছিল তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, তাদের পটভূমিকা সিকি শতাব্দী এগিয়ে যেত। অতএব আত্মবিশ্বাসে-স্থিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের জন্য আর দেশভাগের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন হতো না, প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হবো-হবো, তখন থেকেই এই শ্রেণী, পূর্ব বঙ্গ ও অসমের নিশ্চিন্ত সংস্থানে দাঁড়িয়ে, নিজেদের বিজয়কেতন ঊর্ধ্বে তুলে ধরতেন, উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের হীনমন্যতাবোধের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়তো। এবং বাংলা ভাষাকে জড়িয়ে তাদের ভালোবাসা-স্বপ্ন দেখার পালা শুরু হতো একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মাহুতির ইতিহাসকে অলিখিত রেখে পঞ্চাশের দশকের অন্তত দুই যুগ আগে থেকে। বাংলা তো ব্রাহ্মণ্য-

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র কাকোটিদের কাহিনী

চিঠির তারিখ ১৯৪৭ সালের একুশে জুলাই, অর্থাৎ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির মাসখানেক আগে। গোপন চিঠি লিখেছেন ভারতীয় চা সমিতির অসম শাখার শ্রমিক সম্পর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। অধিকাংশ চা বাগানে, কী বাংলায়, কী অসমে, কী দাক্ষিণাত্যে, তখনও বৃটিশ মালিকদের একচ্ছত্র প্রতাপ, সাম্রাজ্য-বাদী শোষণের প্রতিভূ তাঁরা। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসন্ন, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিদেশী প্রভুদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে, মাউণ্টব্যাটেন তাঁর হাতের ব্যাটন কার হাতে অর্পণ ক'রে যাবেন তা আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে আসছে।

সাম্রাজ্য যায়, কিন্তু সাম্রাজ্য গেলেও শ্রেণীস্বার্থ টিঁকিয়ে রাখার ব্যাপার থাকে। সুতরাং গোপন চিঠি দিচ্ছেন বিদেশী চা-বাগানের মালিকদের সংগঠন ভারতীয় চা সমিতি; চিঠির প্রাপক অসম প্রদেশের প্রত্যেকটি চা-বাগানের ম্যানেজার। চিঠির হুবহু বয়ান :

"প্রিয় মহাশয়,

বিষয় : শ্রমিক সম্পর্ক

"১। ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে অসম উপত্যকায় চা-বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব শিবসাগরের শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র কাকোটির উপর অর্পণ করা হবে।

"২। শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র কাকোটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিগত ৯ই জুলাই, ১৯৪৭ তারিখে এক সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় আপনাদের শাখা সভাপতি ও শ্রম উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় বাছাই করা কিছু শ্রমিকসংগঠক কর্মীর নাম সমস্ত চা-বাগান ম্যানে-জারের কাছে পাঠানো হবে। এই কর্মীদের প্রত্যেকের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র কাকোটির সই-সংবলিত পরিচয়পত্র থাকবে। (বলা বাহুল্য যাদের কাছে এধরনের পরিচয়পত্র নেই চা-বাগানের ম্যানেজাররা তাদের কোনোরকম সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য থাকবেন না। পরিচয়পত্রহীন কেউ যদি বাগানের মধ্যে সভা ডাকতে চায় তা হ'লে তাকে বা তাদের শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র কাকোটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হবে।)

"৩। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র কাকোটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর সংগঠকরা একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়েই বক্তৃতাদি দেবেন,

এবং মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমানে যে-স্থিত সম্পর্ক আছে তা কোনোক্রমে ব্যাহত হয় এমন-কোনো অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই নিজেদের জড়িত করবেন না।"

গোপন চিঠিখানার বয়ান উদ্ধৃত হলো অধ্যাপক অমলেন্দু গুহর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্ল্যাণ্টার রাজ টু স্বরাজ' (প্রকাশক: পিপলস পাবলিশিং হাউস) থেকে। ১৯৪৭ সালের অগস্ট মাসে স্বরাজ যদিও এলো, বকলমে বিদেশী মালিকদের আধিপত্য তথাচ যে বহাল রইলো তা চিঠির সারাংশ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখন থেকে মালিকদের স্বার্থ দেখবার দায়িত্বে থাকবেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা, বিনিময়ে জাতীয় কংগ্রেসের স্বার্থ দেখবেন বাগানের মালিক সম্প্রদায়। একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসের লোকেরাই বাগানে ঢোকবার অনুমতি পাবেন, শ্রমিক সংগঠন তৈরি করতে পারবেন, অন্য-সমস্ত রাজনৈতিক দলের সেই অধিকার থাকবে না, তাঁদের ঢুকতেই দেওয়া হবে না বাগানে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নামে ছাপ-মারা অতি-বশংবদ শ্রমিক আন্দোলন। হু-হু ক'রে অসম প্রদেশের বাগানে-বাগানে কংগ্রেসি ইউনিয়নের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে না প'ড়ে উপায় কী, মালিকরাই তো সমস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ ক'রে কংগ্রেসি ইউনিয়ন গঠনের পথ সুগম ক'রে দিচ্ছিলেন। অন্য কারো, বিশেষ ক'রে কমিউনিস্টদের, বাগানের ত্রিসীমানা মাড়ানোও নিষিদ্ধ। কিন্তু কংগ্রেস দলের প্রতি বৈদেহী বিমূর্ত প্রেমে বিগলিত হয়ে মালিকরা এধরনের একপেশে ব্যবস্থায় সম্মত হননি। তাঁদের চেতনায়-ধমনীতে, প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে-আচরণে, শ্রেণীস্বার্থের ইশারা। চিঠিখানার শেষ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ক'রে বলা আছে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে প্রতিটি বাগানে পেটোয়া ইউনিয়ন গড়া হবে, এমন-কিছু করা হবে না যাতে মালিকদের শ্রেণীস্বার্থে ঘা পড়ে; মালিক আর 'শ্রমিক' সংগঠন পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবে, পরস্পরের স্বার্থ দেখবে, মালিক বাঁচলেই শ্রমিক বাঁচবে, মালিকের দয়ায় শ্রমিক বাঁচবে।

কিন্তু চা-বাগান অঞ্চলে কংগ্রেসের খয়ের খাঁ-ধর্মী শ্রম সংগঠন গড়ার কাহিনী তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শিল্পের প্রতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নামে এরকম ভুরি-ভুরি শ্রমিক সংগঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। বিদেশী মালিক, স্বদেশী মালিক, কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনো বাছবিচার করার প্রশ্ন ওঠেনি, ধ'রেই নেওয়া হয়েছিল মালিকদের স্বার্থ সারা দেশ জুড়ে দেখবে শাসক দল। কিন্তু কতগুলি লোক-দেখানো ব্যাপার থাকে। কালের হাওয়ার গুণে চেতনায় ছোপ পড়তে শুরু করেছে, একটু-একটু ক'রে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী সম্প্রদায় জোট বাঁধার সার্থকতা বুঝতে পারছেন। সুতরাং, যদিও মালিকদের কাছে অঙ্গীকৃত প্রতিশ্রুতি থেকে স'রে আসার প্রশ্নই নেই, অন্তত আলাদা একটি সাইনবোর্ড দরকার

শ্রমিক সংগঠনের নামে, নইলে ভুল বোঝাবুঝি হ'তে পারে। সুতরাং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শিল্পে একটা-দু'টো ক'রে ট্রেড ইউনিয়ন খোলা শুরু হলো। রাতের অন্ধকারে এ-সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন মালিকপক্ষ, তাঁদের দিক থেকেও এ-লড়াই বাঁচার লড়াই : নিজেরাই ইউনিয়ন গড়লেন, সেই ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিলেন, সেই ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি সই করলেন, বাইরে থেকে কারো-কারো হয়তো ধারণা হবে কারখানায়-কারখানায় শ্রেণীবিভাজন সম্প্রসারিত হচ্ছে, আসলে কিন্তু ঐ পর্বে গোটা দেশ জুড়ে যা ঘটেছিল তা মালিক প্রভুদের এবং বশংবদ ইউনিয়নের পারস্পরিক বোঝাপড়ার লীলাভিনয়। সমস্তটাই যেন রঙ্গ, সেই হাল্‌কা চালের পদ্যকাহিনীটির মতো : " 'চাই ভালো টুথপেস্ট', নিমগাছ হাঁকে। / 'এ কী তব আচরণ', শুধালাম তাকে। / 'আত্মরক্ষা মহাধর্ম, অতএব ভাই / দাঁতন ছাড়িয়া সবে ধরিও উহাই' "। মালিকদের কাছে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চেয়ে মহত্তর ধর্ম নেই, তার তাগিদে যদি পেটোয়া ইউনিয়ন গড়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, দ্বিধাহীন চিত্তে কোমর বেঁধে সেই কাজে নেমে পড়বেন মালিক সম্প্রদায়। যেমন পড়েছিলেন স্বাধীনতালাভের ঠিক পরে-পরেই। তাঁদের সেই কাজে সাহস ও ভরসা জুগিয়েছিলেন শাসক কংগ্রেস দল, তাঁরা বিদেশী মালিক-স্বদেশী মালিকে ভেদাভেদ টানেননি, ছোটো মালিক আর বড়ো মালিকের মধ্যেও বাছবিচার করেননি ; নির্বিচারে সমগ্র মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট-বিশাল ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন।

সেই ঐতিহ্য এখনও বহমান। অবশ্য আজ থেকে চার-পাঁচ দশক আগে যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা চা-বাগানগুলিতে কায়েম ছিল, এখন তা সময়ের স্রোতে অনেকটাই খ'সে পড়েছে। সহস্র বাধা অতিক্রম ক'রে বিভিন্ন শিল্পে বামপন্থী কর্মীরা অনুপ্রবেশ করেছেন, একটু-একটু ক'রে জোট বাঁধার মর্মকথা শুনিয়েছেন সদ্য-গ্রাম-থেকে-আসা পিছিয়ে-থাকা শ্রমিকদের, তাঁদের সাহসী হ'তে শিখিয়েছেন, সংকটে-বিপদে তাঁদের পাশে থেকেছেন। অত্যাচারের খড়্গ নেমে এসেছে, ধর্মঘট-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, মালিকের হয়ে পুলিস আসরে নেমেছে, লাঠি-গুলি চলেছে, শহীদ হয়েছেন শত-শত শ্রমিক কর্মী ও নেতা। কারখানায় বা চা-বাগানে হয়তো ছাঁটাই হয়েছে, কিন্তু বজ্রকঠিন ঐক্যে সংবৃত শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করেছে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছে। কোথাও সফলতা এসেছে সংগ্রাম থেকে, অন্য-কোথাও হয়তো সাফল্যের জন্য আরো বহু সময় অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে, তারপর সেখানেও হয়তো ছাঁটাই বন্ধ হয়েছে. মজুরি বেড়েছে, মজুর শ্রেণী আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। এ এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান, যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের চেতনার মান অনবচ্ছিন্ন উর্ধ্বগতি হবার প্রসঙ্গ।

কিন্তু তা ব'লে মালিকপক্ষের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি, ছেদ পড়েনি মালিকপক্ষের সঙ্গে শাসকদলের আত্মিক-বৈষয়িক যোগাযোগের অধ্যায়ে। শ্রমসংক্রান্ত প্রধান-প্রধান আইনের নিয়ামক-নির্ধারক কেন্দ্রীয় সরকার। এই সরকার কালো কানুন প্রণয়ন ক'রে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, বিশেষ-বিশেষ শিল্পে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছেন। বে-সরকারি মালিকদের স্থলে ভুল হবার তো নয়ই, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিটি কারখানায়-শিল্প সংস্থায়ও নির্দেশ পাঠানো হয়েছে কোন্ ইউনিয়নকে মদত দিতে হবে এবং কাকে দিতে হবে গলা ধাক্কা। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনের হর্তাকর্তা, কোন্ ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে অতএব তারও নির্ধারক। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে এখনো দেখানো হচ্ছে সারা দেশে বিভিন্ন শিল্পে প্রধান শ্রমিক সংগঠন ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এটা করা হচ্ছে অনেকটাই গায়ের জোরে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে বছরের-পর-বছর ধ'রে দাবি জানানো হয়েছে : কারখানায়-কারখানায় দপ্তরে-দপ্তরে গোপন ব্যালটের ব্যবস্থা করা হোক, সেই ব্যালটে যে-শ্রমিক সংগঠনকে কারখানার বা দপ্তরের কর্মজীবীরা সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়ে সমর্থন জানাবেন, সরকারি স্বীকৃতি পাবে সেই সংগঠন, তাকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা-বোঝাপড়াই গ্রাহ্য হবে না। গোপন ব্যালটের মধ্যবর্তিতায় সংখ্যাধিক্য যাচাইয়ের প্রথা গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের দপ্তর থেকে সরকারের কাছে বহুবার উপরোধ করা হয়েছে, কিন্তু চক্ষু-লজ্জাকে ছাপিয়ে শ্রেণীস্বার্থ। পেটোয়া ইউনিয়ন বাদ দিয়ে মালিকদের যেমন চলে না, কংগ্রেস দলেরও না। গোপন ভোটের ব্যবস্থা চালু হ'লে অসুবিধা দেখা দেবে, বশংবদ শ্রমিক নেতা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার নামে আলোচনায় ব'সে শ্রমিকদের স্বার্থ পুরোপুরি জলাঞ্জলি দেওয়ার আর সুযোগ পাবেন না, সুতরাং নানা ছুতোয় শাসকশ্রেণী বর্তমান আইনের পরিবর্তনে বাধা দিতে থাকবেন। উপস্থিত তো কোনো অসুবিধা নেই, দাবি করলেই হলো আমাদের এত লক্ষ সদস্য সংখ্যা, সেই সঙ্গে কিছু ভুয়ো রসিদের বই এনে উপস্থাপন করা। এই মিথ্যার বেসাতিতে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বভাবতই পরাভূত, বিশেষ ক'রে বর্তমান আইনে যেহেতু কোন্ দাবি যথার্থ আর কোন্ দাবি মেকি তা যাচাইয়ের দায়িত্ব মালিকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ সুতরাং যেখানে তাঁর বই শেষ করেছেন, সেখানেই সাধারণ মানুষের আন্দোলনের ইতিহাসের শুরু। বিদেশী চা বাগান মালিকদের রাজত্বের অবসানে কংগ্রেসী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, এক অর্থে তা নিশ্চয়ই দেশাদি-বাসীদের পক্ষে স্বরাজে উত্তরণ। কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই উত্তরণের মধ্য দিয়ে কোনো প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি, মাউণ্টব্যাটেন

যাদের কাছে সেই হাতের ব্যাটন সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন তারা অকৃতজ্ঞ নয়, দেশী ও বিদেশী পুঁজির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ টানেনি তারা, যে-কোনো বর্ণের যে-কোনো গন্ধের যে-কোনো ধর্মের পুঁজিকে তারা বরণ ক'রে নিয়ে, সেই পুঁজির স্বার্থে, পরম পরাক্রমে চার দশক ধ'রে তারা প্রজাপীড়ন করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর চল্লিশ বছরে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রগতি-প্রবণতা নিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় সভা-আলোচনা-সেমিনার হচ্ছে, কিন্তু, শাক দিয়ে তো মাছ ঢাকা যায় না, পুরোটাই তো দেশী-বিদেশী পুঁজির মহামিলন কাহিনী, সংবিধান যদিও বলে ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং নতুন ক'রে নাকি আইনও হচ্ছে নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলে হাত তুলে শপথ নিতে হবে প্রার্থীকে যে তিনি সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখেন। তবে শপথ-অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম করতে হবে এমন-কথা কোনো আইনেই লেখা নেই, অতএব সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে শ্রমিকদলন অব্যাহত থাকবেই।

কারমেল ব্রিকম্যান : কিছু স্মৃতি, কিছু কাহিনী

মে দিবসের পাশাপাশি দু'টো আলাদা তাৎপর্যকে আমরা মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি। পৃথিবীর সর্বত্র এই দিনটিতে শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সম্প্রসারণের জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলেন তাঁরা, শোষণ শেষ কথা বলে না, ইতিহাসের প্রতি প্রহরে শেষ স্বাক্ষর শেষ পর্যন্ত লেখে যূথবদ্ধ জনতাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মে দিবস অন্য একটি দ্যোতনার কথাও বলে : শ্রমজীবী মানুষ, খেটে-খাওয়া মানুষ, আপাতত-শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ, যে যেখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকুন না-কেন, যে-অবস্থাতেই থাকুন না-কেন, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ, তাঁদের কারো লড়াইই তাঁদের একার লড়াই নয়, সকলের লড়াই; তাঁরা পরস্পরের কাছে অঙ্গীকৃত, পরস্পরের কাছে শপথবদ্ধ, একই প্রতিজ্ঞা ও আদর্শের শিখায় তাঁরা রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন, শৃঙ্খলমুক্তির দিকে এগোচ্ছেন। মে দিবস প্রতি বছর আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধের কথা। আমরা, এ দেশে কিংবা ও দেশে অথবা অন্য-কোনো ভিন্ দেশে, বছর ভ'রে, নিজেদের সমস্যায় হয়তো জর্জরিত থাকি, কিন্তু অন্তত এই দিনটিতে নতুন ক'রে অঙ্গীকার গ্রহণ করি, আমাদের কাছের-দূরের পড়শীদের সংগ্রামও আমাদের সংগ্রাম, তাঁদের অকুতোভয় থেকেও আমাদের সাহসের সমারোহ।

একজন-দু'জন নাস্তিক হয়তো বলবেন, এ-সমস্তই কথার কথা, আসলে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিকতাবোধ ক্রমশ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে আসছে, প্রতিটি দেশেই এমনকি আদর্শবাদী মানুষেরা পর্যন্ত একমাত্র নিজেদের সমস্যা নিয়েই বিব্রত, নিজেদের সংকীর্ণ উপস্থিত স্বার্থের কষ্টিপাথরেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্যের তালিকা নির্ধারণ করছেন, পৃথিবীর অন্যত্র শোষিত-নিষ্পেষিত মানুষেরা কেমন ক'রে দিনযাপন করছেন তা নিয়ে তাঁদের বিবেক আর মাথা ঘামাতে রাজি নয়।

এটা অভিযোগও হ'তে পারে, অনুশোচনাও, খানিকটা হয়তো আত্ম-সমালোচনাও। বিগত কয়েক বছরের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা হয়তো এখানে-ওখানে হতাশা সৃষ্টি করেছে, সেই হতাশা প্রকাশ পাচ্ছে বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু অভিজ্ঞতা তো একপেশে নয়। একপেশে যে নয় তার প্রমাণ হিশেবে মাত্র একটি নাম উচ্চারণ করলেই চলবে : কারমেল ব্রিকম্যান।

আমাদের দেশে, দিল্লি-কলকাতা-বোম্বাইতে, ক'জন মনে রেখেছেন কারমেল ব্রিকম্যানকে, ক'জনই বা কারমেলের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন?

স্মৃতি খুঁড়ে চ'লে যেতে হয় আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনের উপাখ্যানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ, পৃথিবী টালমাটাল, ফ্যাসিবাদ পরাভূত, লালফৌজ শৌর্যের-বীর্যের যে-নতুন ইতিহাস রচনা করেছে তার গর্বে গরীয়ান ইওরোপ, একটির-পর একটি, পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক শক্তি নিজেদের প্রাধান্য সুপ্রোথিত করছে, এমনকি ফ্রান্স ও ইতালিতে পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির জয়যাত্রা অব্যাহত, ব্রিটেনে শ্রমিক দলের সরকার তাদের সাম্রাজ্য কুঁকড়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। এশিয়া ভূখণ্ডেও সংগ্রামশীল জনতার পদভরে মেদিনী কম্পিত, চীনে মুক্তি ফৌজ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে তাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি অব্যাহত রাখছে। মালয়দেশে বিদ্রোহ, ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ পর্যুদস্ত, ভিয়েৎনামে হো চি মিনের প্রেরণায়-নায়কত্বে গ্রামে-পাহাড়ে-শহরে-গলিকন্দরে মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনার ছক কাটছেন। ব্রহ্মদেশ অস্থির, আমাদের ভারতবর্ষেও তেলেঙ্গানা-তেভাগার উত্তাল তরঙ্গ, কলে-কারখানায়-রেলে-বন্দরে শ্রমিকদের ক্রমশ আরো জোটবদ্ধ হওয়া, সদাগরি-সরকারি কর্মীরা মিছিলে শামিল, মিছিলে শামিল মহিলারাও, অনুরূপ চাঞ্চল্য ছাত্রসমাজে। গোটা পৃথিবী যেন ক্রান্তির লগ্নে উপনীত। গোটা পৃথিবীর লড়াকু মানুষেরা যদি আরো কাছাকাছি আসতে পারেন, পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যবর্তিতায় তাঁদের আলাদা-আলাদা প্রতিজ্ঞা-পরিকল্পনাকে শাণিততর ক'রে নিতে পারেন, তা হ'লে, এ দেশে-ও দেশে-সে দেশে, কোনো শত্রুশ্রেণীর পক্ষেই আর বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, গোটা পৃথিবী যেন বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

সেই মুহূর্তে, যুব-ছাত্র সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক আদর্শবোধ প্রতিটি দেশে দৃঢ়তর করার সুমহান্ উদ্দেশ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এই কলকাতায়, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষকালে। যদিও মুখ্যত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে এসে জড়ো-হওয়া ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতীদের সম্মেলন, ভ্রাতৃমূলক প্রতিনিধি এসেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ব্রিটেন--ফ্রান্স--ইতালি--স্কাণ্ডিনেভিয়া--ফিনল্যাণ্ড--যুগোশ্লাভিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে যেমন, যেমন সোভিয়েট দেশ থেকে, তেমনি চীন-জাপান-কোরিয়া থেকে, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড থেকে, একটি-দু'টি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ থেকে। সম্মেলনের দুই হোতা, আন্তর্জাতিক ছাত্র সংঘ (ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেণ্টস) ও বিশ্ব যুব সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক ইউথ)। সম্মেলনের প্রাথমিক উদ্যোগ-আয়োজন তত্ত্বাবধানের জন্য এই দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে যে-কয়েকজনকে আগে থেকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কারমেল ব্রিকম্যান। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স্ক ইংরেজ যুবতী, উত্তর ইংল্যাণ্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, বয়সের তুলনায় অনেকটাই স্থিতধী,

আলাপে-আলোচনায় দক্ষ, মধ্যস্থতায় নিপুণ, আদর্শে-প্রত্যয়ে-বিশ্বাসে অথচ অবিচল। নানা দেশ থেকে যে-প্রতিনিধিরা আসবেন সম্মেলনে, তাঁদের মধ্যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তদের পাশাপাশি, শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর যুবকদেরও উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল, কৌশলগত কারণেও এটা প্রয়োজন ছিল যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত যুব-ছাত্রদের সমাবেশ ঘটে। প্রতিটি দেশ থেকে সর্বমতসম্পন্ন প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠনের প্রয়াসে তাই প্রচুর বিবেচনা-বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হয়েছিল, অতিক্রম ক'রে আসতে হয়েছিল অনেক মান-অভিমানের অধ্যায়। এই দায়িত্বগুলি কারমেল ব্রিকম্যান পালন করেছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে মাধুর্য মিশিয়ে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঐ ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব ন্যায্যতই অনেকেই দাবি করতে পারতেন, তবে, যাঁরা সেই উদ্যোগ-আয়োজনের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের কাছে অন্তত, যাঁর ভূমিকা সবাগ্রে উল্লেখযোগ্য, এবং সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য, তিনি কারমেল ব্রিকম্যান।

তারপর অবশ্য ইতিহাস দ্রুত এগিয়ে গেছে, কলকাতার সেই মহাসম্মেলনের কথা এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত, তা-ও, আজ থেকে চার দশক আগে যুব-ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, এমন মাত্র কয়েকজনের স্মৃতিতেই শুধু। ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশে, মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ভিয়েৎনামে-লাওসে-কম্বোজে, জাপানে-চীনে, সোভিয়েট দেশে-ইওরোপের অন্যত্র, লাতিন আমেরিকায়-উত্তর মার্কিন মহাদেশে-আফ্রিকায়, জনতার আন্দোলন বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবে বিবর্তিত হয়েছে এই চার দশক ধ'রে, কোথাও অপ্রতিহত অগ্রগতি, অন্য-কোথাও সাময়িক পশ্চাদপসরণ। নতুন চিন্তার ছায়া পড়েছে এখানে-ওখানে, সংগঠনের প্রকরণ-পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটেছে, পুরনো কমরেডরা কে কোথায় উধাও, কারমেল ব্রিকম্যানরা নিরুদ্দেশ।

অথচ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, হারিয়ে যেতে হবে আবার ফিরিয়ে পাবে ব'লে। আজ থেকে ঠিক তেরো বছর আগে, ১৯৭৬ সালে, লণ্ডনে কিছু ভারতীয়দের মে দিবস উদ্‌যাপন। দেশে জরুরি অবস্থা, স্বৈরতন্ত্রের অন্ধকার, নিপীড়ন, মে দিবসের উন্মাদনা-উদ্দীপনার অনেকখানি জুড়ে স্বভাবতই স্বদেশপ্রসঙ্গ। সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার পর কাছাকাছি এক বন্ধুর গৃহে সম-আদর্শবাদী কিছু কমরেডের বিশ্রম্ভালাপ। ঘরের এক কোণে, একটু আলাদা হয়ে ব'সে থাকা, এক প্রায়-বৃদ্ধা মহিলা, নাম শুনে চমকে উঠতে হলো: কারমেল ব্রিকম্যান। প্রায় তিরিশ বছরের পুরনো স্মৃতি আছড়ে পড়লো মনের তটদেশে।

না, কারমেল ব্রিকম্যান হারিয়ে যেতে দেননি নিজেকে, কমলিকা বয়সে যে-স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নিজেকে, তার প্রতি আনুগত্য অটুট রেখে গেছেন বছরের পর বছর ধ'রে। অনেক তুফানের মধ্য দিয়ে গেছেন, অনেক কালো হাওয়ার ভ্রূকুটি, অজস্র বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা, কিন্তু আদর্শ থেকে এতটুকু স'রে

আসেননি। এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর কাহিনী, যে-কাহিনী আমাদের প্রায় কানে ধ'রে নতুন ক'রে শেখায়, যে দিবসের প্রতিজ্ঞায় কোনো খাদ নেই, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবন্ধন টিঁকছে, টিঁকবে।

সম্ভবত কলকাতাতেই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে আসা এক ইন্দোনেশীয় কমরেডের সঙ্গে কারমেল ব্রিকম্যানের প্রথম পরিচয় হয়, পরিচয় থেকে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে বিবাহ। কারমেল স্বামীর সঙ্গে অনুবর্তন করেন যবদ্বীপে। জাকার্তা শহরকে কেন্দ্র ক'রে তাঁরা পার্টির কাজে সর্বক্ষণের কর্মী হিশেবে নিজেদের নিয়োগ করেন, কখনো ছাত্র ফ্রণ্টে, কখনো শ্রমিক ফ্রণ্টে, কখনো অন্যত্র। আস্তে-আস্তে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেল কারমেল ব্রিকম্যানের, কিন্তু কিছু যায় আসে না তাতে, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন তো ভুবন-জোড়া, সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে জর্জরিত এশিয়ার দেশে-দেশে জনচেতনা উদ্বুদ্ধ করাব প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার চেয়ে শ্রেয়তর ভূমিকা আর কী হ'তে পারে সমাজতন্ত্রের-মন্ত্রে-বিশ্বাসী তদ্গতপ্রাণ কোনো কর্মীর পক্ষে। কারমেল ব্রিকম্যান নিজেকে হারিয়ে যেতে দেননি, তিনি হারিয়ে গেলেন ইন্দোনেশিয়ার জনারণ্যে, ওখানেও তো বিপ্লবের আপাত-আকাশকুসুমকে বাস্তবের পৃথিবীতে টেনে নামাতে হবে, তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন, প্রস্তুতি. পরিকল্পনা, পরিকল্পনা-অনুযায়ী পরিশ্রম, ইন্দোনেশিয়া পার্টির অতএব সর্বক্ষণের কর্মী একদা-ইংল্যাণ্ডের-লীড্‌স্‌-শহরের-কন্যকা কারমেল ব্রিকম্যান।

পঞ্চাশের দশক জুড়ে, এবং ষাটের দশকের প্রথমার্ধে, ইন্দোনেশিয়ায় প্রগতি-শীল আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়েছে, প্রতি ঋতুতে নতুন নতুন সাফল্যশিখরে পৌঁছেছে, পার্টি এগিয়ে গেছে, ক্রমশ ঐ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে, ব্যূহ গঠিত হয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, মহিলাদের মধ্যে, সদাগরি-সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে। পার্টির সদস্য সংখ্যা পঁচিশ লক্ষের কাছাকাছি উপনীত, গণ-ফ্রন্টের সংগঠনগুলির সম্মিলিত সদস্যসংখ্যা কোটি ছাপিয়ে। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে, বিপ্লব তো অত্যাসন্ন, যে-কোনো দিন যে-কোনো লগ্নে তা সংঘটিত হ'তে পারে, আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাঁধবে।

কিন্তু না, হঠাৎ ১৯৬৫ সালে হিশেবের পাটিগণিত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিপ্লব নয়, প্রতিবিপ্লব, গোটা ইন্দোনেশিয়া দেশ সামরিক বাহিনীর দখলে, কমিউনিস্ট নিধনের নারকীয় যজ্ঞানুষ্ঠান, অন্তত পঞ্চাশ হাজার কমরেডকে, জনশ্রুতি, দশ দিনের সময় জুড়ে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছিল। যে-কমরেডের সঙ্গে কারমেল বিবাহবদ্ধ হয়েছিলেন, প্রথম কিস্তিতেই তিনি ধরা পড়লেন, খুঁচিয়ে হত্যা করা হলো তাঁকে, যেমন হত্যা করা হলো আরো হাজার-হাজার কমরেডদের, সেই মৃতদেহগুলি কোথায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজ পর্যন্ত তার হদিস পাওয়া

যায়নি। প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি রোমকূপ থেকে কমিউনিস্ট প্রভাব সমূল উৎপাটনের বিরতিহীন কাহিনীতে ঠাসা অব্যবহিত পরের বছরগুলি।

কারমেল ব্রিকম্যান নিজেও রেহাই পেলেন না, তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। ইতিমধ্যে যেহেতু তিনি ইন্দোনেশীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, বিদেশী হিশেবে আলাদা সুবিধার অনুরোধ করার অধিকার ছিল না তাঁর, অবশ্য অধিকার থাকলেও তা ব্যবহার করার কথা ভাবতেও পারতেন না তিনি। ব্যাকরণ-অনুযায়ী তিনি ইন্দোনেশীয় নাগরিক, পার্টির অন্যতম প্রধান সংগঠক, সুতরাং কারাগারে অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হ'তে হলো তাঁকে। পার্টির গোপন খবর তাঁর কাছ থেকে যে-ক'রেই হোক উদ্ধার করতে হবে, অতএব প্রথামাফিক সমস্ত অত্যাচারের পালা, তা থেকে কোনো সফলতা না পাওয়ায়, ক্রোধে-প্রতিহিংসায়-বিদ্বেষে, প্রথাবহির্ভূত অত্যাচার, যা মধ্যযুগীয় সমস্ত বর্বরতাকে পরিম্লান করে।

দীর্ঘ এগারো বছর প্রতিবিপ্লবীদের কারাগারে কারমেল ব্রিকম্যান অতিবাহিত করেছেন, অত্যাচারে তাঁকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া হয়েছে, হাত-পা জড়ত্বে আক্রান্ত, সারা শরীরে অত্যাচারজড়িত অকালবার্ধক্যের ছাপ। কিন্তু মনোবল ভাঙেনি তাঁর, আন্দোলনের অথবা পার্টির সংগোপন তথ্য বা সূত্রের ছিটেফোঁটাও কারমেল ব্রিকম্যানের কাছ থেকে অত্যাচারীরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি, নিজের জীবনের চেয়ে জীবনাদর্শ বড়ো এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে কমলিকা বয়সে যিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, কোনো অত্যাচারীর অস্ত্রই তাঁর অবৈকল্যকে তছনছ করতে পারে না, পারবে না।

তাই ব'সে-ব'সে করছি লিস্টি

পুরনো দিনের কথা মনে প'ড়ে গেল। সম্ভবত ১৯৬৪ সাল সেটা, সন্ধ্যাবেলা এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ি গেছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার, ফিউজ উড়ে গেছে। টুলের উপর দাঁড়িয়ে দেশলাই কাঠির আলোয় এক প্রবীণ ভদ্রলোক ফিউজের তার বসাচ্ছেন নিপুণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে। আলো ফিরে এল, সামান্য পরিচয় হলো পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে, কলকাতার ডাকসাইটে সংবাদপত্রগোষ্ঠীর অন্যতম কেষ্টবিষ্টু। কয়েকদিন বাদে শুনতে পেলাম আমার অন্য এক সুহৃদকে বলেছেন : তোমার বন্ধু, কী যেন-নাম, তার সঙ্গে আলাপ হলো, কথাবার্তায় তো সজ্জনই মনে হলো, তবে দেশদ্রোহী কেন।

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার ইতিহাস, চীনের সঙ্গে দশ দিনের সীমান্তসংঘর্ষে আমাদের সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে, যাঁরা বলতে চাইছিলেন এসব যুদ্ধফুদ্ধের কী দরকার, আলোচনায় ব'সে দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে বিসংবাদটি মিটিয়ে নিলেই তো হয়, তাঁদের সবাইকে ধ'রে-ধ'রে দেশদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছিল। রেডিও-তে সকাল-বিকাল দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' আর 'অরাতি রক্তে করিব স্নান' শোনানো হচ্ছে, কে রে এই বেরসিকগুলি যারা বলছে যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, নিশ্চয়ই এরা দেশদ্রোহী, ধ'রে জেলে পুরে দাও সব ক'টাকে। ঐ বিশেষ সংবাদপত্রগোষ্ঠী মহা উৎসাহে মাঠে নেমে পড়লেন, তাঁরাই ঠিক ক'রে দিতে শুরু করলেন, ঐ নিরিখের বিচারে, কে খাঁটি আর কে দেশদ্রোহী।

যেহেতু পঁচিশ বছরের ইতিহাস গড়িয়ে গেছে, আমরা অনেকে ভেবেছিলাম এ ধরনের তাৎক্ষণিক আখ্যাভূষণের পালা আর পুনরভিনীত হবে না। ভুল ভেবেছিলাম আমরা। দেশের খোদ প্রধান মন্ত্রী হঠাৎ নতুন ক'রে দেশদ্রোহিতা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। এবার এখানে-ওখানে খুচরো-খাচরা দেশদ্রোহীদের পাকড়ানো নয়, এবার রাঘববোয়ালকাহিনী, প্রধান মন্ত্রী দেশ-বাসীকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে, ঝোপে-ঝাড়ে, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, এক বা একাধিক দেশদ্রোহী রাজ্য সরকার গা-ঢাকা দিয়ে আছে, তাঁর জমানায় তাদের নিস্তার নেই, এখন থেকে তারা যেন সহবৎ ফেরায়, তা না হ'লে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবেন তাদের তিনি। চমকপ্রদ ঘোষণা। দেশ তো ধুলো-মাটি-কাঁকরের কণা নয়, দেশ মানে মানুষ। সেই মানুষগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চৌকো বাক্সে ভোট ফেলে রাজ্যে-রাজ্যে নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীদের

নির্বাচনে জয়ী করেন। নির্বাচনে-জয়ী-হওয়া সেই প্রার্থীরা সরকার গঠন করেন। রাজ্যে-রাজ্যে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা অর্পিত সেই সরকারের উপর, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতামতের মূল্য কী, তাঁরা দেশপ্রেমের কী বোঝেন, প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং উপর থেকে রায় দেবেন কোন্-কোন্ রাজ্য সরকার খাঁটি, আর কার-কারা দেশদ্রোহী, যারা দেশদ্রোহী, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি খারিজ ক'রে দেবেন।

যখন প্রধান মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলো, দেশপ্রেম তথা দেশদ্রোহিতার সংজ্ঞা কী, কোন্ নিরিখে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন যে অমুক রাজ্য সরকার দেশদ্রোহী, তমুকটি নয়, তিনি জানালেন এটা কোনো সমস্যাই নয়, তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আছে, সেই মন্ত্রক স্থির করবে, কোন্-কোন্ রাজ্য সরকার দেশদ্রোহী, কোতল করো তাদের। অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী তাঁর গোমস্তা মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবেন, ওহে মন্ত্রী, আজ প্রভাতবেলায় কোন্-কোন্ রাজ্য দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের লিস্টি তৈয়ার? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ সস্মিত উত্তর দেবেন, হুজুর, ধর্মাবতার, আজ সকালে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে একটু বাঁকাভাবে চলতে দেখেছি, অতএব ঐ রাজ্যের সরকার দেশদ্রোহী। প্রধান মন্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে ফাঁসির হুকুম দেবেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভদ্রলোকটি পাঞ্জাবের অধিবাসী, কিন্তু সেই রাজ্যের মানুষ তাঁকে এত ভালবাসেন যে ওখান থেকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হ'তে সাহস পাননি, পালিয়ে এসে রাজস্থান থেকে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এহেন ব্যক্তি যাচাই করবেন কোন্ রাজ্যের জনসাধারণ খাঁটি মাল বাছাই করেছেন, আর কোন্ রাজ্যে তাঁরা গলদ ক'রে কিছু দেশদ্রোহীকে সরকারে বসিয়েছেন; শেষোল্লিখিতদের সরকার থেকে অপসারিত করা হবে, জনসাধারণের অনুরাগের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়ো।

কিন্তু ঐ একটু আগে যা বলছিলাম, দেশ তো ধুলো-মাটি-কাঁকরের কণা নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তো দেশ হয় না, মানুষকে ভালোবাসাই তো দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই দেশদ্রোহিতা। দেশের মানুষের যথার্থ স্বার্থ কোন্ কর্ম-কোন্ সিদ্ধান্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তা ঠিক করবেন কারা, দেশের মানুষ নিজেরা, না নিজের-রাজ্য-থেকে-পালিয়ে-বেড়ানো মহানুভব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মশাই ও তাঁর মতো মুষ্টিমেয় আরো যে-ক'জন আছেন প্রধান মন্ত্রীর আশপাশে ধ্বজাধারী হিশেবে? একেকটি রাজ্যে পর-পর নির্বাচন হচ্ছে, প্রধান মন্ত্রীর দল হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছে; ইতস্তত উপনির্বাচনও হচ্ছে, বোম্বাই শহরে অথবা কলকাতায়, প্রধান মন্ত্রীর দল আগেকার জেতা আসন অনেক, অনেক ভোটের ব্যবধানে বিরোধী দলগুলির কাছে খোওয়াচ্ছেন। তবে কি যাঁরা মানুষের ভালোবাসা পান, মানুষ যাঁদের উপর আস্থা স্থাপন করেন, তাঁরা দেশদ্রোহী, আর যাঁদের উপর মানুষের আদৌ আস্থা নেই, দেশের মানুষ মনে করছেন দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে পাঠাচ্ছে যাদের কর্মকুশলতা, তাঁরাই নিখাদ

দেশপ্রেমিক? সুকুমার রায়-বর্ণিত শিবঠাকুরের দেশে সত্যি-সত্যি পৌঁছে গেছি আমরা তা হ'লে?

প্রধান মন্ত্রী যে এত হম্বিতম্বি করতে পারছেন তার কারণ অন্তত সংসদে তাঁর ভোটের জোর আছে। তাঁর মাতৃদেবীকে হত্যা করার অব্যবহিত পরে গোটা দেশ জুড়ে যে-নির্বাচন হয়, তাতে ছেলের প্রতি করুণায় গ'লে গিয়েই হোক, কিংবা অন্য-কোনো কারণেই হোক, বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিল প্রধান মন্ত্রীর দল। কিন্তু তারপর তো সময় ব'য়ে গেছে, অনেক ঘটনাবলীর আরক্ততায় দেশ আপ্লুত হয়েছে, দেশের মানুষ বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, অনেক কীর্তিকলাপ চোখে পড়েছে তাঁদের, অনেক কাণ্ডকারখানার ভুক্তভোগী হয়েছেন তাঁরা। অসম বিকাশের দেশ ভারতবর্ষ, আমরা অনেকেই ধারণায় আঁকড়ে থাকতাম যে দেশের অন্যত্র যা-ই হোক না কেন, আর্যাবর্তে যেহেতু এখনও সামন্ততন্ত্রের সর্বসমাচ্ছন্ন প্রভাব, যেহেতু ঐ অঞ্চলের শাদামাটা মুখ্যুসুখ্যু দেহাতি মানুষগুলি নেহরু পরিবারকে রাজপরিবার হিশেবে অনন্তকালের জন্য বরণ ক'রে নিয়েছে, এবং যেহেতু তাদের কাছে এটা ধরাধার্য কথা সামন্ততন্ত্রে রাজার মেয়ে রানী হয়, রানীর ছেলে ফের রাজা, প্রধান মন্ত্রীর দল স্রেফ ঐ অঞ্চলের মধ্যযুগীয় সংস্থানে দাঁড়িয়ে রাজত্ব কায়েম রাখতে পারবে আরও বেশ কিছুদিন। কিন্তু সেই আর্যাবর্তেই এখন অন্য হাওয়া বইছে। যাঁরা ঠিক ক'রে দেবেন কারা সাচ্চা আর কারা দেশদ্রোহী সেই প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দল হরিয়ানায় নির্বাচনে ধুয়ে-মুছে গেছে, দিল্লিতে নির্বাচনের মুখোমুখি হবার সাহস নেই তাদের, একটা ছুতো তুলে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। অনুরূপ অছিলায় এলাহাবাদেও লোকসভার শূন্য আসনটির জন্য উপনির্বাচন স্থগিত রাখতে হয়েছে, আইনশৃঙ্খলার অবস্থা নাকি সেখানে, উত্তর প্রদেশে, এত ভয়ংকর যে রাজ্য সরকার মনে করেন উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করার মতো পরিস্থিতি নেই। সোজা বাংলা করলে মানে দাঁড়ায়, ও-সব জায়গায় নির্বাচন হ'লে প্রধান মন্ত্রীর দল হেরে ঢোল হয়ে যাবে, অতএব বন্ধ ক'রে দাও নির্বাচন উপনির্বাচন।

অর্থাৎ এমনকি আর্যাবর্তেও জনসাধারণের মুখোমুখি হ'তে প্রধান মন্ত্রীর দলের সাহসে কুলোচ্ছে না, তারা ভয়গ্রস্ত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আপাতত তাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্রেক করছে। দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ এই দল ও তার নেতাদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলিও বুঝতে পারছে দেশের টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে, পাচার করছে প্রধান মন্ত্রীরই কিছু-কিছু অমাত্য-পারিষদবর্গ, যারা পাচার করছে তাদের বিদেশে ধাওয়া ক'রে যারা চুরি বন্ধ করতে চাইছে প্রধান মন্ত্রীর রাগ গিয়ে পড়েছে এই শেষোক্তদের উপর। বিদেশ থেকে হাজার-হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছে, এটা প্রমাণিত এক বিদেশী সংস্থা, তাদের কাছ থেকে যাতে অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়, সেই উদ্দেশ্যে কয়েকশো কোটি টাকা

ঘুষ দিয়েছে, দেশের মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলি অতটা বোকা নয় যে তারা বিশ্বাস করবে যে ঘুষের টাকা অপাত্রে গেছে, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর দল ধোওয়া তুলসীপাতা। এই মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলি সোজা-সরল সত্য খুব চট্‌ ক'রে ধ'রে ফেলে, তারা জানে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা. বিদেশী সংস্থাটি ঘুষের টাকার ব্যবস্থা করেছে ওসব অস্ত্রশস্ত্রের দাম আরো চড়িয়ে দিয়ে, যার খেসারত দিতে হচ্ছে মুখ্যুসুখ্যু মানুষদেরই, প্রধান মন্ত্রীর সরকার প্রতিদিন এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশের মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা করছেন টাকা তোলবার জন্য : ঘুষের টাকার ব্যবস্থা করতে হবে তো, যে-ঘুষের টাকা, মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলি এটা হৃদয়ঙ্গম করেছে, প্রধান মন্ত্রীর দলভুক্ত কেউ কেউই পকেটস্থ করেছেন।

চোরের মায়ের গলা বড়ো। যারা দেশের টাকা বিদেশে পাচারের সঙ্গে জড়িত, যারা দেশের গরিব মানুষের গলা কেটে টাকা সংগ্রহ ক'রে বিদেশ থেকে অস্ত্রসামগ্রী কেনার ব্যবস্থা করেছে ঐ টাকার একটা অংশ তাদের পকেটে ফিরে আসবে এই গোপন শর্তে, তারা নাকি এখন থেকে সার্টিফিকেট লিখবে কে সাচ্চা আর কে দেশদ্রোহী। যাঁরা চলনে-বলনে বিজাতীয়, এক সপ্তাহের বিদেশী সফরে যাঁদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে পনেবো কোটি টাকা বেরিয়ে যায়, যাঁরা সাধারণ মানুষের সর্বপ্রকার অসুবিধা ঘটিয়ে সাধারণ মানুষেরই টাকায় রাজকীয় ঐশ্বর্যের সমারোহ ঘটিয়ে প্রমোদবিহারে যান, তাঁরা নাকি আমাদের দেশপ্রেমের অ-আ-ক-খ শেখাবেন।

প্রধান মন্ত্রী মহোদয়, বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। যদি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় রুচি থাকতো, বলা যেত, ওঁকে শূলে চড়ানো উচিত। কিন্তু, তাঁর ও তাঁর পার্শ্ববর্তীদের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, যেহেতু এটা মধ্যযুগ নয়, বিনীত অনুরোধ রাখতে হয় প্রধান মন্ত্রীর কাছে : দয়া ক'রে স্থিতধী হোন, ভব্যতায় ফিরুন, ভারতবর্ষ, আপনার ধারণা ভুল, এখনও রাজতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র, এখানে কে দেশপ্রেমিক আর কে দেশবৈরী তা স্থির করবেন দেশের মানুষ, তাঁরা কী রায় দেবেন তা যাচাই করার জন্য আর-একবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন না কেন, আর সে-সাহস যদি উপস্থিত না থাকে, বরঞ্চ মুখে কুলুপ দিয়েই থাকুন না তা হ'লে ?

তা হ'লে কি শান্তিদারা হারিয়ে যাবেন ?

ভিড়ের মধ্যে যে-মানুষ হারিয়ে যেতে চান, আসলে সেই মানুষকেই ভিড়ের মধ্যে সহজে চেনা যায়। পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়কে যেত। সাধারণ, অনাড়ম্বর, অন্তরের উজ্জ্বলতাকে আটপৌরে আস্তরণে ঢেকে রেখেছেন সব সময়। যে-কাউকে ভালোবাসতে পারতেন, কারণ যে-কাউকে ভালোবাসতে জানতেন। এই জাদু তো সকলের থাকে না। নানা ধরনের লোকজন, সমাজের নানা স্তর থেকে উঠে আসা, আচরণে-রুচিতে-বিচারে অনেক তফাৎ, কিন্তু এঁদের সবাইকেই শান্তিদা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতেন। আকর্ষণ করতেন তাঁর সাধারণত্ব দিয়ে, তাঁর অসাধারণ সাধারণত্ব। যাঁরা কাছে আসতেন, কেমন ক'রে তাঁরা যেন বুঝে গিয়েছিলেন এই মানুষটির মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, এই মানুষটির কাছে তাই খোলসা হওয়া যায়, অকপট কথা বলার মর্যাদা দেবেন এই মানুষটি, অকপট মন নিয়ে যে-কথাগুলি বলা হলো, শুনবেন; শোনার পর রেখে-ঢেকে কিছু বলবেন না, সরল ভাষায় সরল উপদেশ দেবেন, অকপট সাচ্চা উপদেশ, কনিষ্ঠ সহোদর বা সহোদরা যে-উপদেশ পাওয়ার আশা কিংবা দাবি করতে পারেন, সে-ধরনের উপদেশ। ভর্ৎসনার প্রয়োজন হ'লে উপদেশের সঙ্গে তা জড়িয়ে থাকবে, কিন্তু সব-কিছু যা ছাপিয়ে থাকবে তা ভালোবাসা। যে-মানুষ নিকষ ভালো, এমন ক'রে ভালোবাসা তিনিই ছড়িয়ে দিতে পারেন। পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় পারতেন, নিকষ ভালো মানুষ ছিলেন ব'লেই পারতেন।

আমরা ছেলেবেলায় লিও শাওচী গলাধঃকরণ করেছি, অন্যান্য পণ্ডিত-মনীষীর লেখা থেকে জানবার চেষ্টা করেছি ভালো কমিউনিস্ট হ'তে গেলে কী-কী গুণাবলী প্রয়োজন। ঐ গোছের পাঠ বা গবেষণা কত অপ্রয়োজনীয় এখন বুঝতে পারি। বুঝতে পারি পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের দৃষ্টান্ত থেকে। ভালো কমিউনিস্ট হ'তে গেলে সর্বাগ্রে ভালো মানুষ হ'তে হয়। ভালো মানুষ, যিনি নিজের শুভাশুভর প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখে পড়শীর শুভাশুভ নিয়ে সবচেয়ে আগে ভাববেন; যিনি নিজেকে কখনো জাহির করবেন না; অন্যকে যিনি ভালোবাসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করবেন; যিনি আদর্শে স্থিত থাকবেন, কিন্তু আদর্শের সঙ্গে যাঁরা এখনো অন্বিত হননি, তাঁদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবেন না; যিনি সৌভাগ্যবান-ঋতুতে-হাজির-হওয়া অনুরাগীদের ভিড়ের গুঁতোয় সংকটের দিনের বন্ধুদের হারিয়ে যেতে দেবেন না; যাঁর সকলের সঙ্গেই আলাদা ক'রে কথা বলার সময় আছে, প্রত্যেকের সংসারের খুঁটিনাটি খবর নেবার সময়, অসুখের

খবর, আনন্দের খবর; যিনি অপরের দুঃখকে ভাগ ক'রে নিতে জানেন, যেমন জানেন অপরের আনন্দে সমান দীপ্যমান হয়ে উঠতে।

কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা বলি, একটি মিলিত সংসার। সবাইকে নিয়ে এই সংসার, ছোটো-বড়োর ভেদাভেদ নেই, যাঁর যতটুকু দেয়, তিনি দিচ্ছেন, সবাই-ই নিজের-নিজের সাধ্যানুযায়ী এই সংসারে ঢেলে দিচ্ছেন প্রতিভা-পরিশ্রম-সামর্থ্য-সৃষ্টিশীলতা, পরিবর্তে হাত পেতে সবিনয়ে গ্রহণ করছেন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তা। অনেক তিতিক্ষা-ত্যাগের মধ্য দিয়ে গিয়ে আন্দোলন বাড়ে, পার্টির সংগঠন দৃঢ়তর হয়, মিলিত সংসার আস্তে-আস্তে বিরাট ব্যাপ্তি লাভ করে। ইতিহাসের নিয়ম মেনেই এটা হয়, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডে এখন সমাজতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা। তারও বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত সংসার প্রতিদিন নতুন ইতিহাস রচনা ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম তো কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়, কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত সংসারও বৈদেহী কোনো সত্তা নয়। মানুষেরাই ইতিহাস রচনা করেন, সেই মানুষেরাই কমিউনিস্ট পার্টির সংসারকে গ'ড়ে তোলেন। শৃঙ্খলার সংসার, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের সংসার, দায়িত্বপালনের সংসার, কিন্তু সেই সঙ্গে ভালোবাসার সংসার, স্নেহের টানে পরস্পরকে কাছে টানার সংসার। জেলায়-মহকুমায়-গ্রামে-গঞ্জে, শহরের পাড়ায়-পাড়ায়, শহরতলীর গলিঘিঞ্জিতে, ছড়িয়ে-থাকা অনেকগুলি সংসার, আবার তাদের সব-ক'টিকে জড়িয়েও সংসার। এবং এই প্রতিটি সংসারেই একই আদর্শের, কর্তব্যপরায়ণতার, শৃঙ্খলাবোধের, পারস্পরিক অনুরাগের, প্রবহমানতা। এই সম্মিলিত সংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে, হাতে ধ'রে ত্রুটি সংশোধন করতে শেখায়, বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের অন্তঃস্থিত মহত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করে, দুর্বলকে আত্মবিশ্বাসী ক'রে তোলে, যার উপর ঈষৎ আত্মম্ভরিতা ভর করেছে তাকে বিনয়ের বিশুদ্ধতায় পৌঁছে নিয়ে যায়। এই সংসারে বিতর্ক আছে, এমনকি কখনো-কখনো কলহও আছে, কিন্তু যেহেতু তা আদর্শে উত্তীর্ণ হবার পদ্ধতি-প্রণালী নিয়ে বিসংবাদ, তার প্রত্যন্তে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, সম্মিলিত অঙ্গীকারের আনন্দ তথা প্রশান্তি।

কমিউনিস্ট পার্টির এই বিরাট সম্মিলিত সংসার প্রত্যেকেরই পরিচর্যায় গ'ড়ে ওঠা। যা অলক্ষ্য শক্তি ব'লে মাঝে-মাঝে ভুল হয়, তা আসলে সংযুক্ত নিষ্ঠা ও নিবেদনের পরিণতি। অথচ এই উক্তির পাশাপাশি অন্য-একটি বাস্তবতাও সমান সত্য। ইতস্তত-ছড়ানো একজন-দু'জন মানুষ এই সংসার ঘিরে থাকেন, জুড়ে থাকেন, তাঁদের নিঃশব্দ উপস্থিতিই যেন এই সংসারকে তার আসল আদল দেয়। যেমন পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিদা, দিয়েছিলেন। এই এতগুলি বছর ধ'রে গাঁয়ের-গঞ্জের-শহরতলীর শাদামাটা মানুষ, তাঁরা তত্ত্বকথা জানেন না, ইতিহাসের নিয়মকলার কাহিনী কেউ তাঁদের কাছে আলাদা বুঝিয়ে বলেনি, কিন্তু তাঁদের

মানসপটেও কমিউনিস্ট পার্টির একটি ছবি চিত্রিত হয়ে আছে, সেই ছবির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিপুরুষদের সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধাপ্লুত ধ্যানধারণা, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁদের অনুরাগ, পরিতোস চট্টোপাধ্যায়দের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে, একাকার মিশে গেছে। দল বা আন্দোলন তো কোনো দূরাগত বস্তু নয়, আমার-তোমার পড়শীর সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম করবার জন্যই দল, সেই দলের কর্মী ও নেতারা আমার-তোমার-পড়শীর সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম ক'রে গেছেন এই এতগুলি বছর ধ'রে, দলের কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে অতএব নাড়ির বন্ধন, শিকড়ের সম্পর্ক। পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়রা পাঁচ-ছয় দশক জুড়ে এই শিকড়ের সন্ধান করেছেন, জনগণের নাড়ির অনুসন্ধানে নিজেদের নিমগ্ন রেখেছেন। আজ কমিউনিস্ট পার্টি, অন্তত পশ্চিম বঙ্গে, যে-অবস্থায় উত্তীর্ণ, তা পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়রা তাঁদের ত্যাগ দিয়ে, তাঁদের মহত্ব দিয়ে, তাঁদেব ভালোত্ব দিয়ে সেখানে পৌঁছে দিয়েছেন ব'লেই।

অথচ, জীবনের নিয়ম, সম্মিলিত সংসারের জাদুআকর্ষণও তাঁদের ধ'রে রাখতে অসফল হয়, শান্তিদারা চ'লে যান। নিজেদের তাঁরা উজাড় ক'রে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে নিজেদের তাঁরা সর্বক্ষণ আড়াল ক'রে রেখেছেন। অপরেব জন্য উৎসর্গিত জীবন, আদর্শের জন্য উৎসর্গিত জীবন, আন্দোলনের জন্য উৎসর্গিত জীবন। বিনয়ের ঘেরাটোপে ঘিরে রেখেছেন নিজেদের, সেই বিনয়ে কোনো খাদ ছিল না কোনোদিন। যিনি নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, এটা তাঁদের কাছে তো স্বতঃসিদ্ধ, তাঁকে নম্র হ'তেই হবে, নিজেকে পুরোপুরি বিলোপ ক'বে দিয়ে আদর্শের অন্বেষণে মগ্ন হ'তে হবে। আদর্শপ্রচারের বাইবে তাই আত্মপ্রচারের তো তাঁদের কোনো প্রয়োজন ছিল না কোনোদিন, প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁবা কোনোদিন. খবরের কাগজে যদি কখনো তাঁদের নাম ছাপা হতো, তা নিছক আকস্মিকতা।

জনতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে যাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু সেই কারণেই জনতার ভিড়েও চোখে পড়তেন এই মানুষগুলি। তাঁদের ত্যাগ দিয়ে, অধ্যবসায় দিয়ে, বিনয়-নম্রতা-আদর্শনিষ্ঠা দিয়ে জনতাকে সংহততর, সংঘবদ্ধতব ক'রে তুলেছেন তাঁরাই তো। তাঁদের হাতে-গড়া সংসার, হাতে-গড়া আন্দোলন। এখন, যেহেতু সময় অতিক্রান্ত, তাঁরা একজনের-পর-একজন বিদায় নিচ্ছেন। নিজেদের কথা আলাদা ক'রে তাঁরা কোনোদিন বলেননি, তাঁদের বিবেচনায় তা অবিনয় হতো, অথচ তাঁদের ব্যক্তিগত কাহিনী নিছক তাঁদেরই কাহিনী নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আন্দোলনেব ইতিহাস, সংগঠন তৈরির ইতিহাস, অত্যাচারিত-নিপীড়িত মানুষকে ভালোবাসার ইতিহাস, সেই ভালোবাসাকে শ্রেণীসংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করার ইতিহাস, অনেক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাস এগিয়েছে, অনেক দুর্যোগ, অনেক সংকট, অনেক সাহসের কাহিনী, সাময়িক-

পরাজয়ের কাহিনী, সেই সঙ্গে অনেক শপথ-প্রতিজ্ঞার কাহিনীও। একটু-একটু ক'রে নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে পথ কেটে আন্দোলন কী ক'রে এগোলো, কবে কোথায় কোন্ ধরনের স্খলন বা বিচ্যুতি থেকে কী শিক্ষাগ্রহণ করা হয়েছিল, কোন্ আপাতসাধারণ মানুস কোন্ অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আন্দোলনকে হঠাৎ বলীয়ান ক'রে তুলতে সফল হয়েছিলেন এই জেলায় কিংবা ঐ জেলায়, আন্দোলনকে কী ভয়ংকর বিপদসঙ্কুল অন্ধকার অতিক্রম ক'রে আসতে হয়েছে প্রতি দশকে অথবা দশকান্তরে, নিচের তলার মানুষজনের নিবিড় আনুগত্যে কী ক'রে আন্দোলন নিজেকে টিঁকিয়ে রেখেছে ঘোর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও, আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ক্রমে ক্রমে কী প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পেরেছে, সে-সমস্ত কাহিনী।

আশঙ্কা হয়, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়রা চ'লে যাবেন, আন্দোলন আজ যে-শক্তি-শিখরে পৌঁছেছে তা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করবো, কিন্তু এই শক্তির উৎসে যে-আত্মত্যাগনিষ্ঠাপ্রত্যয়বিনয়সাহসপ্রতিজ্ঞাসততামমতাভালোবাসার মহান্ রৌদ্র-করোজ্জ্বল কাহিনী, ক্রমশ তা ভুলে যেতে থাকবো, উৎস থেকে বিশ্লিষ্ট হবো আমরা। তা শুধু যে মহাপাতক হবে তা নয়, অন্য নানা সংক্রামক বিপদও দেখা দিতে পারে সেই সঙ্গে।

শান্তিদারা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে ভালোবাসবেন, কিন্তু বরাবর তা-ই কি হ'তে দেবো আমরা? মৃত্যুর পর একদিন-ছ'দিন তর্পণ, তারপর তাঁরা কোথায় গল্পচ্ছলে কাকে কী কাহিনী বিবৃত করেছিলেন তা নিয়ে কিছু অগোছালো আলোচনা, এবং আমাদের দায়িত্ব শেষ? জেলায়-জেলায় মহকুমায়-মহকুমায় যে-পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়রা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন, তাঁদের ভিড়ের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেবো?

দূরের আকাশ কাছের আকাশ

প্রায় প্রতি বছর, ব্রহ্মপুত্র আর তার উপনদী-শাখানদীগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠে; প্রায় প্রতি বছর, বন্যা-প্লাবন, অসম রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় হারিয়ে যায়, ঘরবাড়ি ডুবে যায়, ভেসে যায় মানুষজন-গবাদি পশু। উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতেও প্রায় প্রতি বছর একই কাহিনী, উত্তর বিহার-উত্তর বিহারের পূর্ব প্রান্তের জেলাগুলিতেও তাই। প্রতি বছর বন্যা, বন্যাজনিত মৃত্যু, আর্তের হাহাকার, ত্রাণের জন্য হাহাকার, ত্রাণের অপ্রতুলতা নিয়ে অভিযোগ-গ্লানিবোধ।

বছরের-পর-বছর ধ'রে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। আমরা যেন ধ'রেই নিয়েছি এমন ধারাই হবে, হ'তে থাকবে, বন্যা প্রাকৃতিক ঘটনা, অপ্রতিরোধ্য, যেন কিছুই করবার নেই আমাদের, শুধু ত্রাণের সমস্যাটি যাতে প্রতি বছর সুষ্ঠু-ভাবে নিরসন করা যায়, তার দিকে তাই নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকতে হবে আমাদের, অন্য সব-কিছু তো ভবিতব্য।

সত্যিই কি তাই? ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নদী, কিন্তু এখন পর্যন্ত বাঁধহীন এই মস্ত নদীর জলোচ্ছ্বাস, যেন ধ'রেই নেওয়া হয়েছে, বৃষ্টিপাত বেশি হ'লে এবং হিমালয় থেকে জলের ধারা নামলে, কিছু করবার নেই, বছরের-পর-বছর ধ'রে প্লাবন হবেই। অথচ ব্রহ্মপুত্রকে যদি নিগড়ে বাঁধা যেত, ছোট-বড়ো-মাঝারি বিভিন্ন ধরনের বাঁধের যদি ব্যবস্থা করা যেত, বাঁধের জল তার পর সারা বছর ধ'রে একটু-একটু ক'রে বিভিন্ন অববাহিকা মারফৎ উপত্যকার সর্বত্র সেচের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া যেত, ভোজবাজি ঘ'টে যেত তা হ'লে। বন্যা-প্লাবন অতীত দিনের কাহিনীতে পর্যবসিত হতো, অন্যদিকে বৎসরব্যাপী সেচের কল্যাণে অসম রাজ্যের বর্গক্ষেত্রের পর বর্গক্ষেত্র জুড়ে বপনবিন্যাসে বিপ্লব ঘ'টে যেত, এক-ফসলি জমি দু'-তিন-চার ফসলি হতো, পঞ্জাব-হরিয়ানায় যেমন হয়েছে, অসম রাজ্যে প্রাচুর্যের বন্যা নামতো, মানুষজন সুখের মুখ দেখতো। ঠিক তেমনটিই ঘটতে পারতো আমাদের পশ্চিম বঙ্গে, বিহারে, উত্তর প্রদেশের হতজীর্ণ পূর্ব প্রান্তে। আরো বেশি-বেশি ক'রে বাঁধ, উন্নত ধরনের বাঁধ, আরো বেশি-বেশি ক'রে জলনিকাশী প্রকল্প, ভারতবর্ষের গোটা পূর্বাঞ্চলের চেহারা পাল্টে যেতো। যা হ'তে পারতো, তা হয়নি, হচ্ছে না। হচ্ছে না, কারণ টাকার অভাব। রাজ্য সরকারগুলি ধুঁকছে, প্রতি বছর ত্রাণের ব্যবস্থা করতেই তাদের জিভ লম্বা হয়ে যায়, দীর্ঘমেয়াদী বন্যা প্রতিরোধক-সেচবর্ধক ব্যবস্থাদি সুসম্পন্ন

করতে যে-বিরাট অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন, তা প্রতিটি রাজ্য সরকারের সাধ্যের বাইরে। গরিব দেশ আমাদের, টাকা নেই, তাই ব্রহ্মপুত্রকে নিগড়ে বাঁধা যেমন যায় না, যায় না পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দামাল নদনদীগুলিকেও, পুরনো বাঁধগুলিকেও প্রতি বছর যথাযথ মেরামত করা যায় না, যেখানে-যেখানে পাকাপোক্ত করা দরকার, তা-ও করা যায় না, জলনিকাশের জন্য যে-সব নতুন-নতুন প্রস্তাব ফাঁদা হয়, অবহেলায় প'ড়ে থাকে তারা, কী হবে স্বপ্ন দেখে, টাকা নেই। বছরের-পর-বছর তাই ব্রহ্মপুত্র আর তার উপনদী-শাখানদীগুলি লক্ষ-কোটি মানুষজনকে কান্নায় প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, একই কাহিনী মহানদী-তিস্তা-পুনর্ভবা-গণ্ডক-কোশী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। টাকা নেই, গরিবের ঘোড়ারোগ হ'তে নেই তাই, গরিব মানুষগুলির স্বপ্ন দেখারও অধিকার নেই, তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া ভালো, বন্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পাকা, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পাদির স্বপ্ন দেখা ঘোরতর অসমীচীন। টাকা নেই, অসমে-পশ্চিম বঙ্গে-বিহারে-পূর্ব উত্তর প্রদেশে তাই গ্রামের গরিবগুর্বো বন্যায় ভাসবে, সুচারু সেচের সুযোগ তারা পাবে না, আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা অতএব ব্যাহত হবে। আর্থিক উন্নতি তেমন-কিছু হচ্ছে না হবে না, অথচ জনসংখ্যা বাড়বে, কর্মসংস্থানহীনতা বাড়বে, তখন বোঝানো হবে তোমার অবস্থার হেরফের হচ্ছে না কারণ বাঙালিরা অথবা অন্য-কেউ তোমার রাজ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, কিংবা সমতলের মানুষেরা এসে দোকান খুলে বসেছে, অথবা পাহাড়ি মানুষেরা এসে। আর্থিক বিকাশ ঘটে না, তাই যতটুকু সংস্থান আছে, তাই নিয়ে পারস্পরিক কামড়াকামড়ি, হানাহানি, খুনোখুনি, থেমে-থেমে রক্তের বন্যা। টাকা নেই, যতটুকু টাকা আছে তা নিয়ে তাই খেয়োখেয়ি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারেও, অথবা গ্রামে-গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও, একই কাহিনী, টাকা নেই। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য কোনো রাজ্য সরকার এক বেলা আহারের ব্যবস্থা করেন, খ্যাঁক-খ্যাঁক ক'রে ওঠেন কেন্দ্রের সরকার, অপব্যয়, অপচয়, গরিব দেশের টাকা হিশেব ক'রে খরচ করতে হয়, সাধের সঙ্গে সাধ্য মেলাতে হয়; এই সংযমের অভাব ঘটলে, নন্দপুর চন্দ্র বিনা যেমন বৃন্দাবন অন্ধকার, আমাদের ভবিষ্যৎও তেমন অন্ধকার; কে না জানে আমরা পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একশো সাটটি সদস্য রাষ্ট্রের গড়পড়তা জাতীয় আয়ের হিশেবে ধরা পড়ে, আমাদের জাতীয় আয় একেবারে নিচের কোঠায়, তলার দিক থেকে পঞ্চম কি ষষ্ঠ। এই অবস্থায়, উপদেশ শুনতে হয় আমাদের, ইচ্ছা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকে সংবৃত করা প্রয়োজন, বন্যা-প্রতিরোধের-পানীয় জল সরবরাহের-নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাকা ব্যবস্থা হবে, তবে র'য়ে-স'য়ে, গরিব দেশের যে অঢেল টাকা নেই তা ভুলে গেলে কী ক'রে চলবে?

একটি ক্ষেত্রে কিন্তু টাকার অভাব হয় না। আমরা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম দেশ হ'তে পারি, কিন্তু প্রতিরক্ষা তথা জাতীয় নিরাপত্তার খাতে আমাদের ব্যয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একশো ষাটটি রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তত একশো পঞ্চান্নটির চেয়ে বেশি, আমাদের সামগ্রিক জাতীয় আয়ের প্রায় আট শতাংশ এই খাতে প্রতি বছর খরচ করা হচ্ছে, এবং এই খরচের হার প্রতি বছরই ঊর্ধ্বমুখী। অন্তত একটি বিশেষ ব্যাপারে আমরা পৃথিবীর অন্য-সমস্ত দেশকে টেক্কা দিয়েছি: অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীতে আমরা শীর্ষস্থান অধিকার করতে সফল হয়েছি, ১৮৮৭ সালে আমরা প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছি, আমাদের ধারে-কাছেও নেই অন্য-কোনো দেশ। কবির সেই আকূতি —'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—অন্তত অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত, সত্যিই গর্ববোধ করতে পারি আমরা।

বন্যা প্রতিরোধের জন্য টাকা নেই, জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য টাকা নেই, পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি নিরক্ষর আমাদের দেশে, অথচ নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য টাকা নেই, পিছিয়ে-পড়া রাজ্যগুলিতে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য টাকা নেই, কোটি-কোটি বেকারদের বিষয়ে আলাদা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য টাকা নেই। কিন্তু ফৌজি বিমান কেনার জন্য টাকার অভাব হয় না, অতি-আধুনিক কামান-বন্দুক কেনার জন্যও হয় না, যেমন হয় না একেবারে-হালের সাবমেরিন কেনার জন্য। দেশকে-জাতিকে তো রক্ষা করতে হবে, শত্রুরা আমাদের সর্বব্যাপী অগ্রগতির কাহিনী শুনে অতীব ঈর্ষান্বিত, তারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, ধ্বংস করতে চায়, সুতরাং যে-ক'রেই-হোক আমাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতি বছর আরো প্রসারিত করতে হবে, আরো অনেক-অনেক টাকা ঢালতে হবে আমাদের সৈন্যবাহিনী-নৌবাহিনী-বিমানবাহিনী-গুপ্তচরবাহিনীকে সন্ত্রাস্ত, সন্ত্রাস্ততর করবার উদ্দেশ্যে, বিদেশ থেকে সংগোপনে আরো অনেক-অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে হবে। প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অতি সংবেদনশীল ব্যাপার, প্রকাশ্যে তা নিয়ে বেশি কথাবার্তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়: এটা সংসদ সদস্যদের তথা দেশবাসীদের ভালো ক'য়ে বুঝতে হবে, প্রতিরক্ষাহেতু কী সরঞ্জাম কিনছি-কোথা থেকে কিনছি-সাপ কিনছি না ব্যাঙ কিনছি তা নিয়ে দয়া ক'রে বেশি প্রশ্নাদি করবেন না, তাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হবে, আপাতত সবাইকে মেনে নিতে হবে দেশের সরকার যা করেন তা জাতির মঙ্গলার্থে। এই সরল সত্যটুকু যাঁরা বুঝতে চান না, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বাহুল্য নিয়ে সংসদে বা অন্যত্র বাগ্‌বিস্তার করেন, তাঁরা, প্রধান মন্ত্রী তো সেই গত বছরই ব'লে দিয়েছেন, দেশের শত্রু। এই শ্রেণীর মানুষেরা আদৌ চিন্তাভাবনা ক'রে দেখছেন না পাকিস্তানের শাসকবর্গ অহরহ আমাদের অনিষ্ট কামনা করছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে খোদ মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীরা সদা প্রস্তুত, তাই যে-ক'রেই-হোক আমাদের প্রতিরক্ষা

খাতে ব্যয়ের বহর বাড়িয়ে যেতেই হবে, পাকিস্তানের থোঁতা মুখ ভোঁতা করতে হ'লে অন্য-কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। দরকার পড়লে দেশের লোককে না খেয়ে থেকেও প্রতিরক্ষার আয়োজন নিখুঁত-সম্পূর্ণ করতে হবে, জয় হিন্দ্।

কিন্তু, গত দেড়-দুই বছর ধ'রে যে-সব রোমহর্ষক খবর বেরিয়েছে, তা থেকে তো আমরা জানি, অনেক বিষয়েই যা মনে হয় আসলে তা নয়। প্রতিরক্ষার টাকায় ঘুষের খেলা চলেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই গরিব দেশের মানুষ যে-টাকা উপার্জন করেছেন, তার একটি অংশ রাজস্ব হিশেবে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা পড়েছে, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা-প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সুশৃঙ্খলতর করার অছিলায় সেই টাকা সুইজারল্যাণ্ড অথবা জার্সি দ্বীপপুঞ্জ অথবা পানামা রাজ্যে বিভিন্ন বেনামী তহবিলে অদৃশ্য হয়েছে, সেই তহবিল থেকে ফের বেপাত্তা হয়েছে তারা, দেশের গরিব মানুষের টাকা দেশেরই মুষ্টিমেয় কিছু বড়োলোকের ভোগে লেগেছে, সমস্তই প্রতিরক্ষার নামে, দেশপ্রেমের নামে। চোর চুরি করবে, কিন্তু যেহেতু সে জনগণমনঅধিনায়ক গাইছে, জাতীয় নিরাপত্তা-প্রতিরক্ষার দোহাই পাড়ছে, অতএব তার সাত খুন মাপ।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার স্বেচ্ছায় কেন ত্যাগ করবো আমরা? গত বছর অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে যে-সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা আমাদের সরকারের তহবিল থেকে খরচ হয়েছে, তাতে সুইডেন অথবা ওরকম অন্য একটি-দু'টি অতিশয় ধনী, প্রাচুর্যে-উপচে-পড়া দেশে আরো কয়েক হাজার মানুষের কর্ম-সংস্থান হবে, জীবনযাত্রার মান ওখানে আরো-একটু উপরে উঠবে। সরল বাংলায় বলতে গেলে যার অর্থ দাঁড়ায়, ঐ সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহের মধ্যবর্তিতায় পৃথিবীর প্রায় দরিদ্রতম দেশ, ভারতবর্ষ, পৃথিবীর ঐশ্বর্যতম দেশগুলিকে আরো-একটু ধনবান্ হ'তে সাহায্য করছে, এবং সাহায্য করছে নিজেকে আরো-একটু হতমলিন ক'রে নিয়ে, নিজেকে আরো-একটু বঞ্চিত ক'রে নিয়ে। ঐ সাড়ে সাত হাজার কোটির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অর্থ হাতে পেলে সেচবাঁধব্যবস্থা খোল-নল্‌চে পাল্টে গোটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে পঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো ঐশ্বর্যবান ক'রে তোলা সম্ভব, মাত্র এক-পঞ্চমাংশ হাতে পেলে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা চালু ক'রে পশ্চিম বঙ্গে লক্ষ-লক্ষ কর্মসংস্থানহীন যুবক-যুবতীকে আশার আলো দেখানো সম্ভব, মাত্র এক-দশমাংশ হাতে পেলে পশ্চিম বঙ্গের চল্লিশ বছর ধ'রে ধুঁকে-মরা শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের অবশ্যকর্তব্যটিকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব…। তা ছাড়া, ঐ সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার অস্ত্র আমদানি তো মাত্র এক বছরের হিশেব, এই পরিমাণ খরচ তো প্রতি বছরই হচ্ছে, হয়তো এখন থেকে এই খরচের বহর আরো বেড়েই চলবে।

এমন নয় যে বলতে চাইছি প্রতিরক্ষা ব্যয়, অথবা প্রতিরক্ষাখাতে আমদানি,

শূন্যতে নামিয়ে আনা হোক। বলতে চাইছি, একটু সামলেসুমলে খরচ করা হোক, গরিব দেশের পক্ষে যা বেমানান, এমন ধারা খরচপাতি বন্ধ করা হোক, কারণ সরকারি টাকার, দেশের গরিব মানুষজনদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন যে-টাকার উৎস, তার, আমাদের মতো হতদরিদ্র দেশে, হাজার বিকল্প প্রয়োজন আছে। প্রতিরক্ষাতেই যদি এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করবো, তা হ'লে আমরা মস্ত বৈদেশিক দপ্তর খুলে বসেছি কেন, দেড়শো দেশে দূতাবাস পুষছি কেন? আর্থিক ক্ষেত্রে ঋণ-জর্জর অতি দীন দেশের পক্ষে বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য তো হওয়া উচিত বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে যথাসম্ভব বোঝাপড়ায় পৌঁছনো, যার পরিণামে প্রতিরক্ষার দায়ভার কমবে, সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র তথা নানা অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম আমদানির তাগিদও, যে-টাকা সব-মিলিয়ে বাঁচবে সেই টাকা তখন আমরা ঢালবো দ্রুত আর্থিক উন্নতির পুণ্য প্রয়াসে, বাঁধ তৈরির জন্য, জলনিকাশী ব্যবস্থা প্রসারের জন্য, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য, নতুন-নতুন কলকারখানা খোলার জন্য। দেশ তো ধুলোমাটি-কাঁকরের কণা নয়, দেশ মানে কোটি-কোটি নিরন্ন রোগগ্রস্ত অক্ষরবিহীন কর্মবিহীন মানুষগুলি। দেশবাসীদের একটু সুখের মুখ দেখাতে পারলে জাতীয় নিরাপত্তা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে, না তাঁদের অভুক্ত নিরক্ষর স্বাস্থ্যহীনতায় রেখে বিদেশ থেকে বোমারু বিমান-সাঁজোয়া গাড়ি আরো বেশি-বেশি পরিমাণে আনলে আমাদের মোক্ষমুক্তি ঘটবে, এই তর্কের বিচার দেশবাসীদের উপর ছেড়ে দিলেই তো হয়, তাঁরা নিরক্ষর হ'তে পারেন, কিন্তু নির্জ্ঞান নন, স্থূলে ভুল হবে না তাঁদের, বিশেষ ক'রে যেহেতু তাঁরা গত দেড় বছর-দু'বছরে মস্ত-এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন।

মিছিলে নেমে 'যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই' এই শপথে আমরা নিজেদের মুখরিত করি, লক্ষ পায়ের স্পন্দনে রাজপথ-জনপথ কম্পিত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাবধান করি আমরা, পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার পৃথিবীকে কোন্ সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভাববিহ্বল উচ্চারণে সেই সত্যকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশে যা ঘটছে, আমাদের শ্রেণীবিদ্বিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার কী আচরণ করছেন, প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তার নামে কোন্ অন্ধগলিতে আমরা উপনীত, সে-সব প্রসঙ্গ এখনো কিন্তু আমাদের বাঙ্ময়তায় ধরা পড়ছে না। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই: আর্থিক বিকাশ চাই, স্বাস্থ্যের প্রসার চাই, নিরক্ষরতার নির্মূল দূরীকরণ চাই, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিতালি-সৌহার্দ্য চাই, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মসংস্থান চাই, নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যাদির নায্য মূল্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা চাই। যুদ্ধবাজরা এই সব লক্ষ্যের কোনো-কিছুই চাইবে না, এই সব লক্ষ্য তাদের শ্রেণী-স্বার্থের পরিপন্থী, এই সব লক্ষ্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের আদর্শচেতনা

অভিলাষের পরিপন্থী। যদি যুদ্ধ না চাই, যদি শান্তি আমাদের কাঙ্ক্ষিত, তা হ'লে লাগাম-ছাড়া প্রতিরক্ষাব্যয়ের বিরুদ্ধেও মিছিলে-ময়দানের সভায় আমাদের সোচ্চার হ'তে হবে, শুধু দূরের আকাশ নয়, আমাদের কাছের আকাশকেও নিরুদ্বিগ্ন-মেঘশূন্য নীলিমার প্রান্তরে পরিণত করতে হবে, শান্তির শপথ অন্যথা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

ঝালেঝোলেঅম্বলে

শ্রীলঙ্কা-মালদ্বীপে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় ক'রে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠানো, না দেশের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া, কোন্‌টি বেশি প্রয়োজন? প্রতি বছর সাত-আট হাজার কোটি টাকার মতো অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানির মারফৎ বিদেশী পুঁজিপতিদের মুনাফা ফাঁপানো, অথবা বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা ক'রে, এবং সেই সঙ্গে নতুন বিনিয়োগের আয়োজন গ্রহণ ক'রে, দেশের কোটি-কোটি বেকারের জন্য কর্মসংস্থান করা, কোন্‌টি শ্রেয়তর?

পাগলা দাশুর মতো প্রশ্ন করা হলো হয়তো, কিন্তু উপায় কী। প্রলয়ংকর ঘূর্ণিবাত্যায় দক্ষিণ বাংলায় সুন্দরবনের লক্ষ-লক্ষ মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত, ঝড়ে-জলে তাঁদের জীর্ণ কুঁড়েঘর খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে, মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম, শস্য-গবাদি পশু বিধ্বস্ত, অথচ ন্যূনতম ত্রাণের জন্য টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে বের করা যাচ্ছে না। সেই সরকারের ভাণ্ডে টাকা নাকি বাড়ন্ত, হিশেব ক'রে খরচ করতে হয়, পশ্চিম বঙ্গে ত্রাণের জন্য দরাজ হাতে টাকা ঢাললে তা নাকি অপচয় হবে, কারণ, কে না জানে, পশ্চিম বঙ্গের সরকার বাম-ঘেঁষা, এবং বামপন্থীরা টাকার মর্যাদা বোঝে না, যে-কোনো ছুতোয় গরিবদের পিছনে টাকা ঢালে, অথচ হিশেব ক'রে টাকা খরচ করা কত প্রয়োজন, শ্রীলঙ্কায়-মালদ্বীপে সৈন্য বহাল রাখতে হচ্ছে, সুইডেন থেকে বাহারি কামান কিনতে হচ্ছে, ইংরেজদের কাছ থেকে নৌজাহাজ, আরো নানা জায়গা থেকে যুদ্ধবিমান-ক্ষেপণাস্ত্র-সমরসজ্জার সর্বাধুনিক বিবিধ উপকরণ-সরঞ্জাম।

আত্মসমালোচনা বাদ দিয়ে তো আত্মশোধন সম্ভব নয়। স্বীকার করা ভালো, যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির সপক্ষে আমাদের আন্দোলন একটু যেন, প্রাকৃত ভাষায় যাকে বলে, ঝিম মেরে গেছে। তারিখ-তিথি মেনে নিয়ে আমরা সভা-মিছিল করি, বয়ানে-বাঁধা ধুয়ো তুলে আকাশ চৌচির করার চেষ্টা করি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত সম্পর্কে নিজেদের তথা পড়শীদের সতর্ক করতে প্রয়াসশীল হই। কিন্তু সব-কিছুই নামতা-পড়ার মতো, খানিক বাদে নিজেরাই বুঝতে পারি, আমরা অসমর্থ, আমাদের হাজার বক্তৃতা সত্ত্বেও, দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের দিনযাপনের সমস্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা আবিষ্কার করতে পারছেন না। প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এমনকি প্রবীণদের কাছেও স্মৃতি অথবা স্মৃতিহীনতায় পর্যবসিত, যুদ্ধের ভয়াবহতা

সম্বন্ধে নতুন প্রজন্মের কোনো প্রত্যক্ষ ধ্যানধারণা নেই, শাদামাটা এই কথাটি অবশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট যে পারমাণবিক যুদ্ধ কোনোভাবে একবার শুরু হয়ে গেলে কেউই আমরা রেহাই পাবো না। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিবেকহীন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সারা পৃথিবী জুড়ে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, বিবিধ ফন্দিফিকিরে মত্ত, তা-ও যদি বা লোকেদের দিয়ে বিশ্বাস করানো যায়, কিন্তু এ-সমস্ত আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভাসা ভাসা থেকে যায়, একটা-দু'টো সভায়-মিছিলে অংশগ্রহণ করা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি শেষ পর্যন্ত এই মনোভাবই পারস্পরিক কথোপকথনে প্রকট হয়ে আসে।

এটা হয় সম্ভবত পাগলা দাশুর মতো প্রশ্নগুলি উচ্চারণ করতে আমরা বিরত থাকি ব'লেই। যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন ঐ দূরবর্তী মার্কিন হামলাবাজরাই শুধু করছে না। খোদ আমাদের দেশে শাসককুলও যে সমান উৎসাহে যুদ্ধের সরঞ্জাম-উপকরণের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, প্রতি বছর প্রতিরক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বরাদ্দ হু-হু ক'রে বাড়ছে, প্রতিরক্ষা খাতের সঙ্গে সম্প্রতি যোগ হয়েছে 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা' নামে অন্য-একটি খাত, এই দুই খাত জড়িয়ে যে-কাঁড়িকাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছে তার কোনো মাপজোক নেই; অথচ এই কথাগুলি অকপটে উচ্চারণ করতে আমরা ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত। এই দ্বিধার উৎস আবিষ্কার করতে তেমন বেগ পেতে হয় না। যদি আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়বাহুল্য নিয়ে সমালোচনা-মুখর হই, অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি কমাতে বলি, কিংবা গলা উঁচিয়ে দাবি করি পাকিস্তানে কী হচ্ছে-না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, পারমাণবিক বোমা আমরা কখনোই তৈরি করবো না, আমাদের সরকারের উচিত এই মর্মে শপথ ঘোষণা করা, শাসকদল তা হ'লে নতুন ক'রে প্রচারের ছুতো পাবে যে বামপন্থীদের দেশপ্রেমে ঘাটতি আছে, ওরা চীনের কিংবা পাকিস্তানের দালাল, ওদের বিশ্বাস করতে নেই। যেহেতু কোনো অবস্থাতেই জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বামপন্থীদের পক্ষে উচিত হবে না, শাসককুলকে অতএব আমাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলবার সুযোগ ক'রে দিতে নেই। আমাদের চেতনায় ছায়া ফেলে ১৯৪২ সালে জনযুদ্ধনীতি গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তী অভিজ্ঞতার স্মৃতি, ষাটের দশকের গোড়ায় চীনের সঙ্গে সীমান্তসংঘর্ষের মুহূর্তে বামপন্থীদের উপর যে-বীভৎস হামলা চলেছিল তার কথা, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ ক'রে ফের এক দফা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ। ঘরপোড়া গোরুর ভূমিকা আমাদের, সাবধান হ'তে শিখেছি আমরা, বিবেচনাজ্ঞান বেড়েছে আমাদের, দেশে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার নামে যে-ধরনের ব্যভিচার চলছে, তার বিরুদ্ধে আর চট ক'রে সোচ্চার হই না আমরা, চিন্তাভাবনা ক'রে এগোই। মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদ পাকিস্তান সরকারকে প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে, ঢালাও অস্ত্রশস্ত্র প্রতিদিন উপহার

পাঠাচ্ছে, এই অবস্থায় আমাদের সরকার যদি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো একটু জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে কী ক'রে তা হ'লে প্রতিবাদ-মুখর হই? আমাদের তাই দু'নৌকোয় পা দেওয়া অবস্থা, আমরা যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির সপক্ষে, অথচ খোদ নিজেদের দেশেই যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী সরকার পরম উৎসাহে প্রতিরক্ষার নামে ব্যয় বাড়িয়ে চলছে, নিয়ত বিদেশ থেকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আমদানি করছে, দেশের অভ্যন্তরেও অস্ত্রোৎপাদন, শুধু অব্যাহত নয়, বর্ধমান, জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে সরকার কর্তৃক নানা আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে দেশ ছেয়ে ফেলা হচ্ছে, সব-কিছু সম্পর্কেই আমরা নীরব থাকি। স্ববিরোধিতার কুম্ভিপাকে জড়িয়ে পড়েছি আমরা, নিজেদেরই বোঝাতে পারছি না, জনগণের কাছে গিয়ে তাঁদের ভালো ক'রে বোঝাবো তা হ'লে আর কোন্ কেরামতির উপর নির্ভর ক'রে?

ধনতান্ত্রিক প্রতিটি দেশে যুদ্ধবাজরা হিশেব কষছে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই তাদের নিত্য-নতুন অস্ত্রশস্ত্র তৈরির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়, সে-সব অস্ত্রশস্ত্র তারপর তারা বিভিন্ন গরিব দেশের সরকারের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নানা ধান্দায় মনোনিবেশ করে। সঙ্গে-সঙ্গে তারা কোনো চরম অস্ত্র আবিষ্কারের খোয়াবও দেখে, যেই অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে এক মুহূর্তে গোটা সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে, অথবা স্বপ্ন দেখে নক্ষত্রযুদ্ধের, যে-যুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রগতিশীলধ্যানধারণামণ্ডিত সমস্ত প্রবণতাকে তারা পৃথিবী থেকে নির্মূল করবে। পুঁজিওয়ালাদের বিশ্বব্যাপী চক্রান্তের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবী জুড়ে আদর্শবাদীদের সংঘবদ্ধ হ'তে হবে, পুঁজিওয়ালাদের চক্রান্ত নিছক সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, সামগ্রিক মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে, তাদের বর্বর অভিযান প্রতিহত করতে না পারলে মহাদেশের পর মহাদেশ জুড়ে চরম সর্বনাশের আশঙ্কা। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই, জীবন রচনা করতে চাই, প্রতিটি দেশে শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে অর্থব্যবস্থার বিকাশ দেখতে চাই, চাই শ্রী-সম্পদ-সুখের সমানুপাত ব্যাপ্তি, আমাদের সুসংহত প্রতিরোধে মার্কিন হামলাবাজরা ও তাদের অনুগামী-অনুচরদের ষড়যন্ত্র গুঁড়িয়ে-মিলিয়ে দিতেই হবে, মানবসভ্যতাকে বাঁচাবার অন্য-কোনো উপায়ই নেই।

কিন্তু প্রতিরোধের পরিখা তো গড়তে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। আমাদের দেশের অভুক্ত জনগণ, সংকটে আকণ্ঠ ডুবে-থাকা জনগণ, যাঁদের অভাবে-অস্বাস্থ্যে-অজ্ঞানের অন্ধকারে সুপরিকল্পিতভাবে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। কোনো মার্কিন যুদ্ধবাজকে তাঁরা চোখে দেখেননি, পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁদের কাছে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা আপাতত পণ্ডশ্রম, তাঁদের কাছে উৎকীর্ণ সমস্যা প্রতি-দিন বেঁচে থাকার সমস্যা। ঝড়ে-জলে বিপন্ন তাঁরা, অন্নহীনতায় বিপন্ন তাঁরা, তাঁদের কাছে প্রকটতম সত্য অভাবগ্রস্ততা, শিক্ষার-স্বাস্থ্যের-সুযোগের অভাব,

পানীয় জল-সেচের জলের অভাব, জীবিকার সুযোগের অভাব। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্রের দাম প্রতি সপ্তাহে লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ে, অথচ দিনমজুরি বাড়ে না, কর্মজীবীর বেতনভাতা বাড়ে না, এই সত্য জড়িয়ে যে-সংকট, দেশের সাধারণ মানুষ তার মর্মমূলে অচিরে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু দৈনন্দিন বেঁচে-থাকার এই সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বজোড়া শান্তি আন্দোলনের অন্তর্গূঢ় রহস্যটি বুঝে উঠতে পারেন না।

বুঝে উঠতে পারেন না আমাদের বোঝানোয় একটি বিশেষ ফাঁক থেকে যায় ব'লেই। বিদেশী হামলাবাজদের সঙ্গে আমাদের স্বদেশী শাসককুলের শ্রেণী-চরিত্রগত মিলের প্রসঙ্গটি আমরা উহ্য রাখি। বন্যায়-ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে হাজার-হাজার গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়, কোটি-কোটি মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত, কিন্তু সরকারের হাতে ত্রাণের টাকা নেই, ত্রাণে টাকা ঢালতে গেলে প্রতিরক্ষায় টান পড়বে যে তা হ'লে। বিদেশ থেকে প্রতি বছর সাত আট হাজার কোটি টাকার অস্ত্র আমদানি করতে টাকার অভাব হয় না, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব উত্থাপন করলে অর্থাভাব দেখা দেয়, গ্রামে-গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে দেখা দেয়। আমাদের সামরিক বাহিনীকে শ্রীলঙ্কায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবার দায়িত্বে বহাল রাখতে প্রতিদিন সব-মিলিয়ে তিন কোটি টাকার মতো খরচ করতে হয়, সেই টাকার জোগানে টান পড়ে না, কিন্তু যে-মুহূর্তে বলা হয় বন্ধ কলকারখানা খুলতে হবে, সরকার থেকে অর্থের ব্যবস্থা করা হোক, অথবা নতুন শিল্পের বিনিয়োগে সরকারি তহবিল থেকে টাকা ছাড়া হোক, সঙ্গে-সঙ্গে হাত উল্টিয়ে জানানো হবে, সম্ভব নয়, সঞ্চয়ে ঘাটতি আছে, টাকা নেই। গুপ্তচরবাহিনী পুষতে টাকার অভাব হয় না, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে হয়। সব ছাপিয়ে নাকি দেশকে টিঁকিয়ে রাখার, দেশের প্রতিরক্ষা জোরদার করার দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারের টাকার অভাব ঘটলে নোট ছাপানো হয়, বাজারে সেই নোট ছড়িয়ে পড়লে জিনিশপত্রের দাম বাড়ে, অভুক্ত মানুষগুলি আরো-একটু অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাঁরা পুরোপুরি মারা না পড়লে হয়তো দেশকে টিঁকিয়ে রাখা অসম্ভব।

কিন্তু, আমাদের মনে জড়তা, স্পষ্ট উচ্চারণে এই কথাগুলি বলতে আমরা ভয় পাই। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিকতায় শান্তি আন্দোলনের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা বোবা ব'নে যাই: কী জানি, যদি নিন্দা রটিয়ে দেওয়া হয়, আমরা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-কমানোর কথা বলছি, আমাদের দেশপ্রেম নেই, আমরা দেশদ্রোহী, একবার অপবাদ রটলে, তা যত মিথ্যাই হোক, তাকে খণ্ডন করার হুজ্জোতি অনেক, তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো।

অতএব আমরা নীরব থাকি, যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির সপক্ষে স্লোগানে ঠোঁট

নাড়ি, জনগণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই স্লোগানের অন্তর্লীন অভিব্যক্তির মিল ব্যাখ্যা করার দিকে ভয়েও এগোই না। মার্কিন যুদ্ধবাজদের খপ্পরে প'ড়ে পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায় কী ক'রে ঐ দেশটাকে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি হিশেবে ব্যবহার করছে তা নিয়ে কুপিত হই, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর চরিত্রগত তথা আচরণগত সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি না, উভয় দেশের স্বভাবযুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে দুই দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ করার প্রসঙ্গের ধার-কাছ দিয়েও যাই না।

সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে অবশ্যই সোচ্চার হবো, প্রতিরোধের পরিখা গড়বো, কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গে, নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অক্ষমতা সম্পর্কে কেন সচেতন হবো না? আত্মসমালোচনা বাদ দিয়ে তো আত্মশোধন অসম্ভব। ঝালেঝোলেঅম্বলে জড়িয়ে-থাকার মতো সুবিধাবাদের মোহ যদি পরিত্যাগ না করতে পারি, কোন্ আদর্শের অহংকার নিয়ে জনগণের মুখোমুখি হবো তা হ'লে আমরা?

মাতৃভাষা ইংরেজি চাই

আশা করি দুয়ো দেবেন না কেউ, আমার ভীষণ স্বদেশী হ'তে ইচ্ছে করছে। স্বদেশী হওয়া মানে কি ব্রাত্য হওয়া, আমার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে আমি কি স্খলিত হয়ে গেলাম ?

ঠিক বুঝতে পারি না।

ঠিক বুঝতে পারি না, চৌরাস্তার মোড়ে ওজস্বী ভাষায়—ইংরেজি বুকনি-ভরা, অনেক-সময়ই ভুল ইংরেজি বুকনি-ভরা ওজস্বী ভাষায়—বক্তৃতা হচ্ছে, বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাস করেন এমন-দাবি-করেন এমন-এক দল, বক্তৃতার উপজীব্য, যে ক'রেই হোক ইংরেজি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যারা ইংরেজি তুলে দিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে চাইছে তারা নাকি গরিবদের শত্রু, তারা সমাজতন্ত্রের শত্রু, তাদের উৎখাত করতে হবে।

ওপারের বাংলায় মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শত-শত তরুণ-তরুণী-বালক-বালিকা-শিশু আত্মদান করেছে, এক আশ্চর্য-উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে তারা। এপার বাংলায় আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ঠিক উল্টোমুখো: মাতৃভাষা নয়, সাম্রাজ্যবাদীরা যে-ভাষার মধ্যবর্তিতায় দেড়শো-দু'শো বছর রাজত্ব ক'রে গেছে, সেই ইংরেজি ভাষায় যদি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত না রাখা হয় তা হ'লে, শাসানো হচ্ছে, প্রলয়কাণ্ড বইয়ে দেওয়া হবে। এঁদের যা দাবি, তা, মনে হয়, মাতৃভাষা বাংলা নয়, ইংরেজি হওয়া চাই।

এ-সমস্ত উল্টোবুঝলিরামদের বুঝতে পারছি না।

গোটা পশ্চিম বাংলায় দেড়কোটি-দু'কোটি শিশু, শতকরা নব্বুই ভাগ গ্রামে, তাদের মধ্যে এখনো অর্ধেকেরও বেশি অক্ষরপরিচয়ের সুযোগটুকু পর্যন্ত পায়নি। পাঠশালা-প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন কাতারে-কাতারে খোলা হচ্ছে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পুরো অবৈতনিক করা হয়েছে, গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য জামাকাপড়, শেলেট-পেনসিল-পাঠ্যপুস্তক, একবেলা সামান্য আহার্য, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মাইনেপত্তর বাড়িয়ে দিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাতে দক্ষতর শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে থাকেন। এই লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়েদের মাতাপিতৃপুরুষরা লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, সমাজের অধোমর্ণ-শোষণের উপজীব্য হয়ে থেকেছেন তাঁরা যুগের-পর-যুগ ধ'রে। তাঁদের

ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য এখন একটু আলাদা ক'রে ভাবা হচ্ছে, আহা, একটু লেখাপড়া শিখুক তারা, একটু অক্ষরপরিচয় ঘটুক তাদের, একটু যোগবিয়োগ-গুণভাগ রপ্ত হোক তাদের। তা হ'লে নিজের পায়ে আরো-একটু জোরদার হয়ে দাঁড়াতে শিখবে তারা; পৃথিবীর হালচাল একটু আরো স্পষ্ট ক'রে খোলসা হবে তাদের কাছে। একটু-আধটু লেখাপড়া শেখা থেকেই তারা অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারবে, তাদের অনুভূতি-অভিজ্ঞতাগত জ্ঞানের সঙ্গে লেখাপড়া থেকে আহৃত জ্ঞানের সাযুজ্য ঘটবে, তারা বুঝতে শিখবে সমাজে-সংসারে যা হওয়া উচিত তা হ'তে পারে না অনেক সময়ই, হ'তে পারে না কারণ হ'তে দেওয়া হয় না, কেউ-কেউ এই হ'তে-দেওয়াটাকে আটকে রাখেন নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে-গোষ্ঠীস্বার্থে-শ্রেণীস্বার্থে। এই অন্যায়কে প্রতিহত করতে হ'লে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন। লড়াই ছাড়া গতি নেই, এবং লড়াইতে ভালো ক'রে যাতে উৎরোনো যায়, সংগ্রামে যাতে জেতা যায়, সেজন্যই এটা জরুরি যে যত দ্রুত সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষার ঢেউ গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুক, বস্তি এলাকায়, শ্রমিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ুক; গরিব ঘরের মানুষগুলি যত বেশি লেখাপড়া শিখবে, তত বেশি চোখ-কান খুলবে তাদের, তত বেশি সাধারণ মানুষের আন্দোলনের বাঁধুনি আরো দৃঢ় হবে।

কিন্তু এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি খোলা হলো, গরিব ঘরের ছেলেমেয়েগুলি সেখানে ঢুকেই কি গলাধাক্কা খাবে? বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো, মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য-এক বিদেশী ভাষার বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে প্রথম দিন থেকেই? তারা তো ভাষার গহনে ঢুকছে, কারণ এই ভাষার মধ্যবর্তিতায় তারা জ্ঞানের খিড়কি দুয়োরে পৌঁছুতে চায়। যে-ভাষায় তারা তাদের আবেগ-ইচ্ছা-অনুভূতিকে ব্যক্ত করে, সেই ভাষার মধ্যবর্তিতায় তারা অনেক সহজে এগোতে পারবে। অজানা, অচেনা পৃথিবীতে প্রবেশ করছে তারা, তাদের মনে শঙ্কা, ভয়, কিন্তু এই মুহূর্তে অন্তত শিক্ষার বাহন যদি হয় তাদের চেনা-জানা মাতৃভাষা, তা হ'লে প্রাথমিক ভীতি, একটু-একটু ক'রে, তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে। সুতরাং, দোহাই, অযথা বাড়তি ভার চাপিও না তাদের উপর; মাতৃভাষায় অক্ষরপরিচয় ঘটুক তাদের, মাতৃভাষাকে সোপান হিশেবে ব্যবহার ক'রে, জ্ঞান থেকে অন্যতর জ্ঞানে একটু-একটু ক'রে, র'য়ে-স'য়ে, তাদের এগোতে দাও। তাদের প্রয়োজনের অগ্রাধিকার বাড়তি বিষয়জ্ঞানে, বাড়তি ভাষাজ্ঞানে নয়। যে-ছেলেমেয়েগুলির ঘরবাড়িতে কোনো অতীত-পুরুষে লেখাপড়ার সুযোগ আদৌ ছিল না, তাদের গ্রহণক্ষমতা তেমন বেশি নয় এই মুহূর্তে। একটু সইয়ে-সইয়ে আমাদের এগোতে হবে, অন্যতর বিদেশী ভাষার প্রসঙ্গ তাই আপাতত উহ্য থাক না। নিজেদের মাতৃভাষাতেই লেখা পুঁথিপত্র উপস্থিত রপ্ত করতে দাও ওদের, তার বেশি বিরক্ত ক'রো না,

ওরা ঘাবড়ে যাবে, ওরা ভয়ে হিম হয়ে আসবে। জোর ক'রে আরো বাড়তি ভাষার বোঝা চাপালে ওরা ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে যাবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় আর ঘেঁষবে না। তাই কি চাই আমরা?

আসলে এখানেও শ্রেণীস্বার্থ। এই গরিবঘরের ছেলেমেয়েদের পিতৃপুরুষগণকে প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম ধ'রে শোষণে দীর্ণ করা হয়েছে, সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সেই একই শ্রেণীস্বার্থ এখন নতুন ক'রে উত্থাপিত; ঐ ছোটো-লোকগুলির সন্তানাদির জন্য মাতৃভাষায় অক্ষরপরিচয়ের ব্যবস্থা হয় হোক, ওদের পক্ষে ওইটুকুনই যথেষ্ট, কিন্তু তা ব'লে আমাদের ছেলেমেয়েদের কেন ইংরেজিতে পঠনপাঠন শুরু করার জন্য আরো তিন চার বছর অপেক্ষা করতে হবে? এই বক্তব্যটি স্পষ্ট ক'রে বলতে অথচ একটু লজ্জা পান এই আত্মরতিসমাচ্ছন্ন ভদ্র-মহোদয়-মহোদয়রা: গণতন্ত্রের মধ্যে আছি, কী ক'রে বলি আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা বাড়তি সুযোগ ক'রে দিতে হবে সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব খরচ ক'রে। সরকার থেকে যখন বলা হয়, গরিব আর বড়োলোকদের জন্য আলাদা-আলাদা উপচার সম্ভব নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সবাইকে সমানভাবে পরিচর্যা করতে হবে, আমাদের সংবিধানেব নির্দেশও তাই, তখন, রুদ্ধমনস্কাম এঁরা, বাগটা গিয়ে পুঞ্জীভূত হয় মাতৃভাষার উপর, শুধু মাত্র মাতৃভাষায় যাঁরা প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করেছেন সেই রাজ্য সরকারের উপর।

এবং, তারপর, এই শ্রেণীস্বার্থান্ধদের সম্প্রদায় অন্য-এক যুক্তির সুড়ঙ্গে সুড়ৎ ক'রে ঢুকে পড়েন। ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, যাঁরা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানেব প্রবক্তা, তাঁরা আসলে দ্বিজাতিতত্ত্বে, দ্বিশ্রেণীতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা ভুয়ো বামপন্থী, তাঁরা শ্রেণীভেদপ্রথা বরাবরের মতো চালু রাখতে আসলে বদ্ধপরিকর। প্রমাণ: তাঁরা ইংরেজিনবিশ বিদ্যালয়গুলি তুলে দিচ্ছেন না, বিত্তবানরা, যেহেতু তাঁরা আর্থিক দিক থেকে সক্ষম, এ-ধরনের বিদ্যালয়ে বেশি মাইনে মাসে-মাসে গুণে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন, এই ছেলেমেয়েরা ইংরেজি ভাষার মধ্যবর্তিতায় আরো অনেক বেশি তুখোড় হচ্ছে, দক্ষ হচ্ছে, জ্ঞানান্বিত হচ্ছে, ফলে জীবিকার সমস্ত সুযোগসুবিধাগুলি অতি অবলীলায় তাঁদের কুক্ষিগত হচ্ছে। অন্য দিকে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা, তাদের বাবা-মার সামর্থ্য নেই, ইচ্ছা থাকলেও তারা এ-সব বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে পারছে না, সুতরাং তারা পিছিয়ে পড়ছে, প্রতিযোগিতায় হ'টে যাচ্ছে, বড়োলোকের ঘরের ছেলে-মেয়েদের আধিপত্য অনন্তকালের জন্য অতএব অটুট থাকছে; যদি এই রাজ্য সরকার সত্যি-সত্যি সাম্যবাদী চেতনাসম্পৃক্ত হতো, তা হ'লে হয় ফতোয়া দিয়ে, নয় তো আইন প্রবর্তন ক'রে, এই ইংরেজিনবিশ বিদ্যালয়গুলিকে তুলে দিত। তুলে যে দিচ্ছে না, তা থেকেই প্রমাণ হয় এই সরকার গরিবদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত, অভিসন্ধি ফেঁদে গরিবঘরের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি শেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখছে, অন্য পক্ষে বড়োলোকের ছেলেমেয়েরা বেসরকারি বিদ্যালয়ের সুযোগ গ্রহণ ক'রে ঝটপট-ঝটপট এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই শিক্ষানীতি জনস্বার্থবিরোধী, এই শিক্ষানীতির প্রবর্তক রাজ্য সরকার ভেক বামাচারী, আসলে উচ্চবিত্তদের সুযোগ-সুবিধা চিরকালের জন্য পাকাপোক্ত করবার গভীর লক্ষ্য মনে রেখেই তার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।

যাঁরা ছোটোলোকগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশটাকে কোন্ অতলে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে সকাল-বিকাল বিলাপ করেন, তাঁদের মুখে এবংবিধ যুক্তি উচ্চারিত হ'তে দেখলে কৌতুকের উদ্রেক হয়। তা হ'লেও যুক্তিটির জবাব দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার ইংরেজিনবিশ বিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ ক'রে দিতে পারেন মাত্র—যা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে—, কিন্তু এ-ধরনের বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ ক'রে দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেসরকারি মালিক বিদ্যালয় খুলবেন, ইংরেজিতে পড়ানোর ব্যবস্থা করবেন, মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায় পড়ানোর ব্যবস্থা রাখবেন না, টাকাওয়ালা মানুষরা বেশি মাইনে গুণে নিয়মিত তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই বিদ্যালয়গুলিতে পাঠাবেন। কোনোরকম বাধা দিতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটবে, আদালতে ছুটোছুটি হ'তে থাকবে, সংবিধান লঙ্ঘন করার ভয়ংকর অভিযোগ উঠবে। সুতরাং শ্রেণীবিভাজিত শিক্ষার জন্য যদি দুয়ো দিতে হয়, তা হ'লে দুয়ো দিতে হয় সংবিধানকে, রাজ্য সরকারকে নয়, ধিক্কার দিতে হয় সমাজব্যবস্থাকে, যে-ব্যবস্থায় এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ তাঁদের সন্তানাদির জন্য টাকা দিয়ে, এমনকি লেখাপড়ার ব্যাপারেও, আলাদা সুযোগসুবিধা তৈরি ক'রে নিতে পারেন।

কিন্তু যদি বলি, এই সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর জন্যই তো প্রয়োজন মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ ব্যাপ্ততর-বিস্তৃততর করা? মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায় শিক্ষাদান যত বেশি দ্রুততর হবে, যত বেশি লাখো-লাখো গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে, তত তাদের চোখ-কান খুলবে, তত তারা পৃথিবীর ব্যাকরণ রপ্ত করতে পারবে, তত বেশি তাদের হৃদয়ঙ্গম হবে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হ'লে জোট বাঁধা প্রয়োজন, তত বেশি জোট বাঁধা হবে, সাধারণ মানুষের আন্দোলনে তত বেশি দার্ঢ্য আসবে, সমাজবিপ্লব তত বেশি ত্বরান্বিত হবে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ক্রান্তিলগ্ন তত বেশি এগিয়ে আসবে। শ্রেণীহীন সমাজকে, স্বপ্নের আকাশ থেকে, দ্রুত ছিনিয়ে এনে মাটির পৃথিবীতে আমরা নামাতে চাইছি ব'লেই মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন।

কিন্তু কাদের কাছে বলা এই কথাগুলি? যাঁরা জেগে ঘুমোন, তাঁদের তো

জাগানো যায় না। যাঁরা বলেন, ছ'বছর থেকে ন'বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি না পড়লে, তারপর দশ বছর বয়স থেকে শুরু ক'রে যতই পড়া হোক না কেন, বাংলা ভাষাচর্চার তথা বাংলা সাহিত্যের চরম সর্বনাশ ঘটবে, সেই সম্মানিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হয়েই বা কী লাভ? আসলে ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে চ'লে যেতে বাধ্য হয়েছে ব'লে এঁরা বড়ো অসহায় বোধ করছেন, এঁদের বিরস দিন-বিরল কাজ, প্রেমিক এঁরা, প্রবল বিদ্রোহে বিদেশী ভাষাকে আর-একবার প্রেমমদির প্রত্যুদ্গমন ক'রে আনার তাগিদে এঁরা অস্থির। সম্মানিত সব পণ্ডিত-মনীষী, এঁদের মধ্যে একজন সম্প্রতি মস্ত প্রবন্ধ ফেঁদেছেন, শেক্‌সপীয়র, কীট্‌স, শেলী, স্যুইনবর্ণ, বর্নস প্রভৃতির কাব্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে নাকি বাংলা সাহিত্য অথর্ব হয়ে যাবে, এবং ছ'বছর বয়স থেকে না শিখে দশ বছর বয়স থেকে ইংরেজি শিখলে নাকি এই পরিচয় হওয়া সম্ভব নয়। এই উক্তির যুক্তি বোঝা কঠিন : বাঙালি কবিসাহিত্যিক আদি ভাষায় হোমার-ভর্জিল পড়েনি, দাঁতে পড়েনি, পড়েনি গোয়টে বা বদলেয়ার অথবা মালার্মে, বাংলা সাহিত্য তথাচ অথর্ব হয়ে যায়নি, কিন্তু, যদি কোনো ঘটনাসম্পাতে, ইংরেজ কবিদের রচনাপাঠ বন্ধ থাকে, কিংবা তিন-চার বছরের ব্যবধানে তা শুরু হয়, তা হ'লেই তুঙ্গ সর্বনাশ : মহারানী ভিক্টোরিয়াভারাতুর এই বিবৃতিতে ভারসাম্য কোথায়?

এ-ধরনের ক্লেদাক্ত, হীনমন্য, পরাঙ্মুখী কথাবার্তা যাঁরা বলেন, মনে হয় তাঁদের প্রতি অকরুণ হবার সময় এসেছে, বিনয়-অনুকম্পা ইত্যাদির ঋতুশেষ, যাঁরা সমাজ-বিপ্লবকে ব্যক্তিগোষ্ঠীশ্রেণীস্বার্থে, অথবা নিছক মূঢ় কুসংস্কারের বশে, আটকে দিতে চাইছেন, তাঁদের খোলা আকাশের নিচে জনতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে হিশেবটা দাখিল করতে বলতেই হয় এবার। কিন্তু ঐ অন্য যাঁরা আছেন, যাঁরা সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাস-করেন এমন-দাবি-করেন এমন-এক-দল গড়েছেন, দল গ'ড়ে ইংরেজি-বুকনি-ভরা তত্ত্বকথা চৌরাস্তার মোড়ে সাধারণ মানুষের উপর চাপাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য একটু করুণাই হয়। একটু ক্ষমাঘেন্না করুন, এঁরা ভয়গ্রস্ত, ঐ দু'চার বছর বাদ দিয়ে ইংরেজি শেখা শুরু করলে যদি, বলা তো যায় না, কোনো অঘটন ঘ'টে যায়, দেশের লোকগুলি যদি সত্যি-সত্যি ইংরেজি ভুলেই যায়, কী উপায় হবে তা হ'লে এই দলের, এই দলের নেতাদের, ইংরেজি-বুকনি-ভরা তাঁদের ভাষা চৌরাস্তার মোড়ে যদি কেউ বুঝতে না পারে?

আমরা স্বদেশী হ'তে গিয়ে এঁদের যদি কর্মহীনতায় পর্যবসিত করি, ঘোর পাপাচার হবে না কি তা? বিশ্বাস করুন, এই পাপভারাতুরতার আতঙ্কে আমি আপাতত বিলাপগ্রস্ত, আমার কণ্ঠে উদ্গত আর্তনাদ : 'মাতৃভাষা ইংরেজি চাই'।

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে। একজন-দু'জন বেপরোয়া আছেন, তাঁরা বলবেন। বিশ্বভারতীর আচার্য, জ্ঞান-বিদ্যা-পাণ্ডিত্য-মনীষা-বিবেচনা-বিচক্ষণতার ভারে যিনি নুয়ে পড়েছেন, বাণীদান ক'রে গেছেন গত সপ্তাহে, মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা নাকি আদৌ সম্ভব নয়। এই আচার্য মহোদয় দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় ভোগেন না। তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই, যেন তিনি নিজে কত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়ন-অধ্যবসায়ের দুরূহ চড়াই-উৎরাই অতিক্রম ক'রে এসেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার সারকথা এখন দেশবাসীদের কাছে নিবেদন করছেন, ইংরেজি ভাষা না-জানলে বিজ্ঞানের গহনতম রহস্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করা অসম্ভব, প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নাকি তাই।

যদি আচার্য মশাই একটু রেখে-ঢেকে বলতেন, যদি বলতেন সব ভাষায় শব্দের ভাণ্ডার সমান ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয়, কোনো-কোনো ভারতীয় ভাষা শব্দ-সম্ভারের দিক থেকে এখনো খানিকটা পিছিয়ে আছে, এই মুহূর্তে ঐ-ঐ ভাষার মধ্যবর্তিতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় কিছু-কিছু ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দিতে বাধ্য, তাঁর কথায় সমর্থন জানাতে অসুবিধা হতো না। কিন্তু না, তিনি রেখে-ঢেকে বলার মানুষই নন, তিনি সব সময় অনন্ত সত্য বিতরণ করেন। গুরুমুখীর মতো ভাষায় কদাপ নাকি প্রযুক্তি তথা বিজ্ঞান অধ্যয়ন সম্ভব নয়।

অথচ এই আচার্য মহোদয় বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন, ছুতো পেলেই বেরিয়ে পড়েন, মন্ত্রীশাস্ত্রী পরিবৃত হয়ে জাপানে গেছেন বেশ কয়েকবার। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাপান বহু বছর ধ'রে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে, ঐ দেশের বৈভব প্রযুক্তির এই অভাবনীয় প্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। জাপানের কাছাকাছিও আসতে পারছে না অন্য-কোনো দেশ, এমনকি খোদ মার্কিন দেশে আধুনিক ইলেকট্রনিক পণ্যসরঞ্জাম-যন্ত্রপাতি যা বিক্রি হচ্ছে তার অন্তত সত্তর ভাগ জাপান থেকে আমদানি। ইওরোপে যত গাড়ি কেনা হয় প্রতি বছর, তার অন্তত অর্ধেক জাপান থেকে আসছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়-প্রযুক্তির নৈপুণ্যে জাপান এখন এতটাই এগোনো যে উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় হ'টে যাচ্ছে দেশের পর দেশ। যত সস্তায় যত উৎকৃষ্ট পণ্য জাপান বাজারে ছাড়তে পারছে, অন্য-কোনো দেশের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও সে-ধরনের সম্ভাবনা পরাহত।

অথচ এই আশ্চর্য অগ্রগতি ঘটেছে জাপানে সম্পূর্ণ মাতৃভাষার উপর নির্ভর

ক'রে। কাতারে-কাতারে বিশ্ববিদ্যালয়-কারিগরি বিদ্যালয়-গবেষণাগার থেকে প্রতি বছর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্ বেরোচ্ছেন। প্রতিটি কারখানায় আধুনিকতম প্রযুক্তির সঙ্গে কর্মীদের বিশদ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এলাহি ব্যবস্থা, কিন্তু সব-কিছুই হচ্ছে মাতৃভাষায়। জাপানের মানুষজন বিদেশী ভাষার চর্চায় আদৌ রপ্ত নন, এই একটি ব্যাপারে প্রতিভা মোটেই খোলে না। কিন্তু সামান্যতম ক্ষতি হয়নি তাতে, নিজেদের ভাষাকে এতটাই শাণিত ও সম্ভারযুক্ত ক'রে তুলতে তাঁরা সফল হয়েছেন যে বিজ্ঞানের দুরূহতম তত্ত্ব, প্রযুক্তির শাণিততম আবিষ্কারের সারাৎসার প্রকাশ করতে বিন্দুতম অসুবিধা হচ্ছে না। তাঁরা গবেষণা-বিজ্ঞানচর্চা যেমন নিজেরা চালিয়ে যাচ্ছেন মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায়, পাশাপাশি পৃথিবীর অন্য-সমস্ত দেশে নতুন-নতুন যা আবিষ্কার বা প্রযুক্তি-প্রয়োগ ঘটছে সে-সম্পর্কেও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জানতে পারছেন ব্যাপক অনুবাদের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে-বই অথবা গবেষণাপত্রই এ দেশে-ও দেশে প্রকাশিত হোক না কেন, এক মাস-দু'মাসের মধ্যে জাপানি ভাষায় তা অনূদিত হচ্ছে, কোনো জ্ঞান তথা প্রযুক্তিই জাপানিদের আয়ত্তের বাইরে থাকছে না। ইংরেজি বা জর্মান বা ফরাশি বা ঐ ধরনের কোনো ইওরোপীয় ভাষা না জানলে আধুনিকতম জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে, এই ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে পুরোপুরি খণ্ডন করছে জাপানের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্বভারতীর আচার্য মহোদয় ব্যস্ত মানুষ, ঠিক-ঠাক সব খবর রাখতে পারেন না, নিজেও লেখাপড়ার ব্যাপারে তেমন অগ্রসর হ'তে পারেননি, তিনি যে-শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন নিত্যক্রিয়াপদ্ধতি, তাই ঐ বিশেষ উক্তি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে একটা বড়ো সন্দেহ থেকেই যায়। যে-ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তাতে শ্রেণীস্বার্থের ইশারাই যেন প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। মাতৃভাষার মারফৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ঘটলে তা ছড়িয়ে পড়বে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলিত প্রয়োগ সর্বব্যাপী আকার ধারণ করবে, দেশের দরিদ্রতম অধিবাসীও তা হ'লে একটু-একটু ক'রে বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে সফল হবেন, তাঁরও চোখ-কান খুলবে, চোখ-কান খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজব্যবস্থা-সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্নের উদয় হবে, বড়ো বিপজ্জনক উপত্যকায় তা হ'লে পৌঁছে যাবো আমরা, শাসককুলের পক্ষে তা মোটেই সুখকর হবে না। সুতরাং মাতৃভাষার অভিযাত্রা রুখে দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। যে-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাঁরা তথাকথিত নবোদয় বিদ্যালয়গুলি থেকে মাতৃভাষা বিসর্জন দিতে চাইছেন, সেই একই মানসিকতার প্রেরণায় বিশ্বভারতীর আচার্য মহোদয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপযোগিতা নিয়ে কটাক্ষপাত করছেন। তিনি যদি

এমনও বলতেন, আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানের তথা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একেবারে হালে বিদেশে কী-কী ঘটছে তা অবগত হওয়ার জন্য ইংরেজির মতো অন্তত একটি ভাষা জানা বাঞ্ছনীয়, গ্রহণযোগ্য হতো সেরকম ঘোষণা, কিন্তু না, তাঁর বাচনে কোনো অস্পষ্টতা নেই: গুরুমুখী-টুকমুখী গোছের মাতৃভাষা দিয়ে কিছু হবার নয়, যদি বিজ্ঞানে এগোতে হয়, প্রযুক্তিতে দীক্ষিত হ'তে হয়, তা হ'লে একমাত্র ইংরেজি চাই, ইংরেজি বিনা ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অনুরূপ এক মন্তব্য জনৈক অধ্যাপক মহোদয়ও কয়েক বছর আগে করেছিলেন, শেক্সপিয়র-ড্রাইডেন-মিল্টন না পড়লে, অর্থাৎ ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, বাংলা ভাষায় নাকি কবিতা রচনা অসম্ভব। সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে চল্লিশ বছরের উপর, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামি করবার মনোবাসনায়, কারো-কারো ক্ষেত্রে অন্তত, যতি পড়েনি এখনো: তোমার ফুলবাগিচায় রইবো চাকর, আমায় চাকর রাখো জা।

অথচ খুব বেশি দূর যেতে হয় না, বাংলাদেশের দিকে তাকালেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বর্তমান আচার্যের বক্তব্যের তুচ্ছতা প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, সেই দেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, সেই ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের মানুষেরা যুদ্ধ করেছেন, আত্মোৎসর্গ করেছেন, অনেক ত্যাগের-লাঞ্ছনার-শৌর্যের ইতিহাস অতিক্রম ক'রে এসেছেন। মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁদের অপার গর্ব, মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের অসীম মমতা। সেই গর্ব ও মমতার সংস্থানে দাঁড়িয়ে গত সতেরো-আঠারো বছরে বাংলা ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে, তাঁরা একটির-পর-আরেকটি অধ্যবসায়ের প্রান্তর নিরন্তর অতিক্রম ক'রে গেছেন, যাচ্ছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি অস্থির, সামাজিক বিন্যাস এখনো নানা কলুষে জর্জরিত, কিন্তু সে-সমস্ত কোনো-কিছুর জন্যই মাতৃভাষার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে থাকেনি, ভাষা নিয়ে সহস্র পরীক্ষা ও গবেষণা চলছে, নতুন-নতুন পরিভাষা রচিত হচ্ছে। বিদেশী ভাষা থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পর্কিত বইপত্র প্রচুর অনূদিত হচ্ছে, রেডিও-টেলিভিশনের মারফৎ মাতৃভাষার বিকাশ ব্যাপকতর করার সব রকম প্রয়াস অহরহ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারবেন, বাংলাদেশের মানুষজনের সে-বিষয়ে বিন্দুতম সংশয়বোধ নেই, তাঁদের আত্মবিশ্বাসই তাঁদের পথ দেখাচ্ছে, দেখাবে।

আমরা আরেকটি বাংলা নববর্ষ পেরিয়ে এলাম। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, নববর্ষে আমাদের পশ্চিম বঙ্গে সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো, কয়েক দিন বাদে পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে আরেক প্রস্থ হবে, তারপর কাজী নজরুলের জন্মতিথি উপলক্ষেও হবে। অথচ এই প্রতিটি তিথি জুড়ে যে-নিষ্ঠা, যে-আবেগ, যে-উদ্দীপনা নিয়ে বাংলাদেশে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, মনে হয় যেন জাতির সমস্ত

সত্তা নিজেদের ভাষাকে সম্মিলিত তর্পণ করছে গান-কবিতা-অভিনয়-আবৃত্তির নিবেদনের মধ্য দিয়ে, তার কাছাকাছিও যেন আমরা পশ্চিম বাংলায় পৌঁছুতে পারি না। মাঝে-মাঝে ভয়ে হিম হয়ে আসতে হয় আমাদের, তবে কি ভারতবর্ষে, পশ্চিম বঙ্গে, ক্রমে-ক্রমে রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে, যেহেতু এখানে রাজপ্রসাদলাভে বঞ্চিত মাতৃভাষা, সেই ভাষার চর্চা, সেই ভাষার পরিচর্যা, সেই ভাষাকে ভালোবাসা ক'মে আসবে, সমাজসুদ্ধ মানুষ ঝুঁকবেন ইংরেজি তথা হিন্দির দিকে, বাংলাভাষা বেঁচে থাকবে, উত্তরোত্তর উৎকর্ষের দিকে পৌঁছুবে, ফুলে-ফলে-সম্ভারে পুষ্পিত হয়ে উঠবে, একমাত্র বাংলাদেশে ?

জান কবুল ক'রে মাতৃভাষার জন্য লড়াই করেছিলেন বাংলাদেশের মানুষ। তাঁদের জাতীয়তাবোধের বিকাশের সঙ্গে ভাষা-অভিমান তাই জড়িয়ে আছে। আমাদের সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেহেতু যেতে হয়নি, মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণের তীব্রতাবোধও সম্ভবত সেই কারণে সম-পরিমাণ তীব্র নয়। কিন্তু এরও বাইরে, স্বীকার করা ভালো, অন্য-এক বাস্তব সমস্যার ছায়া পড়েছে আমাদের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা, মাতৃভাষার চর্চা বৃত্তির ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক। আমাদের বেলায় কিন্তু ঠিক তা নয়। এখানে অনেক সচ্ছল পরিবারের বাবা-মারা বলবেন, ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষা বেশি-বেশি ক'রে চর্চা করলে তো আরো পিছিয়ে পড়বে জীবিকান্বেষণের দৌড়ে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা জ্ঞান কোনো কাজেই লাগবে না, হয় ইংরেজি না হয় হিন্দি না জানলে কোনো চাকরির ক্ষেত্রেই সুবিধা করতে পারবে না তারা। রবীন্দ্রনাথ-কাজী নজরুল ইসলাম শিকেয় তোলা থাকুন, প্রাণের তাগিদেই মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে অতএব নাকি বাধ্য হয় পশ্চিম বঙ্গের সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা। আদর্শ বা আবেগ ধুয়ে তো পেট ভরবে না, সুতরাং, শান্তিনিকেতনের মাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিশেবে বিশ্বভারতীর আচার্য মশাই যা ব'লে গেছেন, তাতে সায় না দিয়ে আমাদের উপায় কী ? ওপার বাংলায় মাতৃভাষা নন্দিত-বন্দিত হবে, আমাদের এখানে ধুঁকপুক করবে, তারপর একদিন হয়তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু কী আর করা, এটাই তো ইতিহাসের নিয়ম, সব দেশে তো ইতিহাসের ধারা সমান্তরাল খাতে বয় না, আমরা মস্ত বড়ো এক রাষ্ট্রের ঈষৎ অঙ্গরাজ্য, বাংলা দেশের সঙ্গে আমাদের তো তফাৎ হবেই। এই রাষ্ট্রে যদি আমরা টিঁকে থাকতে চাই, আমাদের সন্তানেরা যদি জীবনযুদ্ধে জয়ী হ'তে চান, বাংলা ভাষা তথা বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে মোহ আস্তে-আস্তে ঘুচিয়ে ফেলতে হবে; নতুন দিল্লি থেকে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে-নির্দেশ দেওয়া হবে, মাথা পেতে মেনে নিতে হবে তা। এবং যদি এটা বলা হয়, ঠিক আছে, ইংরেজি-হিন্দি শিখুক ছেলে-মেয়েরা, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চাও করুক, পাল্টা অভিযোগ করা হবে,

যাঁরা এ-ধরনের কথাবার্তা বলছেন, তাঁরা হৃদয়হীন, তাঁদের বাস্তববোধ নেই : এতগুলি ভাষা পাশাপাশি শিখতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠবে আমাদের ছেলেমেয়েরা, তার চেয়ে বাংলাভাষা, মাতৃভাষা, না হয় না-ই বা পড়লো তারা, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে।

বিত্তবান ঘরের সন্তানদের হয়তো হবে না, গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের হবে। বিশ্বভারতীর আচার্য মশাই যে-প্রলাপই বকুন না কেন, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য, পরীক্ষিত সত্য, যে জ্ঞানের বাইরে আছে তাকে জ্ঞানে অনুপ্রবেশ করাতে হ'লে, মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায় সেই কাজ যতটা সহজ, অন্য-কোনো ভাষাতেই ততটা নয়। সর্বস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করার কথা বলছেন, তাঁদের শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ তাই পাশে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গটিরও উল্লেখ করবো না কেন? ভারতবর্ষে, আমরা বলি, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান্। অথচ এই মহান্ মিলনের কারণে যদি আমাদের নিজেদের ভাষাকে অবহেলায় সরিয়ে রাখতে হয়, হিন্দি-ইংরেজির পরাক্রান্ত চাপে যদি কুঁকড়ে আসে আমাদের সংস্কৃতি-আমাদের সাহিত্য-আমাদের সংগীত-আমাদের আচারকলা, কোন্ মিলনের কথা বলবো তা হ'লে? আমাদের সত্তা-ভাষা-সংস্কৃতিই যদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবেচিত হয়, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো আমরা তা হ'লে? এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা-উদ্বেগ বিচ্ছিন্নতাবাদের বোধন নয়। আমরা বঙ্গভাষী হিশেবে যদি বেঁচে থাকতে না পারি, ভারতীয় হিশেবে আমাদের পরিচয়ও তা হ'লে মিথ্যা হয়ে যাবে।

ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রেণীগত সমস্যা, আরো জড়িয়ে আছে সংস্কৃতিগত সমস্যা, এবং এই সব-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতির অস্তিত্বের অগ্রগতির সমস্যা। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের অনুশাসন পালন করলে দেশ খুব বেশিদিন টিঁকবে না।

বিবমিষার অপরাধ নেই

গত কয়েক মাস ধ'রেই কাহিনীটি মুখে-মুখে ঘুরছে। জনৈক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, এক সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, এখন দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ইন্দিরা কংগ্রেসের খুব কাছাকাছি চ'লে এসেছেন, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রধান মন্ত্রীকে স্বনির্ভর জাতীয় অর্থব্যবস্থার মহত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করা বিশেষ প্রয়োজন, বুদ্ধি-জীবীটি নিজের মনে বেশ কিছুদিন ধ'রেই সেই তাগিদ অনুভব ক'রে আসছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর দাদামশাই, জবাহরলাল নেহরু, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শ পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে একটি বিশেষ অর্থনীতি দেশে প্রবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যার ফলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমরা স্বনির্ভরতার দিকে অনেকটা দ্রুত এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম। বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক এ-সমস্ত প্রাক্তন গৌরবকাহিনী প্রধান মন্ত্রীর কাছে প্রাঞ্জল ক'রে বিবৃত করছিলেন। এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝাচ্ছিলেন, সম্প্রতি বিপদ দেখা দিয়েছে, নানা উটকো লোক জুটে কেন্দ্রীয় সরকারের রীতিনীতি খোলনলচে পাল্টে দিতে চাইছে, অর্থ-ব্যবস্থার উপর সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য চাপ দিচ্ছে তারা, ফলে ক্রমশই আমরা স্বনির্ভরতার লক্ষ্য থেকে স'রে আসছি। প্রধান মন্ত্রীর উপর বুদ্ধি-জীবীটির অপার আস্থা, প্রধান মন্ত্রী জবাহরলাল নেহরুর সাক্ষাৎ নাতি, নেহরু-মহলানবিশ দেশের অগ্রগতির জন্য যে-পথ নির্দেশ ক'রে গিয়েছিলেন, সেই পথে ভারতবর্ষকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে, বুদ্ধিজীবীটি প্রধান মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন, প্রধান মন্ত্রী নিশ্চয়ই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি—অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীপ্রবর—আশা করেন, নেহরু-মহলানবিশের নির্দেশিত অর্থনীতির পুনঃপ্রয়োগের দিকে এখন থেকে প্রধান মন্ত্রী উত্তরোত্তর অধিক গুরুত্ব দেবেন। প্রধান মন্ত্রী প্রচুর ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকের বক্তব্য শুনলেন, এবং, জনশ্রুতি, শোনার পর মন্তব্য করলেন: 'মহাশয়, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে এত সব মূল্যবান কথা জানিয়ে গেলেন, যা আমি অনেক-কিছুই জানতুম না। এবার দয়া ক'রে আরো-একটু উপকার করতে হবে আপনাকে। আপনি অধ্যাপক মহলানবিশকে গিয়ে আমার হয়ে একটু উপরোধ করুন, পরের বার উনি যখন দিল্লি আসবেন, যেন দয়া ক'রে আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন, আপনি যে-সমস্ত মূল্যবান কথাবার্তা বললেন, আমি সে-সব সম্পর্কে স্বয়ং অধ্যাপক মহলানবিশের কাছ থেকেই আরো-কিছু জানতে-বুঝতে চাই'।

এখানেই গোল বাধলো, বুদ্ধিজীবীটিকে যুগপৎ বিব্রত ও হতাশ বোধ করতে হলো। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মশাই প্রায় সতেরো বছর হলো প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে দিল্লি গিয়ে বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা আর সম্ভব নয়। উক্ত বুদ্ধিজীবীটি যতই হতাশ হোন, এই ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীকে দোষারোপ করার তেমন সার্থকতাও নেই। বুদ্ধিজীবীটি নিজে জবাহরলাল নেহরুতে মাতোয়ারা, তাঁর মানসিকতাও সম্ভবত কিছুটা সামন্ততান্ত্রিকতাবোধ-আশ্রয়ী, তিনি ধ'রে নিয়েছেন দাদামশাই যেহেতু স্বনির্ভর অর্থনীতির মস্ত প্রবক্তা ছিলেন, দৌহিত্র-পুরুষও অতএব তা-ই হবেন, অধ্যাপক মহলানবিশের নামোল্লেখে গদগদ হবেন। এই বিশ্বাসের পিছনে তা ছাড়া কোনো আলাদা যুক্তি নেই। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নামই শোনেননি কোনোদিন বর্তমান প্রধান মন্ত্রী। যে-বৃত্তি থেকে তুলে এনে তাঁকে দেশের প্রধান মন্ত্রী করা হয়েছে, সেই বৃত্তিতে সফলতা পেতে হ'লে মহলানবিশ মশাইয়ের নাম না জানলেও চলে। এবং প্রধান মন্ত্রীর যা আচরণ-বিচরণ-জীবনদর্শন, তার সঙ্গে স্বয়ংভর অর্থনীতির আড়াআড়ি সম্পর্ক। উত্তরাধিকার সূত্রে দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁকে তো কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি যে ক-খ-গ-ঘ'র নাম জানতে হবে।

এটাও হয়তো অনুমান করা অন্যায় হবে না যে অধ্যাপক মহলানবিশের নাম যেমন তাঁর জানা ছিল না, প্রধান মন্ত্রীরূপে অভিষিক্ত হবার আগে তিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নামও জানতেন না। এখানেই মুশকিল দেখা দিয়েছে। আইন ক'রে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিশেবে ঘোষণা করা হয়েছিল তিরিশোর্ধ্ব বছর আগে। সেই আইনে অবশ্য কোথাও লেখা নেই যে দেশের প্রধান মন্ত্রী বরাবর বিশ্বভারতীর আচার্য পদে বৃত হবেন। কিন্তু জবাহরলাল নেহরু জ্ঞান-পিপাসু মানুষ ছিলেন, নিজে বইপত্র লিখেছেন, পৃথিবীর বহু পণ্ডিত-মনীষী-দার্শনিক-কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাঁকে বিশ্বভারতীর আচার্য হিশেবে মোটেই বেমানান লাগতো না। ইন্দিরা গান্ধি অবশ্য তেমন বইপত্রের ধার দিয়ে ঘেঁষতেন না। কিন্তু অল্প কিছু সময় শান্তিনিকেতনে ছাত্রী ছিলেন; তাঁর অন্য সহস্র নেতিবাচক গুণাবলীর উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন নন্দনকলা চর্চা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথাও বলতে হয়। সুতরাং তাঁর বাবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন তিনিও যখন বিশ্বভারতীর আচার্য মনোনীত হলেন, তেমন দৃষ্টিকটু কিংবা বেমানান ঠেকেনি তা। জরুরি অবস্থার সময় খবরকাগজে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ছাপানো তিনি বন্ধ ক'বে দিয়েছিলেন, বেতার কিংবা দূরদর্শনে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ-বিশেষ গান গাওয়া বারণ ছিল। তা সত্ত্বেও বিশ্বভারতী পরিচালনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত সেই ধর্মভীরু সম্প্রদায় আদৌ বিচলিত বোধ করেননি, ইন্দিরা গান্ধির প্রতি তাঁদের ভক্তি অটল থেকেছে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধির প্রধান মন্ত্রিত্ব খসলো, মোরারজী দেশাই নতুন

প্রধান মন্ত্রী। অন্য অনেক ব্যাপারে আমরা মোরারজীর সমালোচনা করতে পারি, তাঁর রুক্ষ আচরণ তথা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে পারি, কিন্তু বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি প্রভূত পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন, প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হবার অব্যবহিত পরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিশ্বভারতীর আচার্য হবার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই, প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন ব'লেই স্রেফ পদাধিকারের বলে তিনি বিশ্বভারতীর আচার্যও হবেন এ-ধরনের যুক্তিতে তাঁর সায় নেই। অতএব সেই সময় প্রথা ভঙ্গ ক'রে উমাশঙ্কর যোশীকে বিশ্বভারতীর আচার্য পদে বরণ করা হলো। উমাশঙ্কর যোশী কবি-ঔপন্যাসিক-সাহিত্যিক-দার্শনিক, সব দিক দিয়েই আচার্যপদের যোগ্য। যে-ক'বছর আচার্য ছিলেন, বিশ্বভারতী জুড়ে একটি অতি পরিশীলিত পরিবেশ রচনা করতে সফল হয়েছিলেন তিনি। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি ক'রে জনতা সরকার বিদায় নিলেন, ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধির প্রধান মন্ত্রিত্বে প্রত্যাবর্তন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন বিশ্বভারতীর আচার্যরূপেও। এবং তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর পুত্র, বংশানুক্রমে যিনি প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, তিনিও বিশ্বভারতীর আচার্য ব'নে গেলেন। তিনি আগে হয়তো রবীন্দ্রনাথের নামও শোনেননি কোনোদিন, শান্তিনিকেতনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কেও বোধ হয় তাঁর বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা ছিল না। কিন্তু তাতে কী, তিনি জমিদারি হিশেবে যেমন প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন, ধ'রে নেওয়া যেতে পারে ঐ একই ভূস্বামিত্বের সূত্রে বিশ্বভারতীর আচার্য পদেও বৃত হলেন। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকলে মোরারজী দেশাইর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে আচার্য হ'তে অস্বীকার করতে পারতেন তিনি, কিন্তু সকলের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান তো সমান হয় না।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-অধ্যুষিত বিদ্যাশ্রম বিশ্বভারতী, এই বিদ্যাশ্রমের প্রধান পুরুষ হবার মতো কোনো যোগ্যতাই বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নেই, এবং আইনে এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে প্রধান মন্ত্রীকে পদাধিকারবলে বিশ্বভারতীর আচার্য হ'তেই হবে। সুতরাং বিশ্বভারতী পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি, এবং সেই সঙ্গে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যের প্রতি, তাঁদের যদি বিন্দুতম শ্রদ্ধাও থাকতো, তা হ'লে তাঁরা সবিনয়ে প্রধান মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাতে পারতেন : তিনি ব্যস্ত মানুষ, তাঁরা না হয় অন্য-কাউকে বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে মনোনীত করবেন। তবে ন্যায়ধর্মের সঙ্গে স্তাবকতাবৃত্তির বরাবরই আড়াআড়ি সম্পর্ক। বিদূষকদের মধ্যে সাধারণত একটি প্রকৃতিগত ভেদ থাকে। এক দল বিদূষক বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্তাবকতায় লিপ্ত হন, কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের যথাযথ খোশামোদ করলে আখেরে এখানে-ওখানে কিছু সুবিধা হ'তে পারে, তাঁদের মনের কোণে সর্বদা এই চিন্তা জাগরূক থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের বিদূষকরা কিন্তু স্বার্থের ব্যাপারটা সব সময় ঠিক মাথায় রাখেন না, তাঁরা নিছক স্তাবকতার জন্যই স্তাবকতা ক'রে থাকেন, যে-কোনো রাজপুরুষের পদযুগল

দেখলেই তাঁরা মন্ত্রবৎ সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত করেন, সব ঋতুতে সব ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই করেন। বিশ্বভারতীর কর্তৃপুরুষদের মধ্যে, সন্দেহ হয়, এই দ্বিবিধ স্তাবক সম্প্রদায়ের মিলন ঘটেছে। প্রায় অক্ষরপরিচয়হীন এক প্রধান মন্ত্রীকে তাঁরা বিশ্বভারতীর প্রধান পুরোহিতরূপে বরণ ক'রে নিয়েছেন, যে-কোনো দেবতাকেই পূজা করতে হয়, তাঁর দেবতুল্য গুণাবলী থাকুক না-থাকুক কিছু যায় আসে না, এই বিবেচনায়, কিন্তু, তার পাশাপাশি হয়তো এই আশাও কাজ করছে, প্রধান মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীই, খোশামোদ-টোশামোদ করলে আরো-কিছু পয়সাকড়ি, আরো-কিছু সুবিধাসম্মান তিনি হয়তো পাইয়ে দেবেন।

উপনিষদের বাণীমন্ত্র নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন আশ্রম গড়েছিলেন ভারতীয় দর্শনের সারাৎসার প্রচার করার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে: ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়ো, আসক্তির চেয়ে নিরাসক্তি। যাঁরা প্রধান মন্ত্রীর পিছু ধাওয়া ক'রে তাঁকে আচার্য বানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁরা। স্তাবকতার কুম্ভীপাকে একবার জড়িয়ে পড়লে নিষ্ক্রমণ অবশ্যই মুশকিল; গভীর গাড্ডায় এখন পড়েছেন তাঁরা। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী শীতঋতুতে বিশ্বভারতীর বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবার কথা। সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কোনো তারিখ বেছে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, স্নাতকদের অভিনন্দন জানানো হয়, কিছু-কিছু সম্মানিত অতিথিকে বরণ করা হয়, দীক্ষান্ত ভাষণ দেন কোনো নিমন্ত্রিত মনীষী। এ বছর এই সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তে পারছে না, কারণ প্রধান মন্ত্রীর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আচার্য, তাঁকে বাদ দিয়ে সমাবর্তন ঠিক সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি ব্যস্ত আছেন। আজ তামিলনাড়ু যাচ্ছেন, কাল মিজোরাম, পরশু পাকিস্তান বা অন্য-কোথাও। সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে যায়, মাসের পর মাস, প্রধান মন্ত্রী সময় দিতে পারছেন না, ব্যস্ত প্রধান মন্ত্রী, বিশ্ব-ভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠান তাঁর অগ্রাধিকার তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। কর্তা-ব্যক্তিরা দিল্লিতে চিঠি পাঠাচ্ছেন-টেলিফোন করছেন-তার পাঠাচ্ছেন, প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে ধর্না দিচ্ছেন, কবে তাঁর এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টার মতো সময় হবে, বিমানে ক'রে উড়ে এসে, তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের তাড়নায় গোটা শান্তিনিকেতনকে দাপিয়ে-কাঁপিয়ে, একটা-দু'টো ভাসা-ভাসা কথা ব'লে আচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন তিনি; স্নাতকরা ধন্য হবেন, স্নাতকরা ধন্য হোন বা না হোন, স্তাবকতার বিশল্যকরণী সেবন না করলে যে-কর্তাব্যক্তিদের জীবনধারণ দুরূহ, তাঁরা অন্তত ধন্য হবেন। দাঁত চেপে ধর্না দিয়ে পড়ে আছেন তাঁরা, প্রধান মন্ত্রীর সময় নেই, তামিলনাড়ু রাজ্যের নির্বাচনে তাঁর দলের পরাজয়ের আড়ালে কত বড়ো জয় ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে তিনি ব্যস্ত। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীদের ভব্যতা-সভ্যতা-কর্তব্যবোধ শেখাতে তিনি ব্যস্ত, তাঁর জমানায় ভারতবর্ষ

ইতিমধ্যেই কোন্ পারিজাতভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, যা দেশের বোকা মানুষগুলি বুঝতে পারছে না, তা বিদেশী সাংবাদিকদের ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে তিনি ব্যস্ত, তাঁর হাতে সময় কই মন্ত্র-শাস্ত্রী-গুপ্তচরবাহিনী পরিবৃত হয়ে দেড় ঘণ্টার জন্য শান্তি-নিকেতনে এসে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে যাবেন।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন এ বছর তাই কবে হবে কেউ বলতে পারেন না, আদৌ হবে কিনা তা-ও না। সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষ, স্তাবকতাসমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। এই স্তাবকের সম্প্রদায়ই যখন ইনিয়ে-বিনিয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে লম্বা বক্তৃতা ফাঁদেন, উপনিষদ থেকে কাঁপা গলায় উদ্ধৃতি দেন, বিবমিষার উদ্রেক হয়। অর্থাৎ বমি করতে ইচ্ছা হয় আমাদের মধ্যে কারো-কারো।

মানা ভালো, বিবমিষার অপরাধ নেই।

সমাজতন্ত্রের অ-আ-ক-খ

একজন-দু'জন পণ্ডিত ব্যক্তির হঠাৎ দেখা পাওয়া যাচ্ছে। দেশের-জাতির দুর্গতির জন্য তাঁদের রাতে ঘুম হয় না। নতুন দিল্লির সরকার বোকার মতো অনেক কাজ করছেন, তাতে দেশ প্রতিদিন আরো ডুবছে। তাঁরা কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর ঘাড়ে কোনো দোষ চাপাতে রাজি নন। আহা, ও বেচারীর কচি বয়স, ওঁর কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আমাদের সংবিধানে কী-কী খুঁটিনাটি আছে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কী ঐতিহ্য ছিল, সে-সব ওঁর পক্ষে কী ক'রে জানা সম্ভব। প্রধান মন্ত্রীর আশেপাশে যে উপদেষ্টারা আছেন, তাঁরাই সমস্ত নষ্টের মূল। অনভিজ্ঞ, অল্পশিক্ষিত প্রধান মন্ত্রীকে তাঁরা ঠিকমতো পরামর্শ দিচ্ছেন না ব'লেই তিনি এতো ভুল-ভাল করছেন, তাই-ই তো দেশের-জাতির এত দুর্গতি। শূলে যদি কাউকে চড়াতে হয়, পরামর্শদাতাদের চড়াও, প্রধান মন্ত্রীর প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে, প্রধান মন্ত্রী অনভিজ্ঞ হ'তে পারেন, অনেক অবিমৃষ্যকারী কাজকর্ম অহরহ ক'রে থাকতে পারেন, অনেক অদ্ভুত-কিম্ভূত কথাবার্তা বলতে পারেন, দেশের-জাতির অনেক সর্বনাশ সাধন করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে সমালোচনা করা সমীচীন হবে না, তাঁকে সামাল দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তো তাঁর নয়, তাঁর পরামর্শদাতাদের। তিনি ভালো, পরামর্শদাতারা খারাপ।

পণ্ডিতরা তাঁদের প্রাজ্ঞ কথাবার্তা বলেন, হয়তো তেমন চিন্তা না ক'রেই বলেন। কিন্তু এমন অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন প্রধান মন্ত্রীর দায়ভার কেন আমাদের অনন্তকাল ধ'রে বহন ক'রে যেতে হবে সেই কথাটা বলেন না। কারণ গুরুবাদী, ভক্তিবাদী দেশ আমাদের; একবার যাকে গুরুর আসনে বসানো হয়েছে, তিনি বংশপরম্পরায় গুরু। জবাহরলাল নেহরু সতেরো বছর ধ'রে আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী, তারপর তাঁর কন্যাও সব-মিলিয়ে ষোলো বছরের মতো রাজত্ব করেছেন, পণ্ডিতেরা ভক্তিবাদে সমাচ্ছন্ন, জবাহরলাল নেহরুর আরেক বংশধর এখন প্রধান মন্ত্রীগিরি করছেন, তাতে তাঁদের নয়নে আনন্দের ধারা বইছে, তিনি যদি দেশকে রসাতলেও নিয়ে যান, তাতে কী, তিনি তো জবাহরলাল নেহরুর নাতি, জবাহরলাল নেহরুর জন্মের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানাদিও শুরু হচ্ছে এ মাস থেকে, আমরা যেন তাঁর নাতিকে সমালোচনা করার স্পর্ধা না রাখি। সমালোচনা যদি নেহাৎ করতেই হয়, যেন তাঁর পরামর্শদাতাদের করি: তিনি কী আর নিজে থেকে তামাক খান, তাঁর হাত দিয়ে তামাক খাওয়া হয়।

অসম বিকাশের দেশ ভারতবর্ষ, পণ্ডিতদের জ্ঞানগম্যিরও অতএব অসম বিকাশ। দেব-দ্বিজে ভক্তি তাঁদের যেহেতু অটুট, এবং তাঁদের চেতনায় সামন্ত-বাদ-আশ্রয়ী চিন্তার সর্বসমাচ্ছন্ন-করা ঘোর, দেবতাদের ক্ষেত্রেও তাই তাঁরা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ধারাটি অবলীলার সঙ্গে মেনে নেন, দেব-দেবীদের নাতি-নাতনীদেরও বিধাতার আসনে বসিয়ে পরম চরিতার্থতা অনুভব করেন। জবাহরলাল নেহরু মস্ত বড়ো সাম্যবাদী ছিলেন, সুতরাং তাঁর নাতিও নিশ্চয়ই, তাঁদের যুক্তি-অনুযায়ী, এক অতি বাঘা সাম্যবাদী, তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বে এবার আমরা হুড়মুড় ক'রে সমাজতন্ত্রের পারিজাতরাজ্যে পৌঁছে না গিয়েই নাকি পারি না।

ঠেলা ভুগতে হয় দেশের মানুষদের। ইন্দিরা গান্ধি রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে পঞ্জাবে যে-আগুনের সূত্রপাত করেছিলেন, সেই আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলছে। গোটা দেশকে এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে, তাঁর ছেলে, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী, অবস্থা সামাল দিতে পারছেন না। দিনের পর দিন পাঞ্জাবে সংকট বর্ধমান। খুন-জখম-সন্ত্রাস-আতঙ্ক, সাম্প্রদায়িক ভুল-বোঝা-বুঝি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভয়ংকররকম ব্যাহত। যত বেশি ফৌজ-পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে, অবস্থা তত বেশি খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী কখনো ক-র কথা শুনে নতুন-কোনো অবিবেচক কাজ করছেন, তাতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটছে। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী হয়তো খ-র পরামর্শে কান পেতে আরো ঘোর অবিবেচক এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন, ফলে পঞ্জাব অশান্ততর হচ্ছে। এমনধারা চলছে গত বেশ কয়েক বছর ধ'রে। জলের মতো টাকা ঢালা হচ্ছে ঐ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে, সেই সঙ্গে আর্থিক বিকাশের প্রবাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেও। অথচ, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিহেতু, রাজ্যে রাজস্বসংগ্রহ ভীষণ ক'মে গেছে। সুতরাং খরচপাতি সমস্ত জোগাতে হচ্ছে বাইরে থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে, কিংবা ব্যাংকগুলি থেকে, অঢেল টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে। পঞ্জাবের বেলায় সাধারণ নিয়ম-কানুন মানার প্রশ্ন নেই, যে-কোনো ছুতোয় টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে পঞ্জাব সরকারকে। ঐ রাজ্যের বার্ষিক যোজনার পুরো খরচই মেটানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় অনুদানের মধ্যবর্তিতায়।

প্রধান মন্ত্রী, এবং তাঁর পরামর্শদাতারা, যে-কোনোভাবে হোক, পঞ্জাবে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন: কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য, তথা কেন্দ্রীয় শাসকদলের আধিপত্য। টাকা দিয়ে যদি পঞ্জাবের বশ্যতা কেনা সম্ভব হয়, তা হ'লে তাই চেষ্টা ক'রে দেখা যাক না কেন। অতএব জলের মতো টাকা ঢালা হচ্ছে। যে-কোনো ছুতোয় পঞ্জাবকে টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে: যদি ওখানে অবস্থার মোড় ফেরানো যায়, যদি ঐ রাজ্যের মানুষ কংগ্রেস দলকে ফের ভালোবাসতে শেখে…।

এ বছর গোটা দেশ জুড়ে বন্যা হয়েছে: অসমে, পশ্চিম বঙ্গে, বিহারে, গুজরাটে, সব শেষে জম্মু ও কাশ্মীরে, হিমাচল প্রদেশে, হরিয়ানায় ও পঞ্জাবে। প্রাণহানি, শস্যের অবর্ণনীয় ক্ষয়-ক্ষতি, গরিব মানুষজনের ঘর-বাড়ি ধ্ব'সে-পড়া, গোরু-মহিষ-ছাগলের অসহায় ভেসে-যাওয়া। হতভাগ্য দেশ, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর চার দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত, কিন্তু বন্যার প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য তেমন-কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। প্রতি বছরই তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে রাজ্যে-রাজ্যে বিপন্ন মানুষের হাহাকার।

রাজ্য সরকারগুলির যে-আর্থিক হাল, ব্যাপক আকারে বন্যা দেখা দিলে নিজেদের তহবিল থেকে সুষ্ঠু ত্রাণের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। অর্থ কমিশন থেকে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্ক পর্যন্ত বন্যাত্রাণের খরচ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ভাগাভাগি ক'রে সম-পরিমাণ বহন করবেন। তবে তার চেয়ে বেশি যদি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হ'লে রাজ্য সরকারের অনুরোধের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল ক্ষয়ক্ষতির বহর যাচাই ক'রে দেখবেন, তাঁদের সুপারিশ পরীক্ষান্তে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

এটাই এখন পর্যন্ত স্বীকৃত পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে বন্যাত্রাণহেতু অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়ে আসছিল। এ বছর বন্যাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অসম রাজ্য, ব্রহ্মপুত্র ও তার উপনদী শাখা-নদীসমূহ ফুঁসে-ফেঁপে গোটা অসম উপত্যকা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, লক্ষ-লক্ষ গবাদি পশু নিহত হয়েছে, এক হাজারেরও বেশি গরিব মানুষ মারা গেছেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বন্যাপীড়িত গৃহহীন মানুষ খোলা আকাশের নিচে কোনো-ক্রমে-ব্যবস্থা-করা ত্রাণশিবিরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনোক্রমে দিনযাপন করেছেন। অন্যান্য রাজ্যেও সাধারণ মানুষ বন্যার ভুক্তভোগী। কিন্তু অসম রাজ্যের বন্যাজনিত ক্ষতির ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রধান মন্ত্রী আচার মেনে সৌজন্যবশত একদিন-দু'দিনের জন্য প্লেনে-হেলিকপ্টারে চেপে অসমের বন্যা দুর্গতদের দেখে গেছেন। তারপর কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল অনু-সন্ধানে এসেছেন, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করেছেন, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে অসমের জন্য কুড়ি কোটি টাকা বন্যাত্রাণে কেন্দ্র-কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দের পরিমাণ রাজ্য সরকারকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, এ ব্যাপারে অসমের মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ কিছু কথাকাটাকাটিও হয়েছে।

এখন পর্যন্ত বর্ণিত কাহিনীটিতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারেরা মনে করেন, বন্যাত্রাণে যে-পরিমাণ কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ হয়ে থাকে, তা অপ্রতুল। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারদের অভিযোগগুলি পরীক্ষা ক'রে

দেখার জন্য নবম অর্থ কমিশনকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিবেদনের প্রতীক্ষায় আছেন সবাই।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাঁধিয়েছেন প্রধান মন্ত্রী। গত মাসে পঞ্জাবেও বন্যা দেখা দিয়েছিল। সহসা জলোচ্ছ্বাসে রাজ্যের কিছু-কিছু অঞ্চলে অনেক গ্রাম ভেসে যায়, শস্যেরও ক্ষয়-ক্ষতি হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সপারিষদ প্রধান মন্ত্রী ছুটে যান, পঞ্জাবের বন্যাদুর্গত মানুষের দুঃখে কেঁদে-গ'লে উনি নদী হন। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রধান মন্ত্রী গররাজি। তিনি অকুস্থলে নিজে থেকে পঞ্জাবের জন্য বন্যাত্রাণে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন। সাধারণ নিয়ম-নীতি নাকি পঞ্জাবের ক্ষেত্রে খাটে না; পরে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল যা-যা করণীয় তা করুন এসে, আপাতত প্রধান মন্ত্রী পঞ্জাবকে একশো কোটি টাকা হাতে ধ'রে দিয়ে গেলেন।

এটা অবশ্য রাজনৈতিক বিবেচনার ব্যাপার। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর দল কোনো ক্ষেত্রেই নিয়ম-নীতির তেমন তোয়াক্কা করেন না, স্বৈরতন্ত্রের দিকে তাঁদের স্বাভাবিক ঝোঁক। সুতরাং অসম ও অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে বন্যাত্রাণের ব্যাপারে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হলো, পঞ্জাবের ক্ষেত্রে হলো না, তা নিয়ে আমাদের কারো-কারো অস্বস্তিবোধ হ'তে পারে, কিন্তু স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় নিয়মহীনতাই তো নিয়ম। তা ছাড়া, বন্যাত্রাণের অজুহাতে যদি পঞ্জাবে আরেক দফা একটু বেশি টাকা-কড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়, তাতেও আলাদা ক'রে বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই, কত অজুহাতেই তো পঞ্জাবকে বাড়তি টাকা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

মুশকিল দেখা দিয়েছে প্রধান মন্ত্রীর সাফাই গাওয়া নিয়ে। যাঁরা বলেন, প্রধান মন্ত্রীর চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই, তাঁরা ভুল বলেন। এ বছর বন্যায়, প্রধান মন্ত্রীর এই খেয়ালটুকু আছে, অসমের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। অসমের বন্যার ব্যাপকতার সঙ্গে পঞ্জাবের ক্ষয়-ক্ষতি তুলনা করা চলে না, এটা প্রধান মন্ত্রী মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও, অসমকে যেখানে তিনি মাত্র কুড়ি কোটি টাকা ধ'রে দিয়েছেন, পঞ্জাবকে অথচ একশো কোটি টাকা দিতে কেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই সিদ্ধান্তের কারণ বিখ্যাত সাম্যবাদী জবাহরলাল নেহরুর সাক্ষাৎ নাতি, বিখ্যাততর সাম্যবাদী বর্তমান প্রধান মন্ত্রী, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: অসমের লোকজনেরা গরিব, ওদের কম পেলেও চলে; পঞ্জাবের বন্যাক্রান্ত মানুষেরা অনেক বেশি অবস্থাপন্ন, বন্যাতে ওদের টাকার পরিমাণে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে, সুতরাং ওদের বেশি-বেশি ক'রে সাহায্য না দিলে অন্যায় হতো।

প্রতিবাদ জানিয়ে লাভ নেই, এটা জীবনদর্শন: গরিবরা যেহেতু গরিব, ওদের অভাববোধ কম, ওদের কম দিলেও চলে; বড়োলোকদের অভাববোধ তথা

প্রয়োজন বেশি, সুতরাং সরকার থেকে তাদের বেশি-বেশি ক'রে দিতেই হয়। বড়োলোকদের সরকার, বড়োলোকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার, বড়োলোকদের স্বার্থ প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত সরকার, সুতরাং তার জীবনদর্শন তো অন্যরকম হ'তে পারে না। শুধু বন্যাত্রাণের ক্ষেত্রে নয়, গত কয়েক বছর ধ'রে এই সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তই একচক্ষু শ্রেণী-স্বার্থ বিস্তারের প্রতিজ্ঞা বহন করছে।

এটাই ললাটলিখন। গুরুবাদী, ভক্তিবাদী দেশ, উত্তরাধিকার সূত্রে সমাসীন নেতাদের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয়, তাঁদের বিশেষ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দায়ভারও। একজন-দু'জন পণ্ডিত অবশ্য অন্য কথা বলেন: আহা, কচি-কাঁচা ছেলে, কোথায় কী বলতে হয় তা কি ও জানে নাকি, মনের কথা তুম ক'রে যে বাইরে প্রকাশ করতে হয় না, তা কি ওকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে পারতো না ওর ঐ অপদার্থ পরামর্শদাতারা; এখন ছাখো তো কী গেরো।

পঞ্জাবকে কিছু টাকা বেশি পৌঁছে দেওয়া হলো, অসমকে তুলনায় অনেক কম: এটা তো একটি নিরেট হিশেবের ব্যাপার। প্রধান মন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি উপলক্ষ্য অতিক্রম ক'রে আমাদের আদর্শের উপত্যকায় তুলে নিয়ে গেছেন, একজন-দু'জন পণ্ডিতের সতর্কীকরণ উপেক্ষা ক'রে। সমাজতন্ত্রের নব-প্রজ্ঞা শুনিয়েছেন তিনি আমাদের: বড়োলোকদের বেশি-বেশি ক'রে দিতে হয়, গরিবদের র'য়ে-স'য়ে।

জবাহরলাল নেহরু জন্মের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন শুরু হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের বন্যায় এখন থেকে ভেসে যাবো আমরা।

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে

গত এক পক্ষ কাল বিজয়ী বীরেরা আমাদের পরিবৃত ক'রে রেখেছেন। শুক্রবার, তিরিশে সেপ্টেম্বরের সকাল পর্যন্ত হিশেব, এখনো শেষ দু'দিনের বিভিন্ন ফলাফল বাকি, কিন্তু মোট পাটিগণিতে তেমন-একটা হেরফের হবে ব'লে মনে হয় না। পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম মানুষ সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির নাগরিক, অথচ সিওল অলিম্পিকে সোনা, রূপা, পিতল মিলিয়ে পাঁচশোর মতো পদক যা বিলোনো হয়েছে, তার অর্ধেকেরও বেশি জিতেছেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে-বড়ো-হয়ে-ওঠা যুবক-যুবতী-তরুণ-তরুণীরা। একশো উনসত্তরটি স্বর্ণপদকের মধ্যে একশোটিই, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ষাট ভাগ, তাঁরা জিতে নিয়েছেন। তা-ও তো কিউবা, উত্তর কোরিয়া, আলবেনিয়ার মতো কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিযোগীরা এই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেননি। যদি করতেন, ধ'রেই নেওয়া যায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে পদকের ঢল আরো উচ্ছলিত হতো।

অবশ্য অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ঐতিহ্যাশ্রয়ী আদর্শ প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করা, জয়-পরাজয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরিখ দিয়ে এই অংশগ্রহণের তাৎপর্যের মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। তা হ'লেও আমাদের মুগ্ধতার আবেশকে উপেক্ষা করি কী ক'রে? গোটা পৃথিবী থেকে প্রতিযোগীরা জড়ো হয়েছেন, তাঁদের সাধনার সারাৎসার 'অলিম্পিক ফলাফলে ধরা পড়বে, গোটা পৃথিবীর কাছে তাঁরা প্রমাণ করবেন উৎকর্ষের অন্বেষণে নেমে কোন্ শিখরচূড়ায় পৌঁছুতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন: আদিমতম যুগ থেকে মানুষেয় মনে এই তদ্গত আকূতি। একমাত্র মানুষই ক্রমান্বয়ে নিজেকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, তার লক্ষ্য এক উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু থেকে অপর-এক উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে পৌছোনো। অতীত কীর্তিকে ছাড়িয়ে নতুন আরেক কীর্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে মানুষের অদম্য অভিযাত্রা। উৎকর্ষের অভিসার আর প্রগতির অন্বেষণ মানুষের কাছে তাই সমার্থক। পরিবেশকে বাদ দিয়ে মানুষের অন্য-কোনো পরিচয় নেই, পরিবেশই মানুষকে লালন করে, পালন করে, ব্যাকরণ শেখায়, শেখায় নিয়ম-কলা-পদ্ধতি। কিন্তু, সেই সঙ্গে, পরিবেশই মানুষকে স্বপ্ন দেখতেও শেখায়, উন্নততর কোনো আলোকমণ্ডলে উত্তীর্ণ হবার আয়োজন-উপকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থাও পরিবেশ থেকেই ক'রে দেওয়া হয়। মানুষ পরিবেশ থেকে সঞ্জাত, কিন্তু তাকে পেরিয়ে যাওয়ার প্রতিভা তথা প্রেরণাও মানুষ

পরিবেশ থেকেই সংগ্রহ করে। পরিবেশের বাইরে তো মানুষের পরিচয় নেই।

সিওল অলিম্পিকে যুবক-যুবতী-তরুণ-তরুণীরা কাঁড়ি-কাঁড়ি পদক কুড়িয়ে ঘরে ফিরে গেলেন, তাঁরা ফিরে গেলেন সমাজতন্ত্রের প্রসন্ন প্রচ্ছায়ায়। এখন অনেক দিন পর্যন্ত অন্যান্য দেশের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবেন, সমাজতন্ত্রে কী আশ্চর্য জাদু আছে কে জানে, যার ফলে কাতারে-কাতারে যুবক-যুবতী-তরুণ-তরুণীরা শ্রেষ্ঠত্বের সাধনায় নিজেদের নিয়োগ করছেন, বছরের পর বছর ধ'রে, ধৈর্য, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলাবোধ, কায়িক পরিশ্রম সব-কিছুর সমন্বয় ঘটছে, উৎকর্ষ থেকে অধিকতর উৎকর্ষের অহরহ অনুসন্ধান।

সমাজদর্শন পাশে সরিয়ে রেখে তো এই উৎকর্ষের চর্চা সম্ভব নয়। এই তরুণ-তরুণী-যুবক-যুবতীরা একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার অঙ্গনে বেড়ে উঠেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্তিত উৎকর্ষ উক্ত সমাজব্যবস্থার উৎকর্ষ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছেলেমেয়েরা কাঁড়ি-কাঁড়ি স্বর্ণপদক জয় করেছেন সিওল অলিম্পিকে। কিন্তু তা ব'লে ঐ দেশগুলি সত্যিই সোনা দিয়ে মোড়া নয়। মানুষের জীবনকলার অনেক সমস্যাই এখনো ঐ সব দেশে মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। নিশ্চয়ই এখনো অনেক স্খলন-পতন-বিচ্যুতি-অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে ঐ সব দেশগুলিকে যেতে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হয়তো যেতে হবে। কিন্তু একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থায় যে-মহত্ত্বের আকর, উৎকর্ষের অঙ্কুর, তার উল্লেখ এড়াই কী ক'রে? যেহেতু সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজের সর্বস্তরে তাই সর্বপ্রকার সুযোগের ব্যাপ্তি, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যের সুযোগ, পুষ্টির সুযোগ, চিকিৎসার সুযোগ, অনুশীলনের সুযোগ। মাত্র কেউ-কেউ সুযোগ পেল, বাকিরা পেল না, ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা আকছার ঘটছে, আসলে ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা সাধারণ নিয়ম, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা অভাবনীয়। পরস্পরকে জড়িয়ে সমাজ, পরস্পরের প্রতি অনুপ্রেরণায় এই সমাজের বিকাশ. যে-কোনো স্তরের যে-কোনো শ্রেণীর, যে-কোনো পরিপার্শ্বের শিশুদের মধ্যে প্রতিভার সম্ভাবনা উপ্ত আছে, উৎসাহে-অনুকম্পায়-পরিচর্যায়-প্রয়াসে-প্রযত্নে সেই প্রতিভাকে বিকশিত করতে হবে: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গীকার এটা। সকলের জন্য সুযোগ, সকলের জন্য উৎসাহ, সকলের জন্য উদ্যোগ। আগে থেকে জানা সম্ভব নয় কোন্ শিশুর মধ্যে কোন্ বিশেষ প্রতিভার বীজ নিহিত আছে, কিন্তু যদি যত্নের-পরিচর্যার কোনো অভাব না থাকে, স্বাস্থ্য-পুষ্টি-অনুশীলনে ঘাটতি না হয়, এই শিশুরা যদি পরস্পরের অধ্যবসায়-উদ্যম-প্রচেষ্টা থেকে নিজেদের আরো উন্নত করবার প্রেরণা সংগ্রহ করতে পারে, তা হ'লে জাদুর পর জাদু ঘটবে, অসম্ভব সম্ভব হবে, এই বিশেষ সমাজব্যবস্থায় বেড়ে-ওঠা ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিজয় করবে। সিওল অলিম্পিকে, আর কিছু না-হোক, স্পষ্ট উচ্চারণে সত্যের সারাৎসারটুকু কেউ

উচ্চারণ করুন না-করুন, সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনের ফলিত প্রয়োগ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানুষকে চমৎকৃত করেছে।

অতএব যাঁরা বলেন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গঠনমূলক কোনো কীর্তি বা সৃষ্টি আর পরিলক্ষিত হয়নি, সমাজতান্ত্রিক অন্বেষা মানব ইতিহাসের এক অপব্যয়িত অধ্যায়, এবং সেটা এত দিনে বুঝতে পেরেছেন ব'লেই সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতৃবৃন্দ এখন অন্য ধরনের চিন্তাভাবনা করছেন, এমন কি খোলা হাওয়ার কথা পর্যন্ত বলছেন, সেই সব স্বভাবনিন্দুকদের আরেক বার হয়তো ভেবে দেখতে হয়। খুবই মুশকিলে প'ড়ে গেলেন তাঁরা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নাকি চলনের-বলনের স্বাধীনতা নেই, আর্থিক ব্যবস্থা নাকি সে-সব দেশে ভেঙে পড়ার মুখে, ওখানকার মানুষজনেরা নাকি ভালো ক'রে খেতে পর্যন্ত পান না, ভোগ্যপণ্যের জন্য দোকানের বাইরে ওখানে লম্বা লাইন পড়ে, পশ্চিমী দেশগুলির মতো ওখানে শৌখিন গাড়ির বাহার নেই, অতিবিলাসী জীবনযাত্রার অনেক উপকরণই নেই, সমাজতন্ত্র অতএব ব্যর্থ: বছরের পর বছর ধ'রে, খবরের কাগজ তথা অন্য বহুবিধ প্রচারব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় ইত্যাকার বাণী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সমাজতন্ত্র মানেই নাকি হতাশা, গ্লানিমা, অস্বাস্থ্যের অন্ধকার, প্রতিভার অপমৃত্যু। যা রটনা করা হয়েছে তার মধ্যে নিখাদ সত্যের অংশ যে প্রায় শূন্য, সিওল অলিম্পিকের ফলাফল বিশ্বনিন্দুকদের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সভ্যতা-সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক আছে, থাকবে। স্বাধীনতার সার কথা কী, তা নিয়েও বিতণ্ডা বহমান থাকবে। যদি কোনো পণ্ডিত দাবি ক'রে বসেন, দেশের ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল নেশাগ্রস্ততায় ভেসে যাওয়ার পরিপূর্ণ অধিকার-ভোগেই স্বাধীনতার মর্মকথা ব্যক্ত, যৌন বিকৃতির অবাধ প্রসারের অধিকারের অপর নামই স্বাধীনতা, সেই পণ্ডিতকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এমন-কোনো মাথার দিব্যি কদাচ তো দেওয়া হয়নি। জীবনের, জীবনধারণের, মানবসমাজের কর্মকীর্তির সার্থকতা নিরূপণের অন্য কিছু-কিছু সংজ্ঞা আছে, যা মুনাফাখোরদের অভিধানে লিপিবদ্ধ নেই, যা যুদ্ধবাজদের প্রচারে কখনো উচ্চারিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের যুবক-যুবতী-তরুণ-তরুণীদের অত্যাশ্চর্য ক্রীড়ানৈপুণ্য থেকে যাঁরা অন্তত এই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে পারবেন, পাশ থেকে তাঁদের নিশ্চয়ই আমরা অভিনন্দন জানাবো।

সিওল অলিম্পিক থেকে এটাই মস্ত লাভ হলো, সমাজতান্ত্রিক দেশে-দেশে পুনর্গঠনের তাগিদে যাঁদের রাত্রির ঘুম ব্যাহত হচ্ছিল, তাঁরা এখন থেকে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে বাধ্য। 'পুনর্গঠন' ছাড়াই যারা এরকম ভোজবাজি দেখাতে পারলো খেলাধুলার ক্ষেত্রে, 'পুনর্গঠিত' ব্যবস্থায় তারা আরো কোন্

সু-উচ্চে পৌঁছে যেতে পারে, সেই শ্বাসরোধকারী চিন্তায় এখন তাঁরা আচ্ছন্ন থাকবেন কিছুদিন। আপনারা বরাবর আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ফেঁদেছেন, বাণিজ্য বন্ধ ক'রে দিয়ে আমাদের ভাতে মারার চেষ্টা করেছেন, হঠাৎ আপনাদের উটকো উপদেশাবলী আমরা কেন শুনতে যাবো : স্বভাবতই সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। তাঁদের স্ব-স্ব সমাজব্যবস্থা-অর্থব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদি পরিবর্তন-পরিশোধন-পুনর্গঠনের প্রয়োজন চোখে পড়ে, তাঁদের নিজেদের কাছে যদি চোখে পড়ে, তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছন, তা হ'লে তা তাঁদের নিজেদের ব্যাপার, বাইরে থেকে কিছু ফড়ে তাঁদের নিন্দামন্দ করলো কিনা তাতে কিছু যায় আসে না, সেই নিন্দামন্দের তাড়নায় তাঁরা 'পুনর্গঠিত' হবেন না। মিনু মাসানি মহাশয় ও তাঁর সম্প্রদায়-ভুক্তদের তাই উল্লাসের কোনো কারণ নেই, তাঁরা বরঞ্চ সিওল অলিম্পিকের ফলাফল থেকে একটু নম্রতা শিখুন, কোন্ সমাজব্যবস্থা মানুষকে বিকশিত হবার প্রেরণা দেয়, অন্য কোন্ সমাজব্যবস্থা দেশের সমগ্র যুবসমাজকে মদ্যপ-গঞ্জিকা-সেবীতে পরিণত করতে চায়, সে-ব্যাপারে একটি দু'টি সরল-নির্মল শিক্ষাগ্রহণ করুন!

অপর একটি মন্তব্য সংযোজন করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক দেশের ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি, সিওলে অন্য যাঁরা শৌর্যে-নৈপুণ্যে-কুশলতায় পৃথিবীজোড়া মানুষকে মুগ্ধ-বিস্মিত করেছেন, সেই প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীদের মস্ত বড়ো অংশ, স্পষ্ট ক'রে বলা ভালো, কৃষ্ণকায়। এই কৃষ্ণবর্ণের তরুণ-তরুণী-যুবক-যুবতীদের অনেকে যেমন বিভিন্ন গরিব, অনুন্নত দেশ থেকে এসেছেন, অনেকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধি হিশেবেও এসেছেন। এ-সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে অসম সমাজব্যবস্থা, প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন নানা বর্ণবৈষম্য, সামাজিক বহু ধরনের অত্যাচার-অনাচার। পরিবেশের প্রতিকূলতা ভেদ ক'রে. সামাজিক-আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই ক'রে এই কৃষ্ণকায় প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীরা সাফল্যের চূড়োয় উঠে এসেছেন, তাঁরাও আমাদের নমস্য। তাঁদের কীর্তি পৃথিবীর সর্বত্র বর্ণবৈষম্যবিরোধীদের প্রেরণা জোগাবে, প্রেরণা জোগাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়, প্রেরণা জোগাবে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। লুইস বা জয়নাররা যখন মার্কিন পতাকা বুকে জড়িয়ে অথবা আকাশের দিকে উঁচু ক'রে তুলে ধরেন, রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত মানব-অভ্যুদয় কাহিনীর নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয় সেই মুহূর্তে, পৃথিবীর বর্ণবিদ্বেষীরা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বিবরে লুকোয়।

ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাশ করেছেন, জাতীয় নৈরাশ্যের গ্লানি আমাদের প্রত্যেককে স্পর্শ করেছে। ব্যক্তি-

গত দোষারোপের কোনো ব্যাপার নয় এটা, আমাদের সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিফলন। সমাজবিশ্লেষণের বাইরে তো সত্যের কোনো অধিষ্ঠান নেই। সিওল অলিম্পিক থেকে অন্তত এই শিক্ষাটুকু যদি, পরোক্ষ হ'লেও, আমাদের কর্তাব্যক্তিরা মেনে নেন, আপাতত তা-ই মস্ত লাভ।

পরীক্ষার সাহস

সময় পাল্টায়, সমস্যাগুলিও পাল্টায়, অথবা পুরোনো সমস্যাগুলি নতুন আকার নিয়ে দেখা দেয়। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে, সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র নামে যে-দেশকে আমরা চিনি, তার অবস্থান ছিল প্রায় মধ্যযুগে। সংঘটিত হবার মুহূর্তে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব যে-বিদ্যুৎচমক সৃষ্টি করেছিল, তা নিছক স্মৃতি হিশেবেই বেঁচে থাকতো, যদি গত সাত দশক ধ'রে, বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে, সোভিয়েট দেশের মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে থাকতেন এক জায়গায়, কিংবা নামমাত্র উন্নতি ঘটাতেন নিজেদের অবস্থায়। কিন্তু যা ঘটেছে তা যথার্থই, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দেখলে, অকল্পনীয়। যে-কোনো দেশের, যে-কোনো কালের ইতিহাসে শুক্লপক্ষের পাশাপাশি এখানে-ওখানে ক্বচিৎ-কখনো কৃষ্ণপক্ষের ছায়া পড়তে বাধ্য। স্বভাবনিন্দুকদের কথা যদি ছেড়েও দিই, যাঁরা বিশেষ ধরনের কোনো আদর্শ বা প্রতি-আদর্শের আবেগের তাড়নায় ভুগছেন, তাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের তথ্য তথা ঘটনাবলী ঘেঁটে নেতিবাচক বা নৈরাশ্যব্যঞ্জক হাজারো বিষয় খুঁটে বের করতে পারবেন। এটা অবশ্য যে-কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, যেন বাইরেকার ফড়েদের বিরূপ মন্তব্য করবার সুযোগ ক'রে দেওয়ার জন্যই এ-সমস্ত দেশে আত্মবিশ্লেষণ-আত্মবীক্ষণের পালা শুরু।

কিন্তু যা মনে হয়, আসলে তো তা নয়। সোভিয়েট দেশের মানুষ গত সত্তর বছর ধ'রে অনেক বিভিন্ন অভিজ্ঞতার নদী-উপত্যকা অতিক্রম ক'রে এসেছেন, তাঁদের সরকারও এসেছেন : এখানে-ওখানে সফলতা, এখানে-ওখানে মুখ-থুবড়ে-পড়া, কোথাও নির্ভুল সিদ্ধান্ত, অন্য কোথাও হয়তো মারাত্মক ভুলভ্রান্তি। অথচ তা হ'লেও মূল সত্যটি তো অস্বীকার করার উপায় নেই, আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েট দেশের সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত অনন্য। এবং অর্থ-ব্যবস্থা যত এক স্তর থেকে ঊর্ধ্বতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবনচর্চার ক্ষেত্রেও সঙ্গে-সঙ্গে গোত্রান্তর ঘটেছে। ছিদ্রান্বেষীর দল অবশ্য তাঁদের বৃত্তিগত ভূমিকা থেকে কদাপি স'রে থাকেননি, অপেক্ষাকৃত কম কৃতকার্যতা যে-যে ক্ষেত্রে, তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁরা, নিজেদের চরিতার্থ বোধ করেছেন। এই সব পণ্ডিতদের কূট-কুটিল মীমাংসা অনেকটাই আমাদের অতি-অভ্যস্ত কলকাতায় সাঙ্গু ভ্যালির গোল টেবিলে প্রতি রবিবার ছুটির দিনের প্রাত্যহিক এঁড়ে তর্কের মতো। স্টালিন বা তাঁর কোন্ অনুচর কবে কোথায় কী অমার্জনীয় অপরাধ করেছিলেন, তা যদি না করতেন, উত্তর-সমালোচকদের

ভবিষ্যৎ সতর্কীকরণ পূর্বাহ্নে সঠিক অনুমান ক'রে নিয়ে সেই অনুযায়ী নিজেদের ক্রিয়াকর্ম পরিশোধিত ক'রে নিতেন, তা হ'লে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি সম্পূর্ণতর, ক্ষিপ্রতর হ'তে পারতো : আহা, এই অপোগণ্ড অবিবেচক একদেশদর্শী আদর্শান্ধ নায়ককুলের খপ্পরে প'ড়ে ঐ দেশের মানুষ এই কয় পুরুষ ধ'রে কত দুর্ভোগই না সহ্য করেছেন, আরো কত দুর্ভোগই না ওদের সহ্য করতে হবে আগামী দিনে।

অথচ যেহেতু সময় পাল্টায়, পরিবেশের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, যে-কোনো সমাজব্যবস্থাতেই পুরনো রীতিনীতিপ্রকরণপদ্ধতির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়, ইতিহাসের নিয়ম মেনেই দেখা দেয়। সোভিয়েট দেশেও সতত দেখা দিয়েছে, পূর্ব ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে, চীনের গত পঁচিশ বছরের টালমাটাল ইতিহাসও একই স্বাক্ষর বহন করছে। অনেকগুলি আলাদা সিদ্ধান্ত এক সূত্রে বাঁধা পড়ে। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হয়। যদি কেউ এই ব্যাপারটিকে শুদ্ধীকরণ নামে অভিহিত করতে চান, কিছু যায় আসে না তাতে, অভিজ্ঞতাই সামাজিক মানুষকে দক্ষ থেকে দক্ষতর হ'তে শেখায়। ইতিহাসের একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে উন্নীত হবার ক্রান্তি-মুহূর্তে কিছু-কিছু অভিনব সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে, নিজেদের ভাবনাপ্রকরণ-সূত্রাদি অতএব নতুন ক'রে গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অনেক সময় কোনো বিশেষ সফলতা থেকেও অভূতপূর্ব এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে, কিংবা নতুন নানা প্রযুক্তির ব্যাপ্তি প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন তাগিদ নিয়ে আসে। তা ছাড়া, যেহেতু বহির্বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, কিংবা বহির্বিশ্বের মূল্যায়নে নতুন চিন্তার ছায়া পড়ছে, বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের বিভঙ্গ ও বিন্যাসে অদলবদলের কথা ভাবতে হয়। এটাও বলতে হয়, আত্মবিশ্বাস যত বাড়ে, পরীক্ষার সাহসও বাড়ে সেই সঙ্গে।

এমন নয় যে সোভিয়েট দেশে এই এতদিন পর্যন্ত কোনোরকম আত্মবিশ্লেষণ-পুনর্বিবেচনা ইত্যাদি ঘটেনি, হঠাৎ গত দু'তিন বছরে সব-কিছু ওলটপালট হ'তে শুরু করেছে। যে-কোনো সজীব সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই একটি অন্তর্লীন আবেগ নিরন্তর সক্রিয়। দ্বান্দ্বিক নিয়মকলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত এই আবেগ, তার নিজের কাজ সে ক'রে যাচ্ছে বছরের-পর-বছর ধ'রে। কখনো-কখনো তা বাইরের পৃথিবীর কাছে প্রতীয়মান হয়, যেমন একবার হয়েছিল আজ থেকে বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ আগে সোভিয়েট দেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে, পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটু আদিখ্যেতা ক'রে যা তুষারগলার সঙ্গে তুলনা করার উপাখ্যান এখনো ঠিক ধূলিমলিন হয়নি। প্রায় অনুরূপ বিভঙ্গে আমাদের মাঝে মধ্যে লিবারম্যান-অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক গণেশ-ওল্টানোর প্রসঙ্গ শুনতে হয়েছে, অথবা 'চেক বসন্তে'র কথা, নয় তো পোল্যাণ্ডের প্রায় ধুন্ধুমার কাণ্ড-

খটানো 'গ্রীষ্মে'র কথা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, বিশেষ ক'রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রজাতন্ত্রে, কী ঘটছে তা নিয়ে দশকের-পর-দশক ধ'রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেড়ে-ওঠা পাড়াপড়শিদের ঘুম নেই, এই চিরঔৎসুক্যের উৎসে কিছুটা আতঙ্ক, কিছুটা পরশ্রীকাতরতা। মিখাইল গর্বাচভের চিন্তায়-কর্মে সোভিয়েট দেশের বিগত পনেরো-কুড়ি বছরের ঘটনাক্রমের সমাচ্ছন্ন প্রভাব। কতগুলি বিশেষ সমস্যায় সোভিয়েট দেশ দীর্ণ হয়েছে এই সময় জুড়ে, সার্বিক আর্থিক উন্নতির হারে ভাঁটা দেখা দিয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত থেকেছে, পরিকল্পনার পদ্ধতি-প্রকরণে এক থম-মেনে-যাওয়া কাঠিন্য লক্ষিত হয়েছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক ধরনের আড়ষ্টতা ও অভাববোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র কোন্ প্রান্তর অতিক্রম ক'রে কোথায় পৌছলো, সামনের দিকে কী দেখা যাচ্ছে, কোন্-কোন্ স্বপ্নকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে অথবা হয়নি, না হ'য়ে থাকলে কী-কী কারণে হয়নি, সাধারণ গৃহস্থের অন্তঃস্থিত আকুতি-ভাবনা-আর্তি কতটা পাল্টেছে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে কতটা সাযুজ্য ঘটেছে কিংবা ঘটেনি, বহুবিচিত্র মস্ত বড়ো দেশে বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব তথা উপযোগিতা মেনে নেওয়া হ'লেও তা স্বীকৃত, পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার পোড়-খাওয়া পরিকল্পনার প্রকরণ-পদ্ধতির সঙ্গে কী অনুপাতে মেলানো সম্ভব, এ-সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে বহু জটিলতা দেখা দিয়েছে, বিশেষ ক'রে সত্তরের দশক জুড়ে। তা ছাড়া বাইরের পৃথিবী তার ছায়া ফেলেছে; পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিভীষিকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্রান্ত নব-নব অভিযাত্রা, এশিয়া আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সদ্যোমুক্ত অথবা সংগ্রামরত মানুষের দীপ্ত কাহিনী, সে-সব দেশে বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের উন্মোচন, কোনো-কিছুই সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের অন্য একটি অধ্যায় তাই গর্বাচভের নেতৃত্বে আপাতত বিকচিত হ'তে শুরু হয়েছে, এবং হয়েছে ইতিহাসেরই তাগিদে। আত্মবিশ্বাস এখন বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ব'লেই গর্বাচভের পক্ষে আজ খোলামেলা অনেক পরীক্ষার কথা বোধ হয় বলা সম্ভব। দলের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের বিনিময়-প্রতিবিনিময়ে সম্পূর্ণতা আনতে হ'লে, সমাজ-তন্ত্রের সঙ্গে ব্যাকরণিক গণতন্ত্রকে মেলাতে হ'লে, আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি আর্থিক ব্যবস্থার একেবারে নিচের তলা পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের সূত্রাদি প্রসারের প্রয়োজন, পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুনাফাভিত্তিক প্রতি-যোগিতাকেন্দ্রিক অর্থকলার গ্রহণীয়তা, প্রযুক্তির উন্নতি যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ঘটাতে গেলে বহুজাতিক সংস্থাদির উপর নির্ভর করার যৌক্তিকতা বা যুক্তি-হীনতা, সোভিয়েট নেতা রেখে-ঢেকে কিছু বলেননি। স্পষ্ট উচ্চারণে সমস্যা-গুলি ব্যক্ত করেছেন, অতীতের ভুলভ্রান্তির দিকে আঙুল তুলে ধরেছেন, তাঁর নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা অল্প কথায় গুছিয়ে বলেছেন। সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থার বাইরে যাঁরা অবস্থান করছেন, তাঁদের কাছে এ-ধরনের অকপট তীক্ষ্ণ বাচন যুগপৎ বিস্ময় ও অস্বস্তির উদ্রেক করেছে। অন্তত তাঁদের কাছে, মিখাইল গর্বাচভের এবংবিধ সুবিস্তৃত আলোচনা না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝখানে অত্যুজ্জ্বল তারকার প্রতিভা নিয়ে বিভাসিত।

কিন্তু তার মানে অবশ্যই এটা নয় যে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী ইতিহাস অপেক্ষাকৃত ব্যর্থতা বা অন্ধকারের ইতিহাস, অর্থনীতি অথবা সমাজগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে, কিংবা সোভিয়েট বিপ্লবের ইতিহাসে, লেনিনের পরই গর্বাচভ প্রধান পুরুষ। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে ঋজুভাষণে নিঃসংকোচে গর্বাচভ যে কথাগুলি আজ বলতে পারছেন, সোভিয়েট দেশ সুসংবদ্ধ-সুমহান্ একটি সোপানে উত্তীর্ণ ব'লেই পারছেন। এবং যে-যে পরীক্ষা বা অন্বেষণের কথা তিনি উচ্চারণ করছেন, তাদের সব-ক'টিই যে ধোপে টি'কবে তা নয়, কারো-কারো সার্থকতা প্রমাণিত হবে, কোনো-কোনোটিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে মেলাতে গেলে ঈষৎ পরিশোধন ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে, কিছু-কিছু পরীক্ষা অসফল হবে, অভিজ্ঞতার পোড় খেয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা নতুন-এক ভারসাম্যে পৌছুবে, সেই ভারসাম্য থেকে অতঃপর উৎকৃষ্টতর কোনো ভারসাম্যের দিকে প্রব্রজ্যায় মগ্ন হবে, ভাবনায়-অনুভাবনায় সংঘাত হবে, এক কর্মকলাপের সঙ্গে অন্য ক্রিয়াকলাপ দ্বন্দ্বযুক্ত হবে, দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের গতিপথ ধ'রেই ভবিষ্যৎ নিজেকে উদ্ঘাটিত করবে।

মিখাইল গর্বাচভের এই গ্রন্থ অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যার নাম দিয়েছেন তিনি 'পুনর্গঠন'। কিন্তু পুনর্গঠন তো গঠনেরই প্রান্তিক ইতিহাস, যে-প্রান্তে আমরা বিরাজ করছি, তার। গঠনের সঙ্গে এক সূত্রে তাই পুনর্গঠনের প্রসঙ্গও বাঁধা। তবে সম্পূর্ণ নতুন ক'রে যে-মূল্যায়ন বইটিতে ব্যক্ত তা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ক্রুশ্চভ তাঁর সময়ে বহুবার বলেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শ্রেণীযুদ্ধ থেকে স'রে আসা নয়, আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিশেবেই ক্রুশ্চভ পুঁজিবাদী দেশগুলিকে আর্থিক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। মিখাইল গর্বাচভ অন্য বৃত্তে চ'লে গেছেন। চতুর্দিকে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভার, সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথাগত শ্রেণীসংগ্রামের ঋতু অতএব অবসিত। বাস্তবকে মেনে নিতে হবে, এবং মেনে নিয়ে বোঝাপড়ায় আসতে হবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে, সহাবস্থানের বোঝাপড়া, নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য নিয়ে বোঝাপড়া। এই সংযমের অভাব ঘটলে মানবজাতির সামগ্রিক সর্বনাশ, অতএব দেশে-দেশে শ্রমজীবী মানুষেরও সর্বনাশ। এটা আদর্শ থেকে স'রে আসা নয়, আদর্শকে কঠিন সত্যের আগুনে ঝালিয়ে নেওয়া।

গর্বাচভ অর্গলের পর অর্গল অবারিত করার কথা বলেছেন। স্বভাবতই তাঁর বইয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাইরের জগতের কথা, নিরস্ত্রীকরণের কথা, নিরস্ত্রীকরণের পর পৃথিবীর চেহারাটা কেমন দাঁড়াতে পারে সে-সম্পর্কে নানা সম্ভব-অসম্ভবের কথা, যে-জাতিসমষ্টিকে সাংবাদিকতার ভাষায় 'তৃতীয় বিশ্ব' ব'লে অভিহিত করা হয় সে-সব দেশের সম্পর্কে প্রভূত অনুকম্পা-তথা-অন্তর্বেদনাসঞ্জাত কথা, আমাদের ভারতবর্ষের কথা। এতটা জায়গা জুড়ে পুরোপুরি আলাদা সমাজব্যবস্থায় স্থিত রাষ্ট্রাদির সমস্যা নিয়ে এত বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বে সোভিয়েট দেশের অন্য-কোনো সর্বোচ্চ নায়কের কাছ থেকে শোনা যায়নি। এবং সমস্ত আলোচনায় ছড়িয়ে আছে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে, যুক্তি ও বিচারের প্রসঙ্গে পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার।

সব শেষে অবশ্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি থেকেই যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে গর্বাচভের নায়কত্বে যে-পরীক্ষা শুরু হয়েছে, কিংবা পূর্ব ইওরোপের অন্যত্র যে-ধরনের অনুশীলন চলছে, অথবা চীনে, আধুনিকীকরণের তাগিদে, তাদের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার স্বপ্ন কতটা সফল হবে? মানুষ কি লোভ-অসূয়া ব্যক্তিগত ঝোঁক সব-কিছু উত্তরণ ক'রে প্রেমসুষমানন্দিত পারিজাত-ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে? আমরা কেউই এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব এই মুহূর্তে বুকে হাত দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবো না। শেষ পর্যন্ত যুক্তির সঙ্গে—যাকে বলতেই হবে ধর্মবিশ্বাস—তা যুক্ত হবেই।

না, তিনি মেলাবেন না

বাস্তব ঘটনাবলী থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, সত্যের সারাৎসার ছেঁকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করি। সমাজতান্ত্রিক চীনে বিগত মাসখানেকেরও বেশি সময় ধ'রে যা ঘ'টে গেল, এবং আপাতত যে-ঘটনাক্রমের যতিপাত হয়েছে ব'লেই মনে হয়, তা আমরা কয়েক হাজার মাইল দক্ষিণে এশিয়ার অন্য-এক বৃহৎ ভূখণ্ডে যারা আছি, তাদেরও অস্পর্শিত রাখতে পারে না। আমাদের আবেগ দোলায়িত হয়েছে, আমাদের উদ্বেগ, আমাদের শ্রদ্ধাজনিত ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা-জনিত উদ্বেগ। কারণ কী ক'রে এটা আমরা ভুলি বিংশ শতাব্দীর যে-দুই মহান্ বিপ্লব মানবেতিহাসের প্রকৃতি পাল্‌টে দিয়েছে, তার একটি সংসাধন করেছেন চীনের কোটি-কোটি সাধারণ মানুষ। সেই বিপ্লবের আদর্শ থেকে আমরা, পৃথিবীর অন্যত্র যে-যেখানে থাকি না কেন, প্রেরণা খুঁজে বেড়াই। বিপ্লবোত্তর চীনে সমাজ ও অর্থব্যবস্থার বিন্যাস ও গঠন নিয়ে যে-প্রবহমান পরীক্ষা গত চার দশক ধ'রে চলেছে, তার থেকেও প্রেরণা খুঁজি আমরা, অহরহ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় প্রগতি ক্ষিপ্রতম করতে হ'লে কোন্ প্রকরণের উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়, অথবা কোন্ পদ্ধতি বর্জনীয়, সেই বিতর্ক কান পেতে শুনি। আদর্শবোধের দায় এটা।

চীনের পার্টি এক মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলেন দশ-বারো বছর আগে। পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার প্রান্তর অতিক্রম ক'রে এসেছেন। ঐ অস্থির বছরগুলিতে চীনের অর্থব্যবস্থায় বেশ-কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কৃষিতে-শিল্পে আশানুরূপ উন্নতি ব্যাহত, ঐ সময়কার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে এখন; নীতিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁরা অতএব সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, কিছু-কিছু শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। পরিবর্তন অর্থে শুদ্ধিকরণ, এবং, সেই ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু ক'রে, চীনের জনগণ অনেকগুলি শুদ্ধিকরণের অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে নতুন যে-পরীক্ষার কথা বলা হলো তা, যে-কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, অনেকরকম ঝুঁকিতে ছাওয়া। সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য শিথিল করা হবে না, শ্রমজীবী শ্রেণীর একচ্ছত্র নায়কত্বের অধিকার অব্যাহত থাকবে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও সেই সঙ্গে তার অবৈকল্য বজায় রাখবে, মার্ক্স-লেনিন-মাওয়ের চিন্তাধারা-সঞ্জাত মৌল আদর্শে অবিচল থাকা যাবে। কিন্তু, আদর্শের শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও, অর্থ-

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, ঢালাও পরীক্ষা করা হবে। 'সমাজতান্ত্রিক' আধুনিকীকরণের পরীক্ষা, যে-পরীক্ষার প্লাবনে উথালপাতাল অনেক-কিছু ঘ'টে গেছে গত দশ-বারো বছর ধ'রে চীন দেশে।

পার্টির নায়কত্ব অব্যাহত, সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য অবিচল, নেতৃত্ব জুড়ে গভীর আত্মবিশ্বাস, যে-ক'রেই-হোক আর্থিক প্রগতির হার বাড়াতেই হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে, নেতৃকুল সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, কিছু-কিছু সাময়িক, সীমিত পরীক্ষার প্রয়োজন অর্থনীতির ক্ষেত্রে: আমাদের সমাজতন্ত্র কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, কমিউনিস্ট পার্টির সব ক্ষেত্রেই শেষ সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে, সুতরাং চোর-ডাকাতের ভয় নেই আমাদের; কৃষি-শিল্পে উৎপাদনের হার যেহেতু আরো ঢের বাড়ানো প্রয়োজন, আশু প্রয়োজন, কিছু-কিছু পরীক্ষায় নিযুক্ত হবো আমরা। নেতারা এবং পরিকল্পনাবিদ্‌রা মিলে স্থির করলেন, গ্রামাঞ্চলে যূথবদ্ধ কমিউন ব্যবস্থা শিথিল করা হলো, ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় চাষাবাদের বর্গক্ষেত্র আগে যা ছিল সমগ্র কৃষিভূমির মাত্র শতকরা সাত ভাগ, তা বাড়িয়ে শতকরা কুড়ি ভাগে পৌঁছে দেওয়া হলো, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বাইরে উদ্বৃত্ত ফসল খোলা বাজারে যথেচ্ছ দামে বিক্রি করবার অধিকার দেওয়া হলো। সম্পন্ন চাষীদের বলা হলো বাড়তি উপার্জন তাঁরা ব্যাংকে রেখে সুদ পেতে পারেন, নয় তো এমনকি তা তাঁরা ফাটকা বাজারে ফলাও দাঁও মারবার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি, শিল্পের ক্ষেত্রে পড়ি-কি-মরি-গোছের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে, এক প্রস্থ নতুন বিধান ঘোষণা করা হলো। ভারি শিল্পে বিনিয়োগের অনুপাত কমিয়ে আনা হলো, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের অনুপাত অনুরূপ হারে বাড়ানো হলো, কারখানায়-কারখানায় শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্টি থেকে যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ নজরদারির প্রথা ছিল, তা শিথিল ক'রে আনা হলো। বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তির দেশে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে বিধিনিষেধ প্রায় পুরোপুরি অর্গলমুক্ত করা হলো, আমদানির ক্ষেত্রে বাছবিচার প্রায় রইলো না, ফলে ১৯৮০ সাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত, চীনের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা বিদেশীদের, প্রধানত মার্কিন ও জাপানীদের, সঙ্গে অন্তত পাঁচ হাজার প্রযুক্তিগত চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। বিদেশীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিন হাজারেরও বেশি কারখানা চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিদেশীদের কাছ থেকে ঢালাও পেটেন্ট কেনা হয়েছে, বিদেশী ঠিকেদারদের বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হোটেল তুলছেন-কারখানার তদারকি করছেন-পর্যটন ব্যবস্থা প্রসারের দায়িত্ব নিয়েছেন। ১৯৮০ সালে চীনে-বেড়াতে-যাওয়া বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন লক্ষে সীমিত ছিল, গত বছর তা দুই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। আস্তে-আস্তে বেড়ে-বেড়ে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ এখন প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি মার্কিন ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং প্রত্যক্ষ

বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ পৌছেছে প্রায় আড়াইশো কোটি মার্কিন ডলারে। অবশ্য ভারতবর্ষের বৈদেশিক ঋণের বোঝার সঙ্গে তুলনায় চীনের বৈদেশিক ধার অতি যৎসামান্য। তবে চীনে বিদেশীদের সহযোগিতায় শিল্প-প্রসারের প্রবণতা একটি বিশেষ ঝোঁক নিয়েছে। কাতারে-কাতারে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা এসেছেন গত কয়েক বছর ধ'রে, তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশের সর্বত্র, হাজার-হাজার চীনে ছাত্রছাত্রী বিদেশে, বিশেষ ক'রে মার্কিন দেশে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-তথা পরিচালনাতত্ত্বে দীক্ষিত হ'তে গেছেন, তাঁরা কেউ-কেউ শেষ পর্যন্ত ফিরেও আসেননি। অন্য দিকে মার্কিন প্রযুক্তিবিদ্‌-শিক্ষক-অধ্যাপকে চীন ছেয়ে গেছে। 'গীতাঞ্জলি'র সেই বিখ্যাত গান, 'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি কি তার পায়ের ধ্বনি, সে যে আসে আসে আসে': চীন দেশে, গত কয়েক বছর ধ'রে, বিদেশী, বিশেষ ক'রে মার্কিন, বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞমন্যদের সেরকম অবিরত পদধ্বনি শোনা গেছে, তাঁরা এসেছেন, এসেছেন, আরো এসেছেন।

চীনে পার্টির নেতৃত্ব আত্মপ্রত্যয়শীল ছিলেন, পার্টির নেতৃত্ব জাতির সর্বোচ্চ আসনে সমারূঢ, সমাজতন্ত্রের অন্তিম লক্ষ্যে তাঁরা স্থির আছেন। ইতিমধ্যে যদি বিবিধ-বিচিত্র কুশলতা, প্রযুক্তি ও প্রকরণ ব্যবহার ক'রে কৃষি-ও শিল্পব্যবস্থায় সামগ্রিক উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে নেওয়া যায়, ক্ষতি কী তাতে, ঐ বিশেষ-বিশেষ প্রকরণ বা প্রযুক্তির যদি, ঐতিহাসিক বিচারে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্য না-ও ঘটে, তা হ'লেও চিন্তার কারণ নেই। অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ তো পার্টি নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানগত, যদি কোথাও কোনো সাময়িক আদর্শগত বিচ্যুতি ঘটে, তা অচিরে সংশোধন ক'রে নেওয়া হবে।

এখানেই, সন্দেহ হয়, পাটিগণিতের হিশেবে ঈষৎ অসংগতি প্রবেশ করেছে চীন দেশে হালের বছরগুলিতে। কোনো বিশেষ প্রযুক্তিকে সেই প্রযুক্তির জন্মপরিবেশ থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে বিচার করা মনে হয় সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে যে-অধ্যাপক-শিক্ষক-বিশেষজ্ঞরা বেজিঙয়ে-সাংহাইয়ে-হ্যাংকাওয়ে-শেজোয়ানে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছেন, তাঁরা তাঁদের মতাদর্শগত ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়ে যাননি, বিশ্ব ব্যাংক থেকে যে-পণ্ডিতরা গিয়ে চীনের অর্থ বা বাণিজ্য মন্ত্রককে আর্থিক বিকাশের মূলমন্ত্রে তালিম দিচ্ছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত মুনাফার কথা প্রচার করবেনই, সামাজিক মানুষকে দুয়ো দিয়ে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিপুরুষের মহত্ত্বের বাণী ফলাও ক'রে তাঁরা ব'লে বেড়াবেন, যে-ছাত্র-ছাত্রীরা মার্কিন দেশ থেকে ফিরে যাচ্ছেন, তাঁরা অস্পর্শিত থাকেননি, তাঁদেরও হয়তো বোঝানো হয়েছে; দেশের অধিকাংশ মানুষের সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র নিজেদের নিয়ে ব্যাপৃত হবার মধ্যে কোনো পাপ নেই।

তা ছাড়া, যে-ক'রেই-হোক-আপাতত-অর্থব্যবস্থার-মোড়-ফেরানো-হোক-

আদর্শের - অবৈকল্য - নিয়ে-পরে - ভাবা- যাবে-অথবা-আদর্শ নিয়ে-ভাববার-জন্য-নেতারা-আছেন এই মানসিকতা পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে অন্য কতগুলি সমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে যে-কৃষক তার উদ্বৃত্ত ফসল বেশি দামে বিক্রি ক'রে টাকার মুখ দেখেছে, সে বাড়ির ভোল ফিরিয়েছে অথবা রঙিন টেলিভিশন কিনেছে, সে এবং তার পরিবার আস্তে-আস্তে আরো অনেক বেশি পরিমাণ ব্যক্তিগত মুনাফা করার স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছে, তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধে টল নেমেছে। গ্রামাঞ্চলে একই কারণে আর্থিক অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে অশান্তি ছড়িয়েছে। হঠাৎ বিদেশে পণ্য রপ্তানি বহুগুণ বেড়ে গেছে, কারখানার উপার্জন বেড়েছে, কারখানায়-নিযুক্ত শ্রমিকদের উপার্জনও সেই সঙ্গে বেড়েছে। গ্রামে-শহরে কিছু কিছু মানুষের আয় এভাবে বর্ধমান। কিন্তু তাঁরা যে-যে ভোগ্যপণ্য কিনতে আগ্রহবান, সে-সব জিনিশের জোগান হয়তো এখনো তুলনামূলক ভাবে বাড়েনি, অতএব অসন্তোষ, অতএব বাজারে চাপ, মূল্যমানবৃদ্ধি। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময় জুড়ে চীনে দেশে সামগ্রিক মূল্যমান এমনকি শতকরা পাঁচ ভাগও বাড়েনি, এই পঁচিশ বছরে কোনো-কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে দাম এমনকি মাঝে-মধ্যে কমানোও হয়েছে। সেই চীনেই অথচ জিনিশপত্রের দাম গত দু'তিন বছরে বাৎসরিক দশ শতাংশ হারে বাড়ছে।

যে-ছেলেমেয়েদের মার্কিন দেশে পাঠিয়েছিলেন চীনের নেতৃবৃন্দ, তাদের উপর মস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছিল: তোমরা আধুনিকতম প্রযুক্তি শিখবে, কিন্তু সেই প্রযুক্তির আনুষঙ্গিক জীবনচর্যা তথা সংস্কৃতি থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রাখবে। যে-আমলা বা শ্রমজীবীদের কাছে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ানোর উপযোগিতার তত্ত্ব নিয়ে সমুপস্থিত, তাঁদের বলা হলো বিশেষজ্ঞদের কথাবার্তার খানিক-খানিক গ্রহণযোগ্য, বাকিটা নয়। বর্ধিষ্ণু কৃষক কোনো-কোনো ফসল চড়া দামে বাজারে বিক্রি করেছে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে তারিফও সে পেয়েছে উৎপাদন প্রসার ঘটিয়ে বাজারে বেশি পরিমাণ বিক্রি করার জন্য। সুতরাং সব পণ্যের ক্ষেত্রেই কেন সে যথেচ্ছ দামে বিক্রি ক'রে বাড়তি টাকা রোজগার করতে পারবে না, দরকার হ'লে লুকোচুরি ক'রে কালোবাজারেও সে কেন দুষ্প্রাপ্য জিনিশ বেশি দামে বিক্রি ক'রে অনেক, অনেক টাকা অর্জন ক'রে সেই টাকা বিলাসী দ্রব্যের উপভোগের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারবে না, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে সে ভাবিত হয়েছে। সেই ভাবনা ক্রমে অসন্তোষের রূপ নিয়েছে।

আরো যা বলা প্রয়োজন, চীনের তরফ থেকে 'রাজনীতি-বর্জিত' বাণিজ্যিক বা প্রযুক্তিগত আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হ'লেও, পশ্চিমের দেশগুলির পক্ষ থেকে তেমন কোনো 'রাজনীতি-বর্জিত', সু-ভদ্র, সু-মার্জিত ভাবনা-অনুভাবনা

ছিল না। বরঞ্চ পাশ্চাত্ত্যে অনেকে এটা ধ'রেই নিয়েছিলেন ঐ সব সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-ফাদর্শ বাজে কথা, চীনের কর্তৃপক্ষ এখন একমাত্র দ্রুততম আধুনিকী-করণের লক্ষ্যেই বিশ্বাস করেন, জায়গাবিশেষে এবার একটু চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই চীনকে ফের ধনতান্ত্রিক ভিড়ে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

তাঁদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, দালালে-গুপ্তচরে তাঁরা চীন ছেয়ে ফেলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতার প্রসঙ্গ-জড়িত অনেক খেউড়-তরজা তাঁদের উৎসাহে-উদ্যোগে সংগঠন করার চেষ্টা চলেছে বেশ কিছু সময় ধ'রে। টিয়েনমিয়েন চত্বরে এই পর্বের শেষ অধ্যায় আপাতত অনুষ্ঠিত হলো। অবশ্যই কিছু রক্তক্ষয় ঘটেছে, কিন্তু এই দুঃখজনক অবসাদ-উদ্রেককারী ঘটনাবলীর দায়ভার কতটা পরিমাণ বিদেশী উৎসাহদাতাদের উপর বর্তাবে তা নিয়ে নিশ্চয়ই চুল-চেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জগৎ জুড়ে প্রতিবিপ্লবীরা হঠাৎ ধোওয়া তুলসীপাতা হয়ে যাননি, চীনের আভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে তাঁরা ফায়দা লুটবার চেষ্টায় আছেন, থাকবেনও আরো কিছু সময়, যতদিন না সম্পূর্ণ আশাভঙ্গ হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র যাঁরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে স্থিত, যাঁদের অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত, মানবিক অধিকারের সুন্দরতম, নিষ্পাপতম, পরিস্ফুটতম বিকাশ সম্ভব একমাত্র সমাজতন্ত্রের ছায়াদায়ী আশ্রয়ে, তাঁরাও অবশ্য চীনের ঘটনাবলী থেকে মস্ত শিক্ষা পেলেন: তেলে-জলে মিশ খায় না পুঁজিবাদের প্রক্রিয়া এমনকি সাময়িকভাবে ধার ক'রে নিয়েও সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভব নয়; সেরকম চেষ্টায় ব্রতী হ'লে পুঁজিবাদের ঘুণ সমাজতন্ত্রের হৃৎযন্ত্র কুরে-কুরে খাবে। আমরা ঔদার্যে আস্থা রাখবো, আমরা নির্ভীক আত্মবিশ্লেষণ-আত্মসমালোচনা থেকে অপসরণ করবো না, অথচ কুহকমায়ায়ও ভুলবো না, আদর্শের অনুশাসন থেকে কদাপ বিচ্যুত হবো না, আদর্শের সঙ্গে সুবিধাবাদ অথবা তাৎক্ষণিক হঠকারিতার মিলন ঘটাবার লোভ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে আসবো: এ বড়ো কঠিন পাটিগণিত। আদর্শের কোনো বিকল্প নেই; সামনের দিকে, যদি সন্দেহ হয়, দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই, তা হ'লেও নেই। চীনের পার্টি, চীনের জনগণ, চীনের আদর্শবাদীরা, তাঁদের নিজেদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যে-আপাতবন্ধুর সমস্যার তাঁরা সম্মুখীন, তা থেকে উত্তরণের যথাযথ পথ নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবেন। কিন্তু আমরাও, আমাদের বিশেষ সংস্থানে দাঁড়িয়ে, অনুশীলিত হলাম। তিরিশের দশকে এক বাঙালি কবি দুঃসাহসী উক্তি করেছিলেন: 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। /···তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে / যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে, মেলাবেন'। না, তিনি, তা যিনিই হোন, মেলাবেন না, মেলাতে পারেন না: আদর্শের সঙ্গে আদর্শহীনতার মিল হয় না, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রেরও হয় না। আদর্শকে পাশে সরিয়ে রেখে স্রেফ প্রকরণের উপর নির্ভর ক'রে আমরা এগোতে পারবো

এই কিংবদন্তীতে বিশ্বাস আরোপ করলে আমাদের আদর্শবোধও বিপদগ্রস্ত হবে।

অশান্ত সময়, অপ্রিয় প্রসঙ্গ, কিন্তু সব ঋতুতেই, প্রতি অবস্থাতেই, আদর্শের বিকল্প নেই।

বেঁকে যাচ্ছে, আরো বেঁকে যাচ্ছে

যে-বছর শেষ হয়ে এলো, তারই একটি ঘটনা নিয়ে বলি। মাত্র মাস দুয়েক আগেকার ঘটনা। সৈয়দ নুরুল হাসানকে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের পদ থেকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো, পাঠানো হলো ভুবনেশ্বরে। রাজ্যপালদের কাজের মেয়াদ পাঁচ বছরের। মহা ঢক্কানিনাদ সহকারে ইন্দিরা গান্ধি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের জন্য যে-কমিশন বসিয়েছিলেন, সেই সারকারিয়া কমিশন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন, এই পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যপালদের এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে বদলি করার ব্যাপারটা ঘোর অসমীচীন, এবং, যদি করতেই হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রতি ক্ষেত্রে তার কারণ জানিয়ে সংসদে প্রতিবেদন পেশ করা প্রয়োজন।

দু'বছরের মাথায় নুরুল হাসানকে সরিয়ে দেওয়া হলো, কারণ হিশেবে কিছু বলা হলো না, সংসদে কিছু জানানো হলো না। কারণটা জানানো অসুবিধা, তাই জানানো হলো না। এখানকার কংগ্রেসিদের পছন্দ হচ্ছিল না এই লেখাপড়া-জানা মৃদুভাষী অতি-সজ্জন রাজ্যপালকে। কংগ্রেসিরা ধ'রেই নিয়েছেন যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালকে নিয়োগ ক'রে থাকেন, কেন্দ্রের শাসক দলের কথায় রাজ্যপাল উঠবেন, বসবেন, নড়বেন, চড়বেন, শীস দেবেন, গান গাইবেন; রাজ্যপাল হবেন শাসক দলের তথা প্রধান মন্ত্রীর গৃহভৃত্য, শাসক দল যদি বলে জল উঁচু, তিনি বলবেন জল উঁচু, শাসক দল যদি বলে জল নিচু, তিনিও বলবেন জল নিচু। অতীতে, যেমন ইন্দিরা গান্ধির প্রথম কিস্তির রাজত্বে, পশ্চিম বঙ্গে রাজ্যপাল ছিলেন ধরমবীর, কংগ্রেস দলের হয়ে এমন-কোনো অপকর্ম নেই যা তিনি সেই ষাটের দশকের শেষের দিকে এই রাজ্যে করেননি। এমন আরেকজন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন কয়েক বছর আগে অন্ধ্র প্রদেশে, রামলাল না শ্যামলাল কী যেন নাম, অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী রাম রাও চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে রাজ্যপাল মহোদয় মুখ্য মন্ত্রীকে বরখাস্ত ক'রে কংগ্রেস দলের মনোমত একজনকে সেই আসনে বসিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য কংগ্রেস দলের আখেরে প্রভূত ক্ষতিই হলো। কিন্তু তাতে কী।

বর্তমান মুহূর্তে কংগ্রেস দলের সবচেয়ে পছন্দের রাজ্যপাল কেরলের রামদুলারী সিংহ এবং অন্ধ্র প্রদেশের কুমুদবেন যোশী। দু'টি রাজ্যেই অকংগ্রেসি সরকার, এবং দুই রাজ্যপাল মহিলাই প্রতিদিন নানা ধরনের চিমটি কেটে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে যন্ত্রণার মধ্যে রাখছেন: কখনো রাজ্য সরকারের পরোক্ষ নিন্দা ক'রে

ভাষণ পড়ছেন, কখনো রাজ্য মন্ত্রিসভার মতামত অগ্রাহ্য ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নাক গলাচ্ছেন, কখনো রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত কোনো অত্যাবশ্যক আইন সামান্য ছুতোয় আটকে দিচ্ছেন, আর পুরোটা সময়ই রাজভবনে কংগ্রেস দলের বেসরকারি দপ্তর খুলে রেখে দিয়েছেন।

এখানেই এই রাজ্যের কংগ্রেসিদের নুরুল হাসান সম্পর্কে রাগ। ঐ অপদার্থ অধ্যাপকটিকে দিয়ে তাঁদের কোনো কাজ হচ্ছিল না। তাঁরা প্রতিদিন রাজ্যপালের কাছে ধর্ণা দিচ্ছিলেন, পশ্চিম বঙ্গে আইনশৃঙ্খলা নাকি পঞ্জাবের চাইতেও খারাপ; এই রাজ্যের মন্ত্রিসভা অতি অপদার্থ-দুর্নীতিগ্রস্ত, এই রাজ্যে নাকি সর্বদা প্রত্যেককে প্রাণ হাতে ক'রে ফিরতে হয়, অতএব এই বাম ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস দল শতধাবিভক্ত, নিজেদের মধ্যে অহরহ প্রকাশ্যে মারামারি করছেন, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ ক'রে দলের সংগঠন প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন স্তরে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে-উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের কাছে একাদিক্রমে হেরে যাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দল এই রাজ্যে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাম ফ্রন্টকে বাগ মানাতে না পেরে এখন তাঁরা ভাবছেন রাজ্যপালকে ব্যবহার করা যাক: রাজ্যপাল তো তাঁদের কেনা গোলাম, উঠতে বললে উঠবেন, বসতে বললে বসবেন, সুর ক'রে নামতা পড়তে বললে সুর ক'রে নামতা পড়বেন; সুতরাং রাজ্যপাল এবার কংগ্রেস দলকে একটু সাহায্য করুন। যদি রাজ্য মন্ত্রিসভাকে এই ছুতোয় বা ঐ ছুতোয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ ক'রে বরখাস্ত না-ই বা করেন, অন্তত কেরল বা অন্ধ্র প্রদেশের ঐ দুই মহীয়সী মহিলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে এখানে বাম ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখতে অসুবিধা কোথায়? সৈয়দ নুরুল হাসান মশাই এখন থেকে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসুন. যে-কংগ্রেস দল তাঁকে রাজ্যপাল বানিয়েছে, তার ঋণ শোধ করুন।

মুশকিল হলো যদিও অধ্যাপক নরুল হাসান জবাহরলাল নেহরু ও তাঁর পরিবারস্থ প্রত্যেকের সম্পর্কে অমেয় শ্রদ্ধা পোষণ ক'রে থাকেন, নেহরুদের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করতে তিনি সতত প্রস্তুত, কংগ্রেস দলের হয়ে বামফ্রন্টের পিছনে কাঠি দিতে তাঁর ভদ্রতাবোধে বাধছিল। কেরল কিংবা অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যপালের মতো প্রতিদিন রাজ্য সরকারকে অকারণ চিমটি কেটে বিরক্ত করতেও তাঁর বিবেক বাদ সাধছিল। তা ছাড়া, গোটা ভারতবর্ষে কোথায় কী ঘটছে সে-সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল, এখানকার আইনশৃঙ্খলার অবস্থা অথবা সাধারণভাবে প্রশাসনিক পরিস্থিতি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কেমনধারা সে-ব্যাপারে তাঁর অন্তত কোনো দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল না। অতএব কংগ্রেসিরা তাঁর কাছে প্রত্যহ ধর্ণা দিচ্ছিলেন, প্রত্যহই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরছিলেন।

সুতরাং কংগ্রেসিরা সদলবলে দিল্লি গিয়ে নালিশ জানালেন প্রধান মন্ত্রীর কাছে। তাঁদের লড়াই বাঁচার লড়াই, এমন গবেট রাজ্যপালকে দিয়ে তাঁদের চলবে না। নুরুল হাসান রাজ্যপাল হিশেবে বহাল থাকলে আগামী তিন প্রজন্মেও কংগ্রেসের রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না; হুজুর ধর্মাবতার, এই অপদার্থ রাজ্যপালটিকে তাই পশ্চিম বাংলা থেকে সরিয়ে দিন।

ভৃত্যদের সঙ্গে প্রভুবৎ আচরণ করতে হয়, প্রধান মন্ত্রী এই নীতিতে স্পষ্টতই বিশ্বাসী। দয়া ক'রে ডেকে নিয়ে রাজ্যপালের চাকরি দেওয়া হয়েছে, অথচ লোকটা দলের কথা শুনছে না, জ্যোতি বসুর পাকা ধানে মই দিচ্ছে না, এ-ধরনের আচরণ ক্ষমাহীন, গোলাম গোলামের মতো থাকবে। প্রধান মন্ত্রী তাঁর দলের লোকদের প্রার্থনার মান রাখলেন, পশ্চিম বাংলা থেকে সরিয়ে দিলেন অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসানকে। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হলো ওড়িশায়। পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ তথা রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ, কিন্তু, সংবিধানের বেড়াজালে আবদ্ধ, তাঁদের কিছু করবার নেই, একমাত্র প্রতিবাদ জানানো ছাড়া। তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন, এবং নুরুল হাসানকে অভূতপূর্ব বিদায় সংবর্ধনা দিলেন, অর্থাৎ তাঁদের দিক থেকে যতটুকু করণীয় তা তাঁরা করলেন।

একটা খটকা কিন্তু তা হ'লেও থেকেই যায়। নুরুল হাসান মশাই কেন মাথা পেতে এই শাস্তি মেনে নিলেন? তিনি নিজে কেন প্রতিবাদ জানালেন না, নিজে কেন বদলির নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন না? দেশজোড়া তাঁর নাম, পণ্ডিত-মনীষী হিশেবে সবাই মান্য করে তাঁকে, তিনি যদি এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতেন, এবং প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করতেন, ধুন্দুমার কাণ্ড হতো তা হ'লে। এমনকি তাঁর পদত্যাগ না করলেও হয়তো চলতো, পদত্যাগ করবেন এই শাসানিটুকুও যদি কর্তাব্যক্তিদের কাছে জ্ঞাপন করতেন, কেন্দ্রের স্বৈরতান্ত্রিকরা ভয়ে কুঁকড়ে আসতেন তা হ'লে, খামখেয়ালবশে ঢালাও অন্যায় আদেশ দেওয়ার আগে বাধ্য হয়ে চিন্তা করা শুরু করতে হতো তাঁদের। হায়, সৈয়দ নুরুল হাসান সে-রকম কিছুই করলেন না, বশংবদ আমলার মতো প্রধান মন্ত্রীর অনুজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বরে নিজেকে স্থানান্তরিত করলেন।

জ্ঞানী-গুণীজনকে আমরা সম্মান জানাই, আস্থা রাখি তাঁরা জাতিকে সঠিক দিগ্‌নির্দেশ দেবেন। শাসককুল যদি দেশকে ভুল পথে চালিত কয়তে চান, আমরা আশা পোষণ করি সৈয়দ নুরুল হাসানের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। নুরুল হাসানের কাছে একটি সুযোগ এসেছিল এটা প্রমাণ করার যে পণ্ডিত-মনীষী মানুষেরা ফেলনা নন, তাঁদের কানে ধ'রে ওঠ-বস করানো যায় না, তাঁদের সম্মান তাঁরা নিজেরাই রক্ষা করতে জানেন, এবং

তাঁরা কখনো কোনো অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। কিন্তু, না, অধ্যাপক নুরুল হাসান মশাই সেই সুযোগটি গ্রহণ করলেন না, বিবেককে তিনি পাশে সরিয়ে রাখলেন। রাজ্যপালের চাকরি করেছিলেন, রাজ্যপালের চাকরি ক'রে যাচ্ছেন, মান-অপমানবোধের বালাই না ক'রে।

বছর শেষ হয়ে এলো, এই ফেলে-আসা বছর একটি বিষণ্ণ বীক্ষাতেই পৌঁছে দিয়ে গেল বর্তমান লেখককে: অগ্রগামী অধঃপাতের আবর্তে বিরাজ করছি আমরা, শ্রদ্ধা করা যায়, সম্মান জানানো যায়, যাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হওয়া যায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা, পৃথিবীতে না হ'লেও অন্তত আমাদের দেশে, ক্রমশ ক্ষীয়মাণ; মেরুদণ্ডগুলি বেঁকে যাচ্ছে, আরো বেঁকে যাচ্ছে।

উৎসবের ঋতু?

শারদোৎসব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খানিকটা ছোঁয়াচ অবশ্য লেগে থাকে, কিন্তু বাঙালি সমাজজীবনে শারদোৎসবের ব্যঞ্জনা হয়তো ধর্মীয় উন্মাদনাকে একটু পাশে সরিয়ে রেখেই। হয়তো কয়েকটা দিনের জন্য বাঙালি মন প্রাত্যহিকতার একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণের উপলক্ষ্য খোঁজে। প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গেও সম্ভবত ঈষৎ সম্পর্ক আছে এই উৎসব-অন্বেষণকারী মানসিকতার: বর্ষার প্রকোপ ক'মে আসে, আকাশের প্রগাঢ় নীলিমার শরীর বেয়ে শাদা-শাদা গাল-ফোলা মেঘেরা ঘুরে বেড়ায়, ধানক্ষেতের দিগন্তব্যাপী সবুজ ফসলের অত্যাসন্ন সম্ভাবনার বাণী ব'য়ে নিয়ে আসে। সাধারণ মানুষ কয়েকটা দিনের জন্য দুঃখ দুর্দশা-সমস্যা-নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের কথা ইচ্ছা ক'রে ভুলে থাকতে চায় শারদোৎ-সবের উপলক্ষ্যে।

কিন্তু ভুলে থাকতে চাইলেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় ভুলে থাকা যায় না। আজ থেকে আশি নব্বুই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ সেই বিবেকসিক্ত আর্দ্র বসের কবিতা লিখেছিলেন, 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশে ছেয়ে, /হেরো ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে'। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, গণ-আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে চেতনার মান ক্রমশ উর্ধ্বগামী, কিন্তু দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে দারিদ্র্যের পীড়ন এতটুকু কমেনি, শ্রেণীশোষণের পরিমাপ বরঞ্চ বর্ধমান, এবং তার কারণও স্পষ্ট। এখন আর কোনো দূরস্থিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ ঘটছে না। নিকষ স্বদেশী শাসককুল শোষণের কলাকৌশলে নিজেদের শাণিত থেকে শাণিত-তর ক'রে তুলেছেন, শোষণের প্রয়োজনে তাঁরা রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন প্রকরণকে সুচারু ব্যবহার করতে শিখেছেন; রাষ্ট্রক্ষমতা দেশের-জাতির সার্বিক বিকাশের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না, কী ক'রে সমাজের নিম্নবর্গীয়দের আরো পীড়ন পেষণ করা যেতে পারে সেই অতি-সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থগত উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার ঘটেছে, ঘ'টে চলেছে। ফলে জাতীয় সম্পদ্‌বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

গোটা দেশের সমাজপ্রবাহ থেকে পশ্চিম বঙ্গ বিচ্ছিন্ন নয়, অন্যত্র যা ঘটছে, মোটামুটিভাবে এখানেও তাই। তা ছাড়া, জাতীয় আর্থিক সংকটের দায়ভারের একটি বড়ো অংশ এই রাজ্যের ঘাড়ে চেপেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রীতি-নীতি তথা ইচ্ছা-খভিলাসের অভিব্যক্তিস্বরূপ পশ্চিম বঙ্গে শিল্পবিকাশ

রুদ্ধগতি, কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকারের সংখ্যা চক্রায়াত হারে বাড়ছে, সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার অপ্রতুলতাহেতু কৃষিক্ষেত্রেও যতটুকু উন্নতির সম্ভাবনা ছিল, তা বাধাপ্রাপ্ত। তার উপর চল্লিশ বছর ধ'রে ব'য়ে-বেড়ানো শরণার্থী সমস্যার বোঝা তো আছেই। গত দশ-এগারো বছরে বামপন্থী সরকার জনগণের আন্দোলনকে সংহততর ও তীব্রতর করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে, গ্রামাঞ্চলে দু'মুঠো বাড়তি সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রসারের মধ্যবর্তিতায় সাধারণ মানুষের আত্মপ্রত্যয়কে অনেকটা উঁচুতে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছে, কিন্তু বাস্তবকে তো অস্বীকার করা সম্ভব নয়, আমরা বিপন্ন, আমরা সংকটাপন্ন, আমাদের আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ নেই, যদি সমাজ পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য হয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য পরিবর্তন, তা হ'লে শ্রেণীচেতনা আমাদের সর্ব অবস্থাতেই অব্যাহত রাখতে হবে, সামাজিক মূল্যবোধে অবিচল থাকতে হবে, এটা ভোলা ঘোর পাপাচার হবে যে প্রথাসিদ্ধ উৎসবের ঋতুও কিন্তু সংগ্রামের ঋতু, যতদিন পর্যন্ত উৎসবের আনন্দকে সমাজের প্রতিটি কন্দরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন উৎসব অপূর্ণতার কলুষে সমাচ্ছন্ন।

যে-বিভ্রমের শিকার হওয়া আদৌ উচিত নয়, তা-ই কিন্তু ঘটে। একশো পঁচিশ বছর আগে মার্ক্স সোজা-সরল সত্য কথাটি উচ্চারণ ক'রে গিয়েছিলেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শাসককুলের চিন্তাভাবনারই সর্বমুহূর্তে জয়জয়াকার, উপর তলার মানুষ যে-আচারকলা চাপাতে চাইবেন, চাপে প'ড়ে সমাজের নিচের তলার মানুষকেও তা মেনে নিতে হয়। খানিকটা ভয়, খানিকটা হীনমন্যতা, খানিকটা হয়তো চিন্তাহীনতাও; চেতনার বিকাশে যদি জড়তা থাকে, সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশতই উপর-থেকে-চাপানো বিধি-নিষেধ সাংস্কৃতিক-সামাজিক নির্দেশ-অনুজ্ঞা-ইঙ্গিতের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়। পূজোয় চাই নতুন জুতো। চাই নতুন জামাকাপড়শাড়ি। চাই ঘুরে বেড়ানোর জাঁকজমক। চাই ব্যয়ের ফোয়ারা ছোটানো। চাই হৈ হৈ রৈ রৈ। অনুজ্ঞাগুলি আসে উপর তলা থেকে, খবরকাগজের বিজ্ঞাপনের মারফৎ তারা ব্যাপ্তি পায়। চোখ-ধাঁধানো বিজ্ঞাপন, মন-ভোলানো ভাষায়। যেন সংস্কৃতির অন্য-কোনো পরিভাষা নেই, শারদোৎসব মানেই গা-ভাসিয়ে দেওয়া, অমিতব্যয়িতা, ঠমক, পরস্পরকে দেখানো আমাদের কত বিত্ত আছে, সেই বিত্ত আমরা কেমন বে-পরোয়া খরচ করতে পারি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম ক'রে যে-মাতামাতি, তা উপলক্ষ্য তথা উপলক্ষ্যহীন খাতে বেপরোয়া ব্যয়ের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত।

এক দিকে সামাজিক-আর্থিক সংকট বাড়ছে, বছরের-পর-বছর ধ'রেই বাড়ছে, অন্য দিকে কিন্তু উৎসবপালনের অছিলায় এ-ধরনের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাও

বেড়ে চলেছে, মূল্যবোধ বিকৃত করে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা, আমাদের মতো হৃত-দরিদ্র-খিন্ন-জীর্ণ দেশে যা অশ্লীল ব্যয়চর্চার মাহাত্ম্যকীর্তন করে, সাময়িকতার নেশার ঘোরে সবাইকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা-গুলিকে আলাদা ক'রে গাল পেড়ে লাভ নেই, তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ-অনুযায়ী ভূমিকা পালন ক'রে যাবেই। কিন্তু এই অবস্থায় বামপন্থীরা কী করবেন? শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় এমন ধারা তো হবেই, যাদের হাতে টাকা আছে তা তারা যেন-তেন প্রকারে খরচ করবেই, আমরা আর তা কী ক'রে আটকাবো, এমন আলতো মন্তব্য ক'রে আমরা অবশ্য নিজেদের বিবেককে দায়মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে পারি। অথবা এ-ও বলতে পারি: আহা, উৎসবের কয়েকটা দিনে একটু-আধটু বেহিশাব তো হবেই, বাধা দিতে গেলে ভুল-বোঝাবুঝির আশঙ্কা।

মুশকিল হলো আমাদের সমাজব্যবস্থায় বেশির ভাগ মানুষ সামর্থ্যহীন, অথবা তাঁদের সামর্থ্য ক্রমশ ক্ষীয়মান, শারদোৎসবে, অথবা অন্য যে-কোনো উৎসবে, ছেলেমেয়েদের নতুন জুতো কিনে দিতে তাঁরা অপারগ, তাঁদের এমন উপার্জন নেই যে কিনবেন নতুন জামাকাপড়শাড়ি। অথচ সমাজের উপর-তলা-থেকে-চাপানো শ্রেণীতিত্তিক অনুশাসনের পীড়নে তাঁদের দীর্ণ হ'তে হয়। কী করবেন তাঁরা? ধার করবেন? সিঁদ কাটবেন, চুরি-জোচ্চুরি করবেন? না কি শ্রেণী-যুদ্ধের রহস্যকাহিনী কেউ-কেউ, সামাজিক কর্তব্যবশত, যত্নসহকারে শেখাবেন সন্তানদের, কী ক'রে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কারো-কারো ছেলেমেয়েরা শারদোৎসবে অঢেল জুতোজামাশাড়ি কেনার সুযোগ পায়, এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ, উৎসবের রাত্রি জুড়ে বাজি-পোড়ানোর হাউই-ওড়ানোর সুযোগ, কিন্তু অধিকাংশ সংসারে এ-সমস্ত সুযোগ সুদূরপরাহত, খিদের খাবার-লজ্জানিবারণের স্বল্পতম বস্ত্রের সংস্থানও সে সমস্ত সংসারে আপাতত মস্ত সমস্যা, গরিবের ঘোড়া-রোগ হ'তে নেই, ঘোড়ারোগে যাদের প্রাত্যহিক অভ্যস্ততা আপাতত তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া গরিবশ্রেণীর মানুষের অন্য-কোনো অবসর বিনোদনের সুযোগ নেই?

মানুষের চিন্তা-ভাবনা-মানসিকতাকে তো আলাদা-আলাদা কৌটোয় ভাগ ক'রে রাখা যায় না। এমন তো সম্ভব নয় উৎসবের কয়েকটা দিন আমরা আমাদের শ্রেণীচেতনাকে শিকেয় তুলে রাখবো, উৎসব-অনুষ্ঠানের শেষে ফিরে আসা নিজেদের বৃত্তে। চিন্তাসূত্রে একবার শ্লথতা প্রবেশ করলে তা আস্তে-আস্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করবেই। আসলে এটাও এক ধরনের ঔপনিবেশিক ঝোঁক। পয়সাওলা মানুষদের রুচির-রুচিহীনতার ছাপ পড়ে যে-মানুষগুলির পয়সা নেই তাদের সংসারকলার উপর: প্রতিরোধের প্রাচীর গড়তে যেন ভুলে গেছি আমরা, যে-মানুষগুলির কোনো সামর্থ্য নেই তাঁদের কথা এমনকি আমাদের

সাহিত্যেও তেমন একটা জায়গা পায় না। পাশাপাশি, যা আরো মারাত্মক, নিজেরাই আমরা চিন্তার স্বচ্ছতার ফাঁদে ক্রমশ ধরা পড়ি : এক সপ্তাহের জন্য শ্রেণীচেতনার ব্যবহার যদি মুলতুবি থাকে, কারণ শারদোৎসব চলছিল, পরের পর্যায়ে হয়তো এক মাসের জন্য তা মুলতুবি থাকবে, কারণ এক বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে সৌজন্যবশত একটু বেড়াতে যেতে হয়েছিল, যদিও সেই বড়োলোক বন্ধু কারখানার শ্রমিক পেটায়, কালোবাজারে মুনাফা লোটে, সস্তা টাকার মাতোয়ারায় মাঝে মধ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বাচালদের ভাষা শিখিয়েছেন, তাঁর শেখানো ভাষাতেই ফিরে যেতে হয় আমাদের। বিপ্লবী আদর্শ তো শৌখিন মজদুরি নয় যে কখনো-কখনো বিচ্যুতির গলিতে প্রবেশ ক'রে মজা লুটবো, দু'দিন বাদে খোঁয়াড়ি ভাঙলে নিজেদের গালে চড় কষাবো, ফের নেশায় মাতবো, কিছু সময় বাদে ফের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে অন্য-একটি কথাও বলা হয়। আমাদের নাকি গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হ'তে হবে, মিশ্র সমাজব্যবস্থার মধ্যে অধিষ্ঠান করছি আমরা, চেতনার মান কারো-কারো উঁচু কারো-কারো নিচু, বিভিন্ন বিচিত্র ঝোঁকের-প্রবণতার-মানসিকতার মানুষের সমাবেশ এই সমাজে, তাদের যদি প্রগতির স্বার্থে ব্যবহার করতে চাই, সবাইকে মিছিলে-আন্দোলনে জড়ো করতে চাই, তা হ'লে ধৈর্যশীল হ'তে হবে আমাদের, সহিষ্ণু হ'তে হবে, অনুকম্পায়ী হ'তে হবে; তাদের মধ্যে যদি কেউ-কেউ সামাজিক অস্বাস্থ্যে ভুগছে এই মুহূর্তে, তাদের ক্রিয়াকর্ম যদি ন্যক্কারজনকও হয়, ঘৃণায় মুখ-ঘোরানো অন্যায় হবে আমাদের পক্ষে, তাদের মধ্যে যে-ধরনের সামাজিক বিকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার জন্য তো ব্যক্তিগতভাবে তাদের দায়ী করা চলে না, দায়ী সমাজব্যবস্থা। সমাজব্যবস্থার বিকৃতি সমাজভুক্ত মানুষদেরও বিকারগ্রস্ত ক'রে তুলবে; এই মানুষদের কাছে সর্ব ঋতুতে পরিশুদ্ধতা-পবিত্রতার মন্ত্র উচ্চারণ করা নির্বুদ্ধিতা হবে, তারা বিরক্ত হয়ে আরো বেশি প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকবে। তার চেয়ে বরং তাদের একটু ক্ষমাঘেন্না করা ভালো, উৎসবে-ব্যসনে তাদের একটু গা ঘেঁষে থাকা, তাদের বিচ্যুতি-শৃঙ্খলাহীনতা ইত্যাদি, যদি তেমন মারাত্মক না হয়, তা হ'লে উপেক্ষা করা। সবাইকে নিয়ে যেহেতু আমাদের এগোতে হবে, ইতিহাসের নিয়মকে ধ্রুব প্রতিপন্ন করার সুমহান্ উদ্দেশ্যে, এর-ওর-তার একটু-আধটু স্খলন-পতন নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো, ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে গেলে কাদের নিয়ে বিপ্লব করবো আমরা?

তা-ই কি? যদি সবাইর রঙে রঙ মেশাতে হয় আমাদের, যখন-যেমন-তখন-তেমন ধর্ম বরণ ক'রে নিতে হয়, তা হ'লে আদর্শের সঙ্গে আদর্শহীনতার, সমাজ-চেতনার সঙ্গে সমাজবিরোধিতার, তফাৎ রইলো কোথায়? নীতি বিসর্জন দিয়ে তো নৈতিক সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। এক মণ দুধে আধ ফোঁটা চোনার

সমস্যা আমরা জানি, রসায়নের নিয়ম এড়ানো আমাদের সাধ্যের বাইরে। তা হ'লেও যাঁরা, বাস্তবতার দোহাই পেড়ে, একটু মানিয়ে নেওয়ার কথা বলতে আসবেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিনয় প্রতি-প্রশ্ন করা ছাড়া তো উপায় নেই: মানিয়ে নেওয়ার সংজ্ঞা যদি হয় আদর্শকে কেটে দু'টুকরো ক'রে গঙ্গায় ভাসানো, নিজের বিবেকের কাছে, সেই সঙ্গে সমাজবিবেকের কাছে, কী পরিচয় অবশিষ্ট থাকবে আমাদের ?

উৎসবের ঋতু, কিন্তু স্থূলে যেন ভুল না হয় আমাদের, উৎসবের ঋতুও আদর্শের ঋতু, সংগ্রামের ঋতু।

নিয়ম ভাঙার নিয়ম

সামাজিক মানুষ হিশেবে আমাদের নিয়ম-নীতি নিয়ে ভাবতে হয়। প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে যেমন আমরা ভাবি, সমাজের নিয়ম নিয়েও। কিছু-কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের নিহিত অন্বীক্ষা আমরা গণিতের সাহায্যে বুঝে উঠতে পারি। তবে সৃষ্টির অনেক রহস্য এখনো আমাদের বোধের পরিধির বাইরে। বৈজ্ঞানিক তথা গাণিতিকরা হাল ছেড়ে দেননি, যে-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে আমরা অবস্থান করছি তার সংগোপন সত্তাসত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ আবিষ্কারের জন্য অনবচ্ছিন্ন তাঁদের কল্পনা, মেধা ও কুশলতাকে তাঁরা নিযুক্ত করছেন, কখনো-কখনো তাঁরা দার্শনিকদের কাছে চিন্তার ব্যাপ্তি ভিক্ষা করছেন, কখনো এমনকি কবিকুলের কাছে পর্যন্ত। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, আসলে সকলেই নিয়ম খুঁজে বেড়াচ্ছেন, হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন আপাতঅসংগতির মধ্যে সংগতি। এটাই বোধ হয় মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। মানুষ সংগতির সুষমায় পৌঁছুতে চায়, আমরা যে যেখানে থাকি না কেন, আমাদের অন্বেষণ বস্তু তথা বস্তুহীনতার কারণ ও নিয়ম নিয়ে, আমরা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য খুঁজি, অণুর মধ্যে সংহতি খুঁজি, অবিচার পেরিয়ে পৌঁছুতে চাই ন্যায়ের জ্যোৎস্নাময় উপত্যকায়। এলোমেলো কবিতা থেকে যে-তৃপ্তি বা আনন্দ তা-ও কিন্তু তাই, সৃষ্টির নিয়মের কাছে পরম বাউণ্ডুলে কবিও ধরা দিচ্ছেন, তাঁর বিদ্রোহও তাঁকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির নিয়মে উত্তীর্ণ করছে, যে-মুহূর্তে তিনি কবিতা রচনা করছেন, নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়ছেন তিনি।

মানুষের ব্যাখ্যায় প্রকৃতির যে-যে ঘটনাবলীর রহস্য ধরা পড়তো না, ধর্মভীরুরা তা, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও, মেনে নিতেন নিয়তি হিশেবে। ভাগাভাগির সংসার যেন এটা, এক পাশে নিয়ম, অন্য দিকে নিয়তি। বৈজ্ঞানিকরা চাইছেন নিয়মের গণ্ডির মধ্যে আরো-অনেক আপাতরহস্যকে ঢুকিয়ে ফেলা, যাতে নিয়তির চৌহদ্দি আস্তে-আস্তে সংকুচিত হ'তে-হ'তে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়। প্রকৃতির কোনো রহস্যই আর অজ্ঞাত থাকবে না তখন, মানুষ বিধাতার সম-শক্তিসম্পন্ন ঠিক না হয়ে উঠলেও, তাঁর সমজ্ঞানী হ'তে সেই অবস্থায় আর কোনো বাধা থাকবে না। এটা অবশ্য, কেউ-কেউ বলবেন, মানুষের স্পর্ধা, যে-স্পর্ধার আস্ফালনে মানুষ বিধাতার অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতে আদৌ পিছুপা নয়।

বৈজ্ঞানিক বিতর্ক শেষ পর্যন্ত তাই দার্শনিক তথা ধর্মীয় বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই বিতর্কে নিজেদের আমরা কতটা যুক্ত করবো তা অনেক ক্ষেত্রে

ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। কিন্তু বিতর্ক ছাপিয়ে, বলা চলে গোটা বিতর্ক ঘিরে, যে-প্রবল অনুভূতি প্রকট, তা এই যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, মানুষ নিয়ম খুঁজে বেড়াচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বঘটিত প্রশ্নগুলিও এই নিয়মান্বেষণযজ্ঞের অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

যখন সাহস বাড়ে, প্রকৃতির নিয়ম ভাঙা যায় কিনা, প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তন ঘটানো যায় কিনা, প্রকৃতির অস্ত্র ব্যবহার ক'রেই প্রকৃতিকে বে-কায়দায় ফেলা যায় কিনা, তা নিয়েও তখন মানুষ ভাবিত হয়। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিভাব দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ থেকেই, আমরা যাকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বলি, তা ঘটেছে, ঘটছে। এই অভিযাত্রার সুফল-কুফল দুই নিয়েই তারপর আমরা, মানুষেরা, ফের চিন্তান্বিত হয়েছি, হচ্ছি। অহরহ দ্বন্দ্বে দীর্ণ হচ্ছি আমরা, নিয়ম ভেঙে, অথবা প্রকৃতির নিয়মের পরিবর্তন ঘটিয়ে, কতদূর আমরা যাবো, কোথায় বিশ্রাম নেবো, কিংবা আদৌ বিশ্রাম নেবো কিনা, কোথাও সংবরণ করবো কিনা নিজেদের অনুসন্ধিৎসাকে, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি নেই মানুষের।

তবে তার চেয়েও যা আরো ঢের বেশি জটিল প্রশ্ন, প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে চর্চার পাশাপাশি, সামাজিক নিয়ম মানুষের আর্ত অভিনিবেশ কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে, কিংবা আদৌ করে কিনা। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা যতটুকু জেনেছি, কোনো-কোনো মুহূর্তে সামাজিক নিয়মনীতির শৃঙ্খল ভার হয়ে চেপে বসেছে একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপর। সামাজিক নিয়মনীতি মানুষেরই রচনা, সংগতির সুষমায় পৌঁছুতে চায় ব'লেই মানুষ নিয়মের বুনুনি গাঁথে। কিন্তু ইতিহাস এগোয়, সমাজবিন্যাস পাল্টায়, যে-নিয়ম একদা ছিল আনন্দ, ঔচিত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিভূ, তা অত্যাচারের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। মানুষই তখন খেলা-ভাঙার খেলায় মাতে, সমাজের নিয়মগুলি খোল-নল্‌চে বদলে নেওয়ার জন্য নিজেদের ব্যূহগঠনের প্রতিভাকে প্রয়োগ করে, এক নিয়মের গ্রহ থেকে অন্য নিয়মের গ্রহে পৌঁছে যাই আমরা, এক সৌন্দর্যের প্রজ্ঞা থেকে অন্য এক সৌন্দর্যের প্রাঙ্গণে। আমরা নিয়ম ভাঙি নিয়মে ফিরবো ব'লেই। প্রকৃতির নিয়মাবলী সব সময় বুঝতে পারি না, বোঝার প্রয়াসে নিজেদের নিযুক্ত করি, অনেক সময় প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে সৃষ্টির গৌরবে প্রদীপ্ত হয়ে উঠি। সামাজিক নিয়মের ব্যাপারে আমরা আরো অনেক বেশি বেপরোয়া, আরো অনেক বেশি ঐশীশক্তিধারী। প্রকৃতির পাষাণ অমোঘত্বের মতো কোনো শক্তি এখানে আমাদের ব্যাহত করতে পারে না, সমাজ তো আমরাই সৃষ্টি করেছি, তার নিয়মাবলীও আমাদের চিন্তা-আচরণ-বিচরণের পরিস্রুত ফল। মানুষেরই তৈরি করা সমাজ, সেই সমাজকে সম্পূর্ণ ভাঙবার, তার আদল পুরোপুরি পাল্টে দেবার, স্বভাবতই যুগপৎ

ক্ষমতা ও অধিকার আমাদের আছে, সমাজের নিয়মগুলি, আমরা যদি একবার অঙ্গীকারবদ্ধ হই, অন্যরকম হয়ে যেতে তাই বাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর সময় আমাদের ছাত্রকুল সমাজের ও বিজ্ঞানের নিয়মনীতি জানবার-বোঝবার চেষ্টা করেন। হয়তো বা হঠাৎ প্রেরণা খুঁজে পান তাঁরা কোনো-কোনো বিশেষ নীতির গহনে প্রবেশ করার। অথবা কোনো নীতির অনৌচিত্য তাঁদের গভীর ক'রে ভাবায়, সেই নীতির পরিবর্তন ঘটাতে গেলে প্রতিভার-তিতিক্ষার কী-কী উপচার-উপকরণ প্রয়োজন, সেই অনুসন্ধানে নিজেদের ব্যাপৃত করেন। যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিতার্থতা এখানেই: যাঁরা নিয়ম নিয়ে চর্চা করতে চান, তাঁদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, যাঁরা নিয়ম ভাঙতে চান, উত্তীর্ণ হ'তে চান অপর কোনো অধরা সুষমায়, তাঁদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ আমরা জানি এরই পাশাপাশি আরো বেশ-কিছু নগ্ন সত্যের উপস্থিতি। সেই রূঢ় বাস্তবের প্রেক্ষিতে, হতচকিত আমরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামানবিক ভূমিকা নিয়ে আর আদৌ মাথা ঘামাই না, আমাদের অধিকাংশের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়কালীন শিক্ষা প্রাত্যহিকতার অভিশাপে বিশীর্ণ হয়ে আসে, আমরা মনে-মনে অঙ্ক কষি, হয় তো জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধার সুযোগ ক'রে দেবে, অন্যথা অন্তত আরো-কিছু সময় কর্মসংস্থান-হীনতার অভিশাপ থেকে আমাদের যুবক-যুবতীদের মুক্ত রাখবে। এই অবস্থায় প্রকৃতি-তথা সমাজ-পরিবর্তনের প্রস্তাব, মনে না হয়েই পারে না, বড়ো বেশি বাগাড়ম্বর।

অথচ আমরা এটাও জানি, আমাদের মতো হতদরিদ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা মাত্র কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়েদের জন্য ক'রে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, এবং এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে সামর্থ্যে টান পড়ছে, অন্যত্র কোথাও কর্তব্য-সম্পাদনায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এমন-এমন উক্তিও অনেকে করেছেন এবং ক'রে যাচ্ছেন, ভারতবর্ষের অন্তত অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিলে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো না, যে-টাকা বাঁচতো, তা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করলে নিরক্ষরতা দূর করতে অঢেল সাহায্য করতো। যাঁরা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন, তাঁরা স্বভাবজ্ঞানবিদ্বেষী নন। তাঁরাও হয়তো সামাজিক নিয়মনীতি পাল্টানোর স্বপ্ন দেখছেন, এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন দেশের মূক জনতার মুখে ভাষা ফোটাতে না পারলে সমাজবিপ্লব অসম্ভব, এবং বিপ্লব সংগঠিত না হ'লে গোটা দেশের আর্থিক-সামাজিক উন্নয়নে প্রবহমানতা সঞ্চার অবাস্তব প্রস্তাব। তাঁরা তাই আপাতত উচ্চশিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন, তাঁরা ভরসা রাখছেন প্রাথমিক শিক্ষার গ্রামগঞ্জব্যাপী প্রসার ঘটলে সামাজিক চেতনার মান দ্রুত ঊর্ধ্বগামী হবে, বিপ্লবের মুহূর্ত আরো-একটু কাছাকাছি আসবে তা হ'লে। উচ্চশিক্ষার খাতে যে-অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে

তাঁদের বিবেচনায় তা প্রগাঢ় অপচয়, এই অপচয়ের মাত্রা একটু কম হ'লে সামাজিক কাঠামো নতুন ক'রে গড়বার কাজটি আসলে দ্রুততর হতো। তাঁরা অবশ্য সেই সঙ্গে অন্য একটি মন্তব্যও যোগ করেন, আর কিছু হোক না-হোক, যদি নতুন-নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার হার কিছু কমতো, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একটি-দু'টি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কর্মসূচির প্রসার সীমাবদ্ধ থাকতো, উচ্চশিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বাড়তো, সমাজের সামগ্রিক উপকার হতো তা থেকে।

প্রতিপক্ষে যাঁরা, অন্য যুক্তি দাখিল করবেন তাঁরা। প্রাথমিক শিক্ষা যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া চাই, উচ্চশিক্ষাও তেমনি সমাজের একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা, তাঁদের ধারণা-অনুযায়ী, সমাজবিরোধিতার সমার্থক। আমাদের অভাবের সংসারে যতটুকু সম্পদ, তা তাই আনুপাতিক বিবেচনা অনুসরণ ক'রে খরচ করতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে পরবর্তী প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাক্রমকেও সমান মর্যাদা দিতে হবে।

অনুপাত তথা অগ্রাধিকারের যথাযোগ্যতা নির্ণয় বড়ো কঠিন সমস্যা, বহু বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তির সংঘাত এই প্রশ্নের সঙ্গে মাখামাখি ক'রে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-শুভানুধ্যায়ী, তাঁরা কেউই এই সংঘাত এড়িয়ে যেতে পারবেন না। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক লক্ষ্য যেখানে ভিন্ন, নিয়মকলাও সেখানে ভিন্ন হ'তে বাধ্য। কিন্তু উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার পারস্পরিক অবস্থান নিয়ে তর্ক থেকে ক্রমশ প্রতীয়মান হচ্ছে, সামাজিক লক্ষ্য এক হ'লেও নীতি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতা দেখা যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এই তর্ক আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, প্রতিদিন এই তর্কের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা, কেউই স্বস্তিতে নেই : বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে যাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, জীবনসংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁরাও পরস্পরবিরোধী নীতির তুলনাগত শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব থেকে সম্ভবত বিশ্লিষ্ট রাখতে পারবেন না নিজেদের, একটি বিশেষ নীতি অথবা সেই নীতির বিকল্প প্রয়োগ করতে গেলে যে-সমস্যা দেখা দেয়, তার ভুক্তভোগী হ'তে হবে তাঁদের। সুতরাং কিছু-কিছু বিভ্রান্তি সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

অন্য-একটি মস্ত সমস্যারও আমরা মুখোমুখি। যে-সমাজব্যবস্থার মধ্যে আছি, তার রীতি-নীতি নিয়মশৃঙ্খলা সম্ভবত আমাদের মধ্যে অনেকেরই পছন্দ হচ্ছে না, এই ব্যবস্থার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আমরা অহরহ ন্যায়হীনতা তথা সুষমাহীনতা আবিষ্কার করতে পারছি। আমাদের মনে গ্লানি, তিক্ততা, বিতৃষ্ণা। আমরা মনেপ্রাণে হয়তো বিপ্লবে বিশ্বাস করি, অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি ক্রান্তির মুহূর্তের জন্য। মুশকিল হচ্ছে সেই লগ্নের হয়তো এখনো বাকি আছে, ইতি-

হাসের যে-নিয়মে বিপ্লব ঘটে তার শর্তাবলীর হিশেব হয়তো এখনো পুরো-পুরি মিলছে না। আসলে সেই শর্তাবলীর দাবি মেটাতে গেলে, সন্দেহ হয়, উপস্থিত মুহূর্তে কিছু-কিছু সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন, সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে-স্কুলে-কলেজে, সরকারি-সদাগরি দপ্তরে, ব্যাংকে-ডাকঘরে, হাটে-বাজারে-কারখানায়-খেলার মাঠে-কবিতার মিছিলে পর্যন্ত। ন্যূনতম শৃঙ্খলাবোধ, ন্যূনতম দক্ষতা বাদ দিয়ে এমনকি বিপ্লবের প্রস্তুতিও অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য।

কী শিখবো কী শেখাবো আমরা তা হ'লে? বিদ্রোহ, অবিনয়, না কি দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ? মনে হয় শাদামাটা জিজ্ঞাসা, অথচ উত্তরটি, আমার সন্দেহ, তত সহজ-সরল নয়। নিয়ম ভাঙতে গেলেও নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়, কোনো নিয়ম ভাঙতে গেলে অন্য-কোনো নিয়ম জানতে হয়। এই দ্বন্দ্বের প্রহারে আমরা অনেকেই জর্জরিত হচ্ছি, উতলা হয়ে প্রশ্ন করছি পরস্পরকে, নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের সামাজিক স্বপ্নকে মেলাবার চেষ্টা করছি, কখনো-কখনো সফল হচ্ছি, কখনো-কখনো নৈরাশ্য ভর ক'রে আসছে।

অথচ এই সব-কিছু নিয়েই আমাদের সমাজ, যে-সমাজকে আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই, অথবা দুমড়ে-মুচড়ে নতুন ক'রে গড়তে চাই। ভালোবাসার, ভালো-লাগার একরকম নিয়ম, অবিন্যস্ত অন্যমনস্কতার সঙ্গে টিঁকে থাকার অন্য নিয়মাবলী, আবার ভেঙে-চুরে গড়ার হয়তো আলাদা নিয়ম। কিংবা ভাঙার নিয়ম নিয়েও অঢেল মতদ্বৈধতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার উপযোগিতা নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলার রেওয়াজ, আমি কিন্তু সেই পথ তাই আদৌ মাড়াবো না। যে-বন্ধুদের সম্মানে আজ এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান, তাঁদের তো এই ভরসা দেওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই যে তাঁদের ভবিষ্যৎ আশ্চর্য নিটোল-মসৃণ হবে। এক অস্থির সমাজব্যবস্থার মধ্যে আছি আমরা, সেই অস্থিরতার ভুক্তভোগী সমাজভুক্ত সবাই, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহির্গমন করলেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রইলেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পেলেন না, সবাই। আমি শুধু এই আশা লালন করবো, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে বেরিয়ে যাঁরা আজ সমাজের বেলাভূমিতে উপস্থিত হচ্ছেন তাঁরা যেন অন্তত এই আস্থাটুকু রাখেন, নিয়তি নয়, নিয়মই আমাদের জন্য পথ এঁকে দেয়, নিয়ম থেকে অন্য-এক বিকল্প নিয়মের বৃত্তে যদিও আমরা পৌঁছুই নিজেদের কৃতিত্বে, আমাদেরই কল্পনা, আমাদেরই আবেগ, আমাদেরই শৌর্য বিপ্লবকে হাজির করে আমাদের প্রকোষ্ঠে, এই বৃত্তপরিবর্তনের মধ্যেও কিন্তু এক নিয়ম নিহিত। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কখনো-কখনো, সামাজিক বিবেকের উৎকীর্ণ তাগিদে, নিয়মহীনতার প্রেরণা দিয়ে থাকে, কিন্তু নিয়ম না মানলে

নিয়মলঙ্ঘনেও সফলতা পরাহত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল থেকে এই যৎ-সামান্য জ্ঞানের কণিকাটি কুড়োতে পারাও, এই অস্থির লগ্নে, কম ভাগ্যের কথা না।

নাস্তিকতার বাইরে

মাননীয় বহিরাগতরা কলকাতার চেহারা দেখে আঁৎকে ওঠেন, কলকাতার চাকচিক্য নেই, রাস্তা-ঠাসা বস্তি-ঠাসা ফুটপাথ-ঠাসা গরিব রুগ্ন অপুষ্টিতে-ধুকতে-থাকা মলিনবেশ পুরুষনারীশিশুর ভিড়, কলকাতার দালানকোঠার হতজীর্ণ অবস্থা, ন্যূনতম নাগরিক ব্যবস্থাদির প্রকট অভাব। মাননীয় বহিরাগতরা দু'দিনের জন্য বেড়াতে কিংবা কার্যব্যপদেশে এসে পালাবার পথ পান না। তার পর তাঁরা স্ব-স্ব-স্থানে ফিরে গিয়ে কলকাতার দুরবস্থা নিয়ে প্রাজ্ঞ বই লেখেন। সেই সব বই সংবাদপত্রে পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা জুড়ে আলোচিত হয়। কেউ-কেউ কলকাতার হতচ্ছাড়া মানুষগুলির জন্য দুঃখে কেঁদে নদী হয়ে যান। অন্য কেউ-কেউ দ্রবীভূত হওয়াতে বিশ্বাস করেন না, কলকাতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লেই তাঁরা বিরক্তিতে কুঁচকে আসেন, ঐ মৃত নগরীর উপাখ্যান শুনে সময় নষ্ট করতে আদৌ রাজি নন তাঁরা।

তাঁরা অবশ্য একা নন, তাঁদের সঙ্গে আছেন এমন বেশ কয়েক শো বা হাজার গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁরা তাঁদের প্রথম জীবন কলকাতাতেই কাটিয়েছেন, এখানে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন, এখন নিজেদের প্রতিভা তথা ভাগ্যের জোরে আর্থিক সাচ্ছল্যের দিক থেকে অনেক উপরে উঠে গেছেন, থাকেন ভারতবর্ষের অন্যত্র বা বিদেশে, তাঁদের মসৃণ জীবনযাত্রার ফাঁকে-ফোঁকরে, কখনো-কখনো, কলকাতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠেন তাঁরা। তাঁরা তো কেমন উজ্জ্বল অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। কলকাতায় জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের উন্নতিতে কোনো বাধার উদ্রেক হয়নি। তাঁরা উদ্যম দেখিয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন, ফালতু রাজনীতি-ফাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি, কলকাতায় যে-মানুষগুলি প'ড়ে আছে, তারা যদি তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতো, তাঁদের পরামর্শে চলতো, কলকাতার হাল ফিরে যেত তা হ'লে। কিন্তু তা তো হবার নয়, এখন ঐ হতচ্ছাড়া কমিউনিস্টগুলি গেড়ে বসেছে কলকাতায়, তারা কলকাতা থেকে পুঁজি হটিয়ে দিচ্ছে, কলকাতার পরিকাঠামো গঠনের দিকে নজর দিচ্ছে না, তাই তো শহরের কোনো উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না, বুঝুন তো মশাই কাণ্ডটা, খোদ রাশিয়াতে ওরা কমিউনিজম থেকে স'রে আসছে, অথচ কতিপয় বাঙালি কলকাতায় আর পশ্চিম বাংলায় কতগুলি বস্তা-পচা ধ্যান-ধারণা নিয়ে ব'সে আছে, এদিকে তো আমাদের প্রাণান্ত, কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলায় দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তাদের প্রতি মাসে পঁচিশ-তিরিশ ডলার ক'রে পাঠাতে হয়. আর কত টানতে পারি আমরা।

এই উভয় গোষ্ঠীর মাননীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিতর্কে নেমে লাভ নেই। কী হবে এটা মনে করিয়ে দিয়ে, যেখানে কলকাতা করপোরেশনের বার্ষিক বাজেট একশো পঁচিশ-পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো, দিল্লি শহরের পিছনে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঢালছেন, আর সেই টাকা গোটা দেশের মানুষের উপর ট্যাক্সো চাপিয়ে জড়ো করা হচ্ছে। কী লাভ এটাই বা মনে করিয়ে, দিল্লি এবং দিল্লির সংলগ্ন অঞ্চলে বসতি-পেতে-বসা শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন খাতে যে-বিশাল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে, গড়ে তার এক-দশমাংশও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কলকাতা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেড় কোটি শরণার্থীদের জন্য খরচ করা হয়নি। কী লাভ এটাই বা মনে করিয়ে দিয়ে, কেন্দ্রীয় বাজেটের আশি হাজার কোটি টাকার একটি মস্ত বড়ো অংশ দিল্লিকে কেন্দ্র ক'রে ব্যয়িত হয়, সেই ব্যয়ের বৈভবে দিল্লি গরীয়ান হয়ে ওঠে।

বোম্বাই শহর কলকাতার তুলনায় অবশ্যই অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান, বোম্বাইয়ের বস্তির-পর-বস্তির জরাজীর্ণতা কলকাতার চেয়ে কোনো অংশে কম না হ'লেও এটা তো অস্বীকার করা যাবে না ঐ শহরে যত টাকা, কলকাতায় তার এক শতাংশও নেই। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে গোটা দেশ জুড়ে শিল্পে-বাণিজ্যে যত বিনিয়োগ ঘটেছে, তার মস্ত অংশ বোম্বাই শহরকে ঘিরে। এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, সিন্‌থেটিক বস্ত্রশিল্প, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভর ক'রে নিত্য-নতুন যত শিল্প দেশে গড়ে উঠেছে, অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ তো বোম্বাইয়ের আশেপাশে। শিল্প যত বেড়েছে, বাণিজ্যেরও তত প্রসার ঘটেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি উজাড় ক'রে টাকা ঢেলেছে। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছলতা যত বেড়েছে, রাজ্য সরকার ও বোম্বাই করপোরেশনের আর্থিক সংগতিও তত বর্ধমান হয়েছে। যে-যে পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে, তাদের উপর ঢালাও হারে কর বসাতে পেরেছে রাজ্য সরকার, সংগৃহীত সেই রাজস্ব থেকে অনেকটাই নাগরিক পরিকাঠামো প্রসারের জন্য খরচ করা সম্ভব হয়েছে। এখানেও এটা মনে করিয়ে দিয়ে বিশেষ লাভ নেই যে মহারাষ্ট্রে যে-পরিমাণ শিল্প লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে গত চল্লিশ বছর ধ'রে, তার দশ ভাগের এক ভাগও পশ্চিম বাংলায় আসেনি, যে-পরিমাণ বিনিয়োগ কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা ব্যাংকগুলির তরফ থেকে করা হয়েছে, তার দশ ভাগের এক ভাগও পশ্চিম বাংলার জন্য বরাদ্দ হয়নি। মহারাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে বিক্রয় করের সংগ্রহ বিপুল বাড়ানোর সুযোগ পশ্চিম বাংলার ছিল না, কারণ চা ও পাটজাত দ্রব্য যা-যা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাদের উপর বিক্রয় কর ধার্য করার অধিকার রাজ্য সরকারের নেই, আর কয়লা ও লোহার উপর করও সর্বোচ্চ মাত্র শতকরা চার ভাগ হারে বসানো যেতে পারে।

এটা যোগ করতে যাওয়াও হয়তো বিসদৃশ হবে যে কলকাতা তার দ্বার শ্রমজীবী মানুষের জন্য সর্বদা অবিরত রেখেছে, বছরের-পর-বছর ধ'রে কাজের খোঁজে তাই লক্ষ-লক্ষ মানুষ কলকাতায় জড়ো হয়েছেন। এখনো জড়ো হচ্ছেন, কলকাতাবাসীরা তাঁদের সামর্থ্য সমানভাবে ভাগ ক'রে নিচ্ছেন আগন্তুকদের সঙ্গে। অন্য পক্ষে, বেশ কয়েক দশক জুড়েই বোম্বাই শহরে নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে বাইরে থেকে লোক আসা ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। কমিয়ে আনা হয়েছেও।

এ ধরনের তুলনামূলক বিচার খুব-একটা বিশদ ক'রে করতে যাওয়ার তেমন সার্থকতা নেই। কারণ শেষ পর্যন্ত যে-সারসত্য কথাটিতে পৌঁছুতে হয়, পশ্চিম বাংলা ও কলকাতা ধুঁকছে কারণ আমরা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে পারিনি। যে-শ্রেণীব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান করছে, তার সংস্থানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলার আদর্শ, কলকাতাবাসীর ধ্যানধারণা ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দেবে তা অলীক প্রস্তাব। একটি বিশেষ জীবনদর্শন, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন ক'রে আছে সংগ্রামশীল পশ্চিম বাংলার মানুষ, তাঁদের মাশুল দিতে হচ্ছে এই ভাবাপ্লুতার জন্য। যতদিন পর্যন্ত এক মস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক উপপ্লবের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষ অন্যতর এক শ্রেণীগত ক্ষমতাবিন্যাসে না-পৌঁছুচ্ছে, ততদিন কলকাতাকে দেখে নাক সিঁটকোবেন বহিরাগত অতিথিরা, প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙালিরা, যাঁরা প্রবাসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা কলকাতার হাল নিয়ে বিলাপ ক'রে যাবেন, এবং করুণায় বিগলিত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত আত্মীয়স্বজনদের জন্য মাসে-মাসে পঁচিশ-তিরিশ ডলার ডাকযোগে পাঠাতে থাকবেন।

কলকাতা যে তা হ'লেও টিঁকে আছে, এবং আশা করা যায় টিঁকে থাকবে, তা কলকাতার মানুষগুলির জন্য। এই মানুষগুলি জানেন, যতদিন রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত পট পরিবর্তিত না হচ্ছে, ততদিন আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখবার কোনো আশা নেই তাঁদের, তাঁদের শহর এমনধারা খিন্নতার মধ্যেই দিনাতিপাত করবে। রাস্তায় খানাখন্দ থাকবে, এখানে বোঁজানো হবে তো ওখানে হাঁ হবে। রাস্তায়-বস্তিতে আকণ্ঠ ভিড়, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থায় সংকট। বিদ্যুৎ সরবরাহ কখনো একটু ভালো-কখনো ফের অনিশ্চিত। কলকাতায় আবর্জনা জমবে, কলকাতায় ভিখিরির সংখ্যা কমবে না। কিন্তু এরই মধ্যে কলকাতা টিঁকে থাকবে, কারণ কলকাতাবাসীর সবচেয়ে বড়ো পুঁজি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। এই সহনশীলতার সহস্র প্রকাশ: আমরা কেউই তেমন ভালো-ভাবে নেই, কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের পরস্পরের জন্য জায়গা ক'রে দিতে হবে, ট্রেনে আমি একটু স'রে বসবো যাতে আমার পড়শীও বসতে পারেন, বাসের ভিড়ে আমি একটু এগিয়ে দাঁড়াবো যাতে আরো-কয়েকজন উঠতে পারেন। কোনো-

একটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে যে-যে কারখানাগুলি এখনো চালু আছে তাদের শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে ছাঁটাই-হওয়া কমরেডদের কিছুটা সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন, কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে আমি-আপনি সবাই দৃষ্টি রাখবো যাতে বণ্টনব্যবস্থায় কোনো ভেজাল ঢুকতে না পারে। আমরা একত্র হয়ে মিছিল করবো, আমাদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ পরস্পরকে আস্থা জোগাবে। আমরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন করবো, যে-আন্দোলনের ফলে যে-সামান্য বাড়তি-কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে তা সমানভাবে ভাগ ক'রে নেবো। আমরা নিরানন্দের মধ্যে আনন্দের অনুসন্ধান করবো, এক সঙ্গে গান গেয়ে, লোকশিল্পের চর্চায় উৎসাহ দান ক'রে, পরস্পরকে কবিতা-আবৃত্তি শুনিয়ে। খানাখন্দ-আকীর্ণ কলকাতার রাস্তা, যানজটের ভিড়ে পিষ্ট কলকাতার রাস্তা, হঠাৎ যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তা হ'লে আহত-দুর্গতদের সাহায্যে শুশ্রূষায় ঝাঁপিয়ে পড়বো আশে-পাশে যারা ছিলাম তারা, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

যতদিন কলকাতার মানুষ এই সামাজিক আদর্শে স্থিত থাকছেন, আমাদের সত্যিই ভয় নেই। অর্থাভাব-পরিকাঠামোর অভাব বহিরাগতদের আবির্ভাব হয়তো একটু ব্যাহত করবে, কিন্তু আমাদের কিছু যায়-আসবে না তাতে, পরস্পরের উপর নির্ভর ক'রে আমরা টিঁকে থাকবো এবং স্বপ্ন দেখবো আমরা অধমর্ণদের দল একদিন ভারতবর্ষে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছি, আমাদেরও জাগতিক হাল ফিরবে তখন থেকে। আপাতহতাশার মধ্যেও আশাতে বুক বাঁধবো তাই সবাই, এই আশা-ক'রে-থাকা তো আমাদের আদর্শের অঙ্গ।

কিন্তু, এরই মধ্যে, অন্যরকম একটি আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করতে হয়, পূর্ব-পশ্চাৎ বিবেচনা বাদ দিয়ে তো আদর্শের অধ্যবসায় একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায়। যতদিন আমরা পরস্পরকে আগলে আছি, টিঁকে থাকবো আমরা, সমস্ত বাধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এগিয়ে যাবো আমরা। একমাত্র বিপদ দেখা দিতে পারে যদি কখনো নাস্তিকতা প্রবেশ করে আমাদের মধ্যে, আমরা পরস্পরকে সাহায্যের কথা ভুলে যাই, অভাবের সংসারে একমাত্র নিজেদেরটা নিয়ে ব্যাপৃত হ'তে শুরু করি আমরা, পড়শীদের সমস্যার কথা তুচ্ছ জ্ঞান করি। নাস্তিকতা, যে-নাস্তিকতার পরিণামে আমার দপ্তরে আপনি কোনো অনুসন্ধানের জন্য এলে রূঢ়াচরণ করি আমি, আপনার দপ্তরে আমি অনুরূপ কারণে গেলে সমান হৃদয়হীন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা হয়, যে-নাস্তিকতার শিকার হয়ে কখনো-কখনো হঠাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছুই, যেহেতু এই সমাজব্যবস্থা থেকে আমি অতি-সামান্যই পাচ্ছি, সমাজ থেকে আমি হাত পেতে গ্রহণ করবোই, কিন্তু আমরা যা দেয়, তা দিতে অস্বীকার করবো। অভাবের সংসার আমাদের কলকাতা-পশ্চিম

বাংলা, এই সংসারে সব-কিছু ভাগ ক'রে নিতে হয়, অথচ এই অভাবের সংসারে আমার যতটুকু বরণীয় সেই কর্তব্য থেকে যদি আমি বিরত থাকি, অথবা আমার যে-পরিমাণ ন্যায্য দাবি তার চেয়ে বেশি হাতে পাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করি, চিড় ধরবে তা হ'লে। কলকাতাকে, পশ্চিম বাংলাকে সত্যিই আর বাঁচানো যাবে না তা হ'লে।

যদি আমরা নিজেরা নাস্তিক না হই, কলকাতা বাঁচবে, স্বভাবনিন্দুকরা যে-যা-বলার বলুক না কেন।

दुई

শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যাসাগর?

বিনয় ঘোষ মশাইয়ের জীবদ্দশায় তাঁর কাছে একটি বিশেষ প্রশ্ন রাখতে গিয়ে বার-বার কুণ্ঠাগত হয়েছি। এ সব অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা মানেই তো তর্কে জড়িয়ে পড়া। যে-মানুষকে শ্রদ্ধা করি, যাঁর আদর্শনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আমার মতো আরো অগণিত পাঠককে মুগ্ধতায় আবিষ্ট রেখেছে, কী হবে তাঁর সঙ্গে উট্‌কো তর্ক জুড়ে, বিশেষ ক'রে যে-তর্কের বিষয় হবে বিদ্যাসাগরের সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্যায়ন নিয়ে? বিদ্যাসাগরের জীবনাবসানের একশো বছর ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তাঁর সামগ্রিক কর্মকীর্তির সানুকম্প অথচ প্রগাঢ় বাস্তবতা-মণ্ডিত বিশ্লেষণে আমাদের বাঙালি সমাজে বিনয় ঘোষ মশাইয়ের কাছাকাছি আসতে পারেন এমন-একজনও তো নেই। আমার অভিভূত শ্রদ্ধা আমাকে নীরব ক'রে রেখেছে।

অথচ প্রশ্নটি অসার নয়। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের একজন আদর্শ পুরুষ এবং কবি মাইকেলের ভাষায় 'প্রথম আধুনিক মানুষ'। সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিক থেকে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র যেমন দুর্ভেদ্য, সামাজিক কর্ম-জীবনের লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতার দিক থেকেও তেমনি তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু যেহেতু তিনি সকল মানুষের মত সামাজিক শ্রেণীবদ্ধ মানুষ···, তাই মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, চিন্তার অসঙ্গতি এমনকি প্রত্যক্ষ সংগ্রামবিমুখতা (যেমন তাঁর যৌবনোত্তর জীবনে) তাঁর জীবনের দীর্ঘ অপরাহ্ণকাল ব্যর্থতা ও আত্মপরাজয়ের গ্লানিতে বিষণ্ণ করে তুলেছে।" এখানে অবশ্য বিনয় ঘোষের বক্তব্য ঈষৎ সন্ধাভাষায় আচ্ছন্ন, তিনি কি বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত, না কি সেই সঙ্গে অভিযোগও তুলছেন? অভিযোগ না হ'লেও অন্তত একটি অভিমানের তরঙ্গ যেন এই বাক্যবন্ধনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে: কেন তাঁর নায়ক, যাঁর প্রতি বিনয় ঘোষের শ্রদ্ধার সীমা নেই, নির্গুণ ব্রহ্ম হলেন না, কেন তিনি পুরোপুরি শ্রেণীত্যাগী হয়ে ইতিহাসের ধারাকে চমক লাগিয়ে দিলেন না?

বিনয় ঘোষ তাঁর ক্ষোভের উৎস হিশেবে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বিধবাবিবাহের প্রবর্তন করেছেন বিদ্যাসাগর, এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক নানা প্রতিবন্ধন তুচ্ছ ক'রে তিনি আন্দোলনে রত থেকেছেন, কিন্তু, বিনয় ঘোষের আক্ষেপ, বিবাহ নথীকরণ আইন পাশ করিয়ে একবিবাহ রাষ্ট্রীয় বাধ্যতার আওতায় আনবার জন্য তেমন উৎসাহ দেখাননি। বাল্যবিবাহ

প্রথার ক্ষেত্রেও, তিনি প্রথার বিরুদ্ধাচরণে সোচ্চার হয়েছেন, সহবাসের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তা হ'লেও সহবাস-সম্মতি আইনের সপক্ষে তাঁর সমর্থন পাওয়া যায়নি, বরঞ্চ প্রকারান্তরে যেন এটা বলবারই তিনি চেষ্টা করেছেন, আলাদা আইনের প্রয়োজন নেই, সহবাসের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে হিন্দু আচারে যে-নির্দেশ আছে, তা পালনের ব্যবস্থা নিলেই সামাজিক উপকার হবে।

বিদ্যাসাগরের আরো একটি-দু'টি আচরণিক আপাতঅসংগতির দিকে বিনয় ঘোষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আবিষ্কার করেছেন শ্রেণীবদ্ধতার প্রকোপ। ১৮৫৯ সালে ছোটোলাট গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন দরিদ্রতর শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁকে অভিমত ব্যক্ত করতে বললেন, বিদ্যাসাগর সরাসরি লিখে জানালেন, তাঁর সায় নেই, জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারপ্রচেষ্টা তৎকালীন অবস্থায় পণ্ডশ্রম, 'উচ্চতর' শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা তাঁর বিবেচনায় শ্রেয়তর হবে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে দ্রুততা আনিবার জন্য নর্মাল বিদ্যালয়ের ধাঁচে যখন শিক্ষিকা-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব এলো, বিদ্যাসাগর তাতেও আপত্তি জানালেন। সংস্কৃত কলেজ ব্রাহ্মণ পেরিয়ে কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রদের পর্যন্ত দ্বারমুক্ত হলো, কিন্তু অন্যতর শ্রেণীভুক্তরাও যাতে প্রবেশাধিকার পান, সে-ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে তিনি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলেন না। শ্রেণীদ্বিধাগ্রস্ত বিদ্যাসাগর কিছু দূর এগিয়েই যেন নিজেকে গুটিয়ে আনলেন, হয় রণক্লান্ত, নয় বিশ্বাসের মূলেই সম্ভবত কোনো স্ববিরোধিতা।

কিন্তু কোণাঘুপ্‌চিতে কী ঘটলো তা দিয়ে তো আমরা কোনো জ্যোতির্মণ্ডলকে বিচার করি না। তাঁর আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ একটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন: 'কালিক'। যা বিশেষ সময়ের প্রাসঙ্গিকতায় বিশিষ্ট, তা-ই কালিক। সময়বিশ্লেষণ এড়িয়ে শ্রেণীবিশ্লেষণ অবাস্তব, কালবদ্ধতার দায় শ্রেণীবদ্ধতার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে কিনা সেই প্রশ্ন কোনো অবস্থাতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিদেশীদের পদানত দেশ, সমাজ মধ্যযুগের অন্ধকারে সমাসীন; ধর্মপ্রজ্ঞানীতি বহুবিধ তান্ত্রিক আচারে সমাচ্ছন্ন। ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে একটি মানুষ নিজেকে শিক্ষিত পর্যায়ভুক্ত করেছেন। বৃত্তি কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের। সীমিত আকাশ, সুসংকীর্ণ দিগ্‌বলয়। অথচ এই মানুষটি সহস্রবাহু হয়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'মুগ্ধবোধ'ওলা বৈয়াকরণদের কলা দেখিয়ে 'ব্যাকরণকৌমুদী' রচনা করেছেন, 'বর্ণপরিচয়'-'বোধোদয়'-'কথামালা'র মধ্যবর্তিতায় শিক্ষার যুগোপযোগী উপক্রমণিকার আদর্শ স্থাপন করেছেন, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের লৌহনিগড় থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে 'শকুন্তলা'-'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র উদাহরণ রেখেছেন, পাত্রে-অপাত্রে উপার্জনের অর্থ ঢেলেছেন,

সমস্ত সংস্কার গোঁড়ামির বাইরে গিয়ে মাইকেল মধুসূদনের মতো স্বভাবউচ্ছৃঙ্খল-অসংযমী-মদ্যপ মানুষকে সখা হিশেবে বরণ ক'রে নিয়েছেন, অন্যের কাছে ধার ক'রে বছরের-পর-বছর ধ'রে তাঁকে সংসারনির্বাহের টাকা পাঠিয়ে গেছেন একমাত্র যেহেতু তাঁর মধ্যে এক উদ্দীপ্ত প্রতিভা প্রথম নজরেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন, সংস্কৃত কলেজের গোঁড়া পণ্ডিতদের ভ্রূকুটিগঞ্জনা অবহেলা ক'রে শিক্ষাক্রমসংস্কারে নিজেকে নিয়োগ করেছেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে নানা কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়েছেন, সমকালীন সামাজিক নিয়মকল্পার সমস্ত অনুশাসন উপেক্ষা ক'রে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই একটিমাত্র নিয়ম-ভাঙা কাণ্ড ঘটিয়ে সমাজকে হয়তো ধাক্কা মেরে দু'শো বছর এগিয়ে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণদের বড়াইকে ভেংচিয়েছেন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অক্লান্ত লেখনী ও বাগ্‌শক্তি চালনা করেছেন, শেষ পর্যন্ত নিজের হিন্দুবিশ্বাসে অবিচল থেকেও অথচ ব্রাহ্মানুরাগীদের কাছে টেনে এনেছেন, আজীবন সরকারি চাকরি ক'রেও কখনো ইংরেজদের মোসাহেবি করেননি, বাঙালিদের স্থাণুস্থবির সমাজে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি অনুপ্রবেশের প্রয়াসে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এখানে কিংবা ওখানে, তাঁর আচরণ বা বিচারে অসংগতি কিংবা বিচ্যুতির সাক্ষ্য পাচ্ছি ব'লে আমাদের মনে যদি সন্দেহ জাগেও বা, নিজেদেরই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা উচিত হবে, ধীরে, রজনী ধীরে। কাঠামোটা আমূল না পাল্টাতে পারলে গতি নেই, কিন্তু স্রেফ ইচ্ছার হাওয়ায় তো কাঠামো ভেঙে পড়বে না। যদি হুটহাট এমন-কিছু করার চেষ্টা হয় যাতে উল্টো পরিণাম ঘটবে, পুরোনো কাঠামো জগদ্দল পাথরের মতো আরো চেপে বসবে, তা হ'লে কে বহন করবেন সেই অবিমৃষ্যকারিতার দায়ভার ?

এখানেই শ্রেণীবদ্ধতা-কালবদ্ধতার দ্বান্দ্বিক প্রসঙ্গ এসে পড়ে: বিদেশী শাসককুল, তাঁদের সাহায্য নিয়ে বিবাহপ্রথার মতো একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ ক'রে, সেই আইনের চোখরাঙানির সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে গেলে শুভর থেকে অশুভর সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পেত কিনা, সেটা সে-সময়ে কে বলতে পারতেন ? সহবাস নিয়ম কী হবে তা আইন ক'রে আমাদের ব'লে দেবে যবন শাসকরা, কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে তখন ? তার চেয়ে যদি ঘুরিয়ে এটা বলা হয়, যে-প্রস্তাব রাখা হচ্ছে তা আমাদের চিরাচরিত ধর্মানুগ, তা হ'লে সাপও তো মরবে লাঠিও তো ভাঙবে না। যেখানে ধর্মের অনুশাসনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মানুষ, সেখানে সেই ধর্মেরই বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সুতীব্র সংগ্রাম ঘোষণার মধ্যে হয়তো উত্তরসূরীর বেপরোয়া সাহস থাকতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণতার তেমন স্বাক্ষর নিশ্চয়ই থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ আরো কয়েক যুগ বাদে অবশ্য কাব্যি ক'রে উপদেশ বিতরণ করেছিলেন: 'ওরে নূতন যুগের ভোরে দিস্‌নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার ক'রে'। কিন্তু যা মনে হয়

অনেক ক্ষেত্রেই তো তা নয়, সময়বিচার বৃথা না-ও হ'তে পারে, কোনো-কোনো আপন্ন অবস্থায়, সময়বিচার বিবেকবান সমাজসংস্কারকের অপরিহার্য কর্তব্য। বিশেষ ক'রে সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরিণাম হিশেবে কিছু-কিছু অতি-আবশ্যক সমাজসংস্কার অর্গলবদ্ধ হ'তে বাধ্য হলো, কোন্ বিবেচকের পক্ষে তা ভুলে থাকা সম্ভব? শ্রেণীবদ্ধতার অভিযোগ এ-সমস্ত ক্ষেত্রে তাই পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক।

সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধানের বাস্তবতা মেনে নেওয়া কি শ্রেণীদৃষ্টিসঞ্জাত দৌর্বল্য? অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ কেটে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, অনেক অভিজ্ঞতার ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে। কোন্‌টা বাস্তবসম্মত, কোন্‌টা করতে গেলে ভীষণরকম জল ঘোলা হবে, যা থেকে আখেরে নীট লাভ নেই, জীবনের অপরাহ্নকালে হয়তো খুব ভালো বুঝতে শিখেছিলেন তিনি। কালজ্ঞানে সম্পৃক্ত কাণ্ডজ্ঞান; তাঁর চরিত্রে অনেক মসী-লিপনের চেষ্টা হয়েছে বছরের-পর-বছর ধ'রে, সুতরাং ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মতো পুরুষ তিনি ছিলেন না কোনোদিনই, বিনয় ঘোষ মশাইও তা বলেননি। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সতর্কতাবোধ শ্রেণী-দ্বিধার পরিচয় বহন করছে, তা-ও বোধ হয় সমান অসার অনুযোগ। গণ-শিক্ষার প্রসারে অবশ্যই তিনি উৎসাহ দেখাননি, আপাতত লেখাপড়ার ব্যাপারটা উপরতলার মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক এই মত অকপটে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যদি তাঁর বাস্তব দৃষ্টি প্রয়োগ ক'রে বুঝে নিয়েছিলেন বিদেশী শাসকরা শিক্ষার খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্কের ঊর্ধ্বে অর্থবরাদ্দ করতে আদৌ সম্মত হবেন না, উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে খরচ করলে কোনো স্তরেই তেমন লাভ হবে না, তার চেয়ে যদি ধাপে-ধাপে এগোনো যায়, অপেক্ষাকৃত সচ্ছলদের মধ্যে শিক্ষাকে সর্বাগ্রে প্রগাঢ় পরিব্যাপ্ত ক'রে দেওয়ার ফলে সেই শ্রেণী থেকেই প্রচুর উৎসাহী ব্যক্তি বেরিয়ে আসবেন যাঁরা পরবর্তী অধ্যায়ে সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারে উদ্যোগ নেবেন, তাতেই সামগ্রিক সামাজিক প্রগতি, তা হ'লে তাঁকে দুয়ো দেওয়া ঘোর অন্যায় হবে। যা বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলা হলো, তা একটি বিশেষ মানসিকতাসঞ্জাত, যার সঙ্গে জড়িত বিশেষ দৃষ্টিকোণগত বাস্তবতা-বোধ। অন্য অনেকের কাছে এই যুক্তি গ্রহণীয় না-ও হ'তে পারে, একশো বছরের ব্যবধানে মানসিকতার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। কিন্তু কাল-বদ্ধতাকে শ্রেণীবদ্ধতার তক্‌মাযুক্ত করবো কোন্ বিচারে?

কট্টর বিপ্লবীরা লাঠি মেরে আমার মাথা চৌচির ক'রে দেবেন, কিন্তু জনশিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁদের ঝুলি থেকেই আমি একটি যুক্তি পেড়ে ব্যবহার করতে পারি। জনসমুদ্রে জোয়ার না এলে বিপ্লবের প্রসঙ্গ

অবান্তর, কিন্তু বিপ্লবী সংহিতাতেই লেখা আছে প্রথম থেকেই গণ-আন্দোলনের মহড়া নয়, তার জন্য সংযমী প্রস্তুতি প্রয়োজন, গোপনে ব্যূহরচনা প্রয়োজন। আঁটঘাট বেঁধে নামতে হয় যে-কোনো বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে, জনশিক্ষার ক্ষেত্রেও নয় কেন ?

শ্রেণীকে অথবা যুগকে অতিক্রম ক'রে যেতে পেরেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মহাপুরুষের সংখ্যা, না মেনে উপায় কী, খুবই কম। বিদ্যাসাগর এই মুষ্টিমেয়দের তালিকাভুক্ত কিনা, সেই বিতর্ক হয়তো অনেক দূর গড়াবে। তাঁর জীবনের গোটা দুই ঘটনার নিরিখে আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌছবো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্নিগ্ধ-সিক্ত জমিদারশ্রেণী মহা ঢক্কানিনাদ সহকারে তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, ভারত সভা—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন—স্থাপনমুহূর্তে অনেক চেষ্টা করেছিলেন প্রথম সভাপতি হিশেবে বৃত হ'তে তাঁকে রাজি করানোয়, তাঁরা চাইছিলেন কিছু-কিছু বিদ্বজ্জনের আড়ালে বিরাজ করতে, যাতে সংস্থাটির আসল উদ্দেশ্য, জমিদারশ্রেণীর অধিকতর স্বার্থবর্ধন, চট ক'রে বাইরে উদ্ঘাটিত না হয়। ভূম্যধিকারী মহোদয়গণ তাঁর স্নেহবৎসল অনেককে বিদ্যাসাগরের কাছে দূত হিশেবে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে সম্মত করাতে পারেননি। ঢাকঢোল পিটিয়ে তাঁর অস্বীকৃতির আসল কারণ ঘোষণা করতে যাননি তিনি, কিন্তু যাঁরা পরস্ব শোষণ করেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হ'তে তিনি যে আড়ষ্টতা-বোধ করছিলেন, আমাদের পক্ষে তা-ই শ্লাঘার বিষয়। তাঁর শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির অপর একটি অপরোক্ষ প্রমাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। বর্ধমানের মহারাজা বীরসিংহ গ্রাম ও তার সংলগ্ন অঞ্চল বিদ্যাসাগরকে তালুক হিশেবে উপঢৌকন দিতে চেয়েছিলেন। সেই উপঢৌকন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বিহারীলাল সরকারের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, বিদ্যাসাগর মহা-রাজাকে বলেছিলেন, 'যখন আমার এমন অবস্থা হবে যে সমস্ত প্রজার খাজনা আমি নিজে দিতে পারবো, তখন আপনার তালুক গ্রহণ করবো'।

কাকে বলবো শ্রেণীবন্ধনমুক্তি, কাকে বলবো শ্রেণীবদ্ধতা ? বিনয় ঘোষ মশাইয়ের জীবদ্দশায় তাঁর কাছে প্রশ্নটি রাখিনি ব'লে অনুশোচনা হচ্ছে এখন।

সাত কোটি-তিরিশ কোটির ইতিকথা

যে-কোনো সংস্করণ 'আনন্দমঠ' পেড়ে দেখুন, ভবানন্দ স্বামী মাতৃবন্দনা করছেন, 'বন্দে মাতরম্', অথচ যে-জননীর বন্দনা করছেন, তিনি বঙ্গজননী। 'সপ্তকোটী-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে, / দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত খর করবালে, / অবলা কেন মা এত বলে।' বঙ্কিমচন্দ্রের হিশেবে ভুল ছিল না, সরকারি চাকুরে ছিলেন তিনি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। গোটা দেশে উনবিংশ দশকের অষ্টম-নবম শতকে বঙ্গভাষীদের সংখ্যা যে আনুমানিক সাত কোটি, 'বন্দেমাতরম্' সংগীত রচনার মুহূর্তে তিনি সে-বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' দেশমাতার বন্দনা, কিন্তু সেই দেশ বঙ্গদেশ।

সেই দেশ বঙ্গদেশ, কদাপি ভারতবর্ষ নয়। অবশ্য বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-সম্পর্কীয় চিন্তা বরাবরই একটু জট-পাকানো, বাঙালি জাতি-সত্তা এবং ভারতবর্ষীয় জাতিসত্তা বহুক্ষেত্রে একাকার, যেমন হিন্দু সভ্যতা ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতাও তাঁর আলোচনায় তেমন পৃথগীকৃত নয়। কিন্তু যেখানে স্পষ্ট লিখছেন 'সপ্তকোটী কণ্ঠ', 'দ্বিসপ্তকোটীভুজ', কোনো বিভ্রান্তিরই তো অবকাশ নেই, বাঙালিদের কথা বলছেন, বাংলা মায়ের আরাধনা করা হচ্ছে, অতি মূর্ত আরাধনা : 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে অন্তত, বঙ্কিমচন্দ্রের আরাধ্যা ভারতমাতা নন, নিতান্তই আমাদের একান্ত আপন বঙ্গমাতা।

অথচ স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পর কোনো-এক লগ্নে 'বন্দেমাতরম্'-এর মা পাল্টে গেলেন। এই শতকের গোড়ার দিকের এক-দুই দশকের নথিপত্র অনুসন্ধান ক'রে কোনো তরুণ গবেষক হয়তো অচিরে আমাদের জানাতে পারবেন, ঠিক কোন্ তারিখে কোন্ উপলক্ষ্যে 'বন্দেমাতরম্' গানের পাঠান্তর ঘটলো, 'সপ্তকোটী কণ্ঠ'-'দ্বিসপ্তকোটীভুজ' রাতারাতি 'ত্রিংশকোটী কণ্ঠ'-'দ্বিত্রিংশকোটীভুজ'তে পর্যবসিত হ'লো। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সুর আরোপ ক'রে সরলা দেবীকে দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' সেই যে গাইয়েছিলেন, জানতে কৌতূহল হয় সাত কোটি কি তখনো সাত কোটিই ছিল, না ইতিমধ্যেই তা তিরিশ কোটিতে রূপান্তরিত। উপলক্ষ্যটির পরিচয় হয়তো ইতিহাসের গহ্বরে আরো-কিছুকাল লুকিয়েই থাকবে, কিন্তু বঙ্গজননীকে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতমাতারূপে অভিষিক্ত করা হলো, তার অপ্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সম্ভব। 'উদ্দেশ্য' কথাটি আমি কোনো রূঢ় অর্থে ব্যবহার করছি না, আদর্শ থেকেই

উদ্দেশ্যের উদ্ভব। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বাংলাদেশে শুরু হয়ে ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত চেতনাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে, সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তায়-ভাবনায় হঠাৎ জাতীয়তাবোধের ঘোর, জাতীয় কংগ্রেস প্রায় পুরোপুরি বাঙালিদের মুঠোয়, বাঙালি যুবক ফাঁসি-কাঠে গলা বাড়াবার পূর্বক্ষণে অবিচলচিত্তে সহাস্যমুখে যে-মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, 'বন্দেমাতরম্', তাকে ভারতীয় জাতিচেতনার প্রতিস্ব হিশেবে সর্বত্র মানিয়ে নিতে তেমন-কোনো বেগ পেতে হলো না। বাঙালির গান 'জাতীয়' সংগীত হিশেবে স্বীকৃতি পেল। বাঙালি নেতারা চরিতার্থ বোধ করলেন, যা ঘটলো তা-ও এক ধরনের সাম্রাজ্যবিস্তার, বাঙালি ভাবনা, বাঙালি আবেগের অনু-গমনে ভারতীয় ভাবনা, ভারতীয় আবেগের অভিযাত্রা ঘোষিত হলো। ল্যান্স-ডাউন অথবা থিয়েটর রোডে সদ্য-মস্ত-বাড়ি-তোলা বাঙালি নেতাদের পক্ষে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর সফলতা আর কী হ'তে পারে?

এখন মনে হয় মস্ত ভুল করেছিলেন সেই সব নেতারা। তাঁদের কাছে যা জয়ঢাকের দুন্দুভি ব'লে মনে হয়েছিল, আসলে তা বিসর্জনের বাজনা। বাঙালির, অন্তত হিন্দু বাঙালির, জাতীয় সংগীতকে তাঁরা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের সাধনায় উপচার হিশেবে বিলিয়ে দিলেন। এই আত্মস্বার্থত্যাগের নিহিতার্থ সত্তর-আশি বছরের ব্যবধানে এখন আমাদের কাছে অতি মাত্রায় স্পষ্ট। কিছু-কিছু নেতার অবচেতনে যা ছিল বাঙালির সাম্রাজ্যবিস্তার, তা, এখন মনে হয়, বাঙালির জাতীয় আত্মসমর্পণের রূপক। আমাদের গান আপনাদের দিয়ে দিলাম, আমাদের আলাদা সত্তাও ভারতচেতনায় মিশিয়ে দিলাম আমরা, আপনারা গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করুন: যদি বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের পাঠপরিবর্তনের এই ব্যাখ্যা পরিবেশিত হয়, সত্যের সত্যিই তেমন অপলাপ হবে না।

কেন এই কথা বলছি? বঙ্কিমচন্দ্রেই ফের ফিরে যাওয়া যাক। জাতি-ধর্ম-ভাষা-সমাজ-সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে-জাতীয় দর্শন তিনি ব্যক্ত করেছেন, তাকে উহ্য রাখলেও তাই তাঁর সামগ্রিক চিন্তার বিন্যাস সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অসুবিধা নেই। 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব', 'বাঙ্গালীর বাহুবল,' 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, 'বাঙ্গালা শাসনের কল', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা' : প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ভাষার মুন্সিয়ানা মুগ্ধ করে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে আজ থেকে একশো বছর আগেই যে-পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তা তুলনা-রহিত। অতএব তাঁর বক্তব্যে যদি কোনো অসংলগ্নতা-স্ববিরোধিতা-শ্লথোক্তি

চোখে পড়ে, ভাষাগত দৌর্বল্যকে তার জন্য দায়ী করা যাবে না, সমস্যা ভাবগত।

একটু আগে উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র জাতির সংজ্ঞানিরূপণের দায়িত্বের ধার-কাছ দিয়ে যাননি, বাঙালি জাতির কথা বলেছেন, আবার আর্য জাতির কথাও, হিন্দু জাতির কথাও প্রায় পাশাপাশি। সাঁওতাল জাতি, নাগা জাতি। মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া, গারো জাতি। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজবংশী, নওয়াতিয়া ইত্যাদি জাতি। বাংলার পশ্চিম দিকে খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া, ওঁরাও, ধাঙ্গর প্রভৃতি অনার্য জাতি। বঙ্কিমচন্দ্র এটাও বলেছেন, কোনো-কোনো জাতির ভিতর উপজাতি আছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে তাদের কথাও বলা প্রয়োজন হবে, সেই ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তেমন স্পষ্ট ক'রে তিনি নিজে অন্তত সে-সব প্রসঙ্গে প্রবেশ করেননি। তবে অনার্য জাতির আর্যীকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, যথা, যে-মুণ্ড জাতিভুক্ত, সে ঘটনাপরম্পরায় আর্য জাতিভুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু এই দুই জাতীয় সত্তার পারস্পরিক স্তরগত সম্পর্ক বা সমস্যা নিয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য নেই। আমাকে যা চমৎকৃত করে তা তাঁর নিম্নলিখিত ঘোষণা: 'ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের পর এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে'। পরস্পরের থেকে তারা পৃথক থাকে, তবু তারা এক জাতি, কারণ তারা বাঙালি, ভাষা ও আচরিক সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁর উক্তিতে আমরা এক নিঃশ্বাসে তিন-তিন প্রকৃতির জাতি খুঁজে পাচ্ছি: আর্য-অনার্য ইত্যাদি রক্তের সাযুজ্যগত জাতি; দ্বিতীয়, ধর্মীয় সূত্রে জাতি, যেমন মুসলমান; এবং, সব শেষে, ভাষা-সংস্কৃতির বন্ধনযুক্ত জাতি, যেমন বাঙালি।

অনেক স্ববিরোধিতা-আড়ষ্টতায় জড়িয়ে পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এক জায়গায় বলছেন, অবশ্য সব ককেশীয় আর্য নয়, তবে সব আর্যই ককেশীয়, এবং সেই হেতুই তারা আলাদা জাতি। কিন্তু কিছু-কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরাও এশিয়া মাইনরের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, ককেশীয়, এবং যাঁরা অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ আবহমান কাল এড়িয়ে এসেছেন, তাঁরা কেন আর্য জাতি হিশেবে পরিগণিত হবেন না, এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন তিনি। অন্য মুশকিলটি অবশ্য আরো অনেক বড়ো। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে জননীর সাত কোটি সন্তানের উল্লেখ, এই সাত কোটির মধ্যে অন্তত আড়াই কোটি, সংখ্যাতত্ত্বের হিশেবে ধরা পড়বে, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু যে-সন্তানবিদ্রোহের মন্ত্রোচ্চারণ 'বন্দেমাতরম্', তার লক্ষ্য মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসান্তে রাজ্যশাসনের ভার ইংরেজদের নিতে বাধ্য করানো। রঙ্গাশ্রিত প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করা যেতে পারে, হাকিম মানুষ

বঙ্কিমচন্দ্র, ন্যায়বিচার থেকে সজ্ঞানে তিনি পদস্খলিত হতেন না, যেহেতু বাঙালিদের চার ভাগ 'পরস্পর হইতে পৃথক থাকে', এবং অন্য তিন ভাগের লক্ষ্য চতুর্থ ভাগের দর্প খর্ব করা, তাঁর পক্ষে কি উচিত হতো না সাত থেকে আড়াই কোটি বাদ দিয়ে মাত্র সাড়ে চার কোটি কণ্ঠ এবং জোড়া-সাড়ে চার কোটি ভুজের উল্লেখে 'বন্দেমাতরম্' গানকে সংবৃত রাখা ?

আমার প্রধান সমস্যা অবশ্য অন্যত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো নিগড়ে বাঁধা পড়ছেন না, বাঙালির জাতীয়তা সম্বন্ধে যেমন তাঁর দ্বিধা নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সম্পর্কেও নেই : কোথাও এটা বলছেন না, বাঙালি জাতি, ভারতীয় মহাজাতি। তাঁর পক্ষে বলা অসুবিধা ছিল। একটু সংকোচের সঙ্গে কথাগুলি উচ্চারণ করছি, প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মনে হচ্ছে ব'লেই করছি। বঙ্কিমচন্দ্র, আর পাঁচজন সদ্য-ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষীয়দের মতো, জাতীয় চেতনার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক জ্ঞানান্বেষণ করেছিলেন ইওরোপীয় পণ্ডিতদের রচনা পাঠ ক'রে। সাম্রাজ্যবাদের নিহিত কৌতুক এটা। বিদেশীরা এসে বুকে চেপে বসে, লুণ্ঠনে-অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। লুণ্ঠন-অত্যাচারের প্রয়োজনেই পরাভূত মানুষগুলিকে একটু-আধটু লেখাপড়া শেখায়, সেই সুযোগের সূত্র ধ'রে পরাধীন দেশের অধিবাসীরা ভিন্ দেশে কী ঘটছে-না ঘটছে তার খবর পেয়ে যায়, তাদের চেতনার মান উর্ধ্বমুখী হয়, আস্তে-আস্তে তারা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হয়, সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ইংরেজদের পাঠশালায়, ইংরেজদের আনা বই প'ড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন জাতীয়তাবোধের কথা জানতে পেরেছিল। প্রথম পর্যায়ে বিদেশী শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করার যথেষ্ট কারণ ছিল দেশের প্রজাকুলের, তাদের তখন অনেকটাই 'হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি তো পথ চিনি না'-গোছের অবস্থা। ইংরেজরা পথ চেনালেন, দেশোয়ালিরা ইতিহাসের বিচারে খাল কেটে কুমির ডাকলেন। কিন্তু এরকম না হয়ে তো উপায় ছিল না, ইতিহাস তো তার নিয়ম-অনুযায়ী এগোবেই, প্রজ্ঞার সেই সারাৎসার বর্তমান শতকের জনৈক বাঙালি কবির স্বভাবসূচক সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় বিধৃত : 'কলোনীর দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ ; ইতিহাস ক্ষমাহীন, ক্রন্দনে কী লাভ'।

আমরা এগিয়ে এসেছি খানিকটা, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয় আরেকবার। জাতীয় চেতনা নিয়ে আলোড়ন-আলোচনার সমারোহ, বিলেত থেকে টাটকা বই আসছে প্রতিদিন। প্রশাসকরা অবসরমুহূর্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত-বিন্যস্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী-সম্প্রদায়ভুক্ত-সংস্কৃতিধারক অধিবাসীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ করছেন। সে-সব প'ড়ে ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের দেশ সম্পর্কে বহুবিধ জ্ঞান আহরণ করছেন। বলতে গেলে এই প্রথম দেশের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের। এবং এই পরিচয় থেকেই জাত্যভিমানের উন্মেষ-উদ্ভব। কী ধরনের সেই জাতীয় চেতনা ? ভারতীয় জাতীয়তার

সংজ্ঞা কী, সীমানা কী? কোন্ সংস্থানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদের আত্মাভিমান ব্যক্ত করবেন?

হাতের কাছেই উত্তর ছিল। এক হিশেবে ইংরেজরাই পাইয়ে দিলেন: ভারত সাম্রাজ্য যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের সীমানাও ততদূর পর্যন্ত। কারা-কারা ভারতীয়? ইংরেজ-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের যারা-যারা অঙ্গীভূত, তারাই ভারতীয়, তাদের মানসমণ্ডল জুড়েই ভারতীয় চেতনার প্রব্রজ্যা। ইংরেজরা ক্রমে-ক্রমে এই সাম্রাজ্য থেকে শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ খসিয়ে দিলেন, পরে পাকিস্তান নাম দিয়ে আলাদা এক রাষ্ট্র গ'ড়ে তাকেও ভারতবর্ষ থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দিলেন। ভারতবর্ষীয়রা সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহাই সংজ্ঞা হিশেবে বিনম্র মস্তকে গ্রহণ করে। ভারতীয় চেতনা অতএব ভারত সাম্রাজ্য-সীমা-আশ্রিত চেতনা, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ ইংরেজদের থেকে পাওয়া, আমাদের গত একশো-দেড়শো বছরের ভ্রান্তি-উৎকণ্ঠা-অপমান-আনন্দ-উল্লাস-উপলব্ধি-চরিতার্থতা-আশাভঙ্গ সব-কিছুই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ধার-করা ভাবনাচিন্তা অবলম্বন ক'রে।

কিন্তু ধার করতে গিয়েই মস্ত ভুল ক'রে ফেললেন আমাদের পূর্বসূরীরা। জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাঁদের চোখের অঞ্জন ছেয়ে। সেই রাষ্ট্রের হুবহু আদল তাঁরা খুঁজে পেলেন ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে, অনেকটা সেই বাংলা ছড়ার 'যার বড়ি যত উঁচু, তার বরের নাক তত উঁচু'-র মতো মানসিকতার শিকার হয়ে। জাতীয় সত্তা সম্পর্কে শিথিল ধ্যানধারণা: বাঙালি জাতি, ভারতবর্ষীয় জাতি, হিন্দু জাতি, আর্য জাতি, রাজবংশী জাতি, ভাসা-ভাসা শব্দপ্রয়োগ, যা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্তিত। ভারতীয় পণ্ডিতজনরা নিজেরাই স্পষ্ট জানেন না কী বলতে চাইছেন, ইংরেজদের বই প'ড়ে আহৃত জ্ঞানের তাঁরা ফলিত প্রয়োগ ঘটাতে চাইছেন, কিন্তু এলেবেলে হয়ে যাচ্ছে সব-কিছু, শেষ পর্যন্ত তাই সাম্রাজ্যের পরিধিকেই জাতির সীমানা-সংজ্ঞা হিশেবে মেনে নিলেন। অথচ, একটু ধৈর্য ধ'রে যদি থাকতেন মাত্র কয়েকটি দশক, সদ্য-শেখা চিন্তাগুলিকে যদি সামান্য থিতু হ'তে দিতেন, ইওরোপীয় ইতিহাস থেকেই অন্যতর শিক্ষা আহরণ করা তাঁদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বহু জায়গায় ইওরোপীয় সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন করেছেন ভারতীয় সভ্যতার। কিন্তু ইওরোপীয় সভ্যতা বহুজাতিক সভ্যতা। ইওরোপ একটি জাতি নয়, বড়ো জোর বলা চলে মহাজাতি, অনেকগুলি জাতীয় চেতনার উপনদী মিলে ইওরোপীয় চেতনা, অনেক-গুলি সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ইওরোপীয় সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা, যে-ভাষাগুলির হয়তো একটি-দু'টি মূল উৎস, কিন্তু ভাষা হিশেবে তাদের আলাদা সত্তা উপেক্ষা করা অসম্ভব, যেমন উপেক্ষা করা অসম্ভব সে-সব ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু-বিচিত্র জাতীয় চেতনা-সত্তাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি ক'রেই

বলছি, ইংরেজরা জাতি, ভাষাভিত্তিক জাতি, তাদের জাতিভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রকে জড়িয়ে তাদের জাতীয় চেতনাবোধ। ইওরোপীয়রাও হয়তো এক অর্থে জাতি—মহাজাতি—, কয়েকটি সার্বিক গুণসম্পন্ন সংস্কৃতির ধারক হিশেবে তাদের পৃথক ক'রে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু ইওরোপ নামে কোনো আলাদা অখণ্ড রাষ্ট্র নেই, ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই ছিল না; শার্লমান-নাপলিয়ঁ একটির-পর-একটি রাজ্য জয় ক'রে প্রায় গোটা মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সফল হয়েছিলেন, তবু সংযুক্ত-অখণ্ড একটি রাষ্ট্র স্থাপনের কথা কখনো ভাবেননি। ভাবেননি কারণ তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতো। বিভিন্ন-বিচিত্র সংস্কার-আচার-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে একটি অর্গলরুদ্ধ বৃত্তের শৃঙ্খলায় ফেলে হঠাৎ কোনো বহুজাতিক রাষ্ট্ররচনা ইতিহাসের স্বচ্ছন্দ নিয়মকলার মধ্যে পড়ে না। ইওরোপীয় ঐতিহ্যের বাস্তবতা সর্বস্বীকৃত, ইওরোপীয় চেতনার উল্লেখেও আমরা একটি বিশেষ প্রবাহকে অনায়াসে চিনে নিতে পারি। যেমন পারি ইওরোপীয় চিত্রকলা-ইওরোপীয় ভাস্কর্য-ইওরোপীয় সংগীতকে। কিন্তু তা হ'লেও কোনো মহারথীই আজ পর্যন্ত সামগ্রিক সার্বভৌমত্ব এক-বিশেষ-কেন্দ্রবিন্দুতে-স্থিত, সুসংযুক্ত, বহুজাতিক কোনো ইওরোপীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। ইতিহাসের অতি-সাম্প্রতিক অধ্যায়ে একমাত্র সোভিয়েট ও চীন প্রজাতন্ত্রে এ ধরনের বহুভাষিক-বহুজাতিক রাষ্ট্র পরীক্ষা-উত্তীর্ণ, কিন্তু এই দুই দেশের সফল পরীক্ষার পটভূমিকায় যে-পরম ধৈর্যশীল কিছু-কিছু অঙ্গীকার উদ্‌যাপনের কাহিনী, তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে আপাতত অকল্পনীয়। ইওরোপে বেলজিয়াম, উত্তর আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, মাত্র দুই জাতি-সংবলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছে। পশ্চিম ইওরোপের গনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সময় থেকেই এক বহুজাতিক সম্মিলিত রাষ্ট্র স্থাপন নিয়ে জল্পনা-আলোচনা চলছে—সমাজতন্ত্রের বিজয়াভিযানজনিত আতঙ্ক এ-সমস্ত জল্পনার নিশ্চয়ই অন্যতম কারণ—, কিন্তু কথার উপর কেবলই কথা বুনে চলা হচ্ছে, নিজেদের আলাদা সত্তা বিসর্জন দিয়ে ঠিক কোনো ইওরোপীয় জাতিই বহুজাতিক রাষ্ট্রের গহ্বরে নিজেকে বিলীন ক'রে দিতে প্রস্তুত নয়, অন্তত এখন পর্যন্ত নয়।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের আদলে-প্রকৃতিতে অনেক জটিলতা। চার হাজার-পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের অবশ্য দোহাই পাড়া হতো দেশের সর্বত্র। এমনকি দাক্ষিণাত্যেও, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রবহমান ধারা অব্যাহত ছিল, বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ জড়ানো সেই সংস্কৃতি, যার সঙ্গে আপ্লুত ভারতীয় সংগীত স্থাপত্য-চিত্রকলা, পাশাপাশি একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় দর্শন। কতটা নিকষ ভারতীয়-কতটা নিকষ হিন্দু এই ভারতীয় সংস্কৃতি, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক সম্ভব, কারণ অধিকাংশ আলোচনাতেই মুসলমান যুগোদ্ভুত সৃষ্টি-কর্ম-চিন্তা-ঘটনাবলী ফিরিস্তি থেকে বাদ দেওয়া হতো।

তা হলেও ইওরোপীয় সভ্যতা যেমন আলাদা ক'রে বর্ণনা করা যায়, ভারতীয় সভ্যতা-ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনি মোটা দাগে চিহ্নিত করতে অসুবিধা ছিল না। তবে ইওরোপীয় ঐতিহ্যকে স্পষ্ট চেনা যাওয়া সত্ত্বেও ইওরোপীয় রাষ্ট্র অবাস্তব প্রস্তাব ব'লে বরাবর বিবেচিত। অন্য পক্ষে, ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতীপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, যা ইওরোপে অকল্পনীয়, ভারতবর্ষে তা-ই নাকি অতি বাস্তব, বহুভাষাসংস্কৃতিভিত্তিক সাম্রাজ্য যদি হ'তে পারে, অনুরূপ বহুজাতিভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররচনাও নাকি তা হ'লে সম্ভব।

ঘরোয়া কথাবার্তায় আমরা একটি কথা প্রায়ই ব্যবহার করি : 'গুলিয়ে ফেলা'। সন্দেহ হয়, আমাদের চিন্তানায়কেরা জাতিবিচার ব্যাপারটিকে ভীষণ-রকম গুলিয়ে ফেলেছিলেন। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে কিছু উদাহরণ দাখিল করেছি ; বিশ্বাস, সংস্কার, কিংবদন্তী, স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রমের পারস্পরিক দূরত্ব ঘুচে গেছে, ইংরেজদের আমদানি করা বই প'ড়ে জাতীয়তা প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচয়, স্বদেশী পণ্ডিতজন ও পণ্ডিতমন্যরা নতুন-পাওয়া ধ্যানধারণা তাঁদের অভিজ্ঞতার দর্শনে মুকুরিত কোনো প্রতিভাসের উপর আরোপ করতে উৎসুক। সাহেবরা আমাদের জুড়ে দিয়েছে, এই জোড়া অবস্থাই জাতীয়তাবোধ ; সাহেবরা জোর ক'রে জুড়ে নিয়ে যে-সমগ্র ভূখণ্ড গঠন করেছে, তা ভারত সাম্রাজ্য ; বেশি ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কী হবে, ভারত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ সমান্তরাল রূপকল্প আমাদের জাতীয় চেতনা, ভারতীয় চেতনা ; তা ছাড়া, সত্যিই তো, ভারতীয় সভ্যতা ব'লে বস্তুটি তো সেই কবে থেকেই আছে, সুতরাং তর্ক-জিজ্ঞাসা বাড়িয়ে দরকার নেই, 'বন্দেমাতরম্' ব'লে ঝুলে পড়া যাক, 'ভগবতী ভারতী' কিংবা 'ভারতলক্ষ্মী' ইত্যাদি শব্দের পুনঃপৌনিক উচ্চারণই আমাদের জাতীয় সত্তায় উত্তীর্ণ করবে।

অথচ, উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের কী অবস্থা ছিল একবার ভাবুন। মধ্যযুগ থেকে তেমন-কিছু আমূল পরিবর্তন তো সংঘটিত হয়নি। বেশির ভাগ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দু'দশ ক্রোশের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে যেত না, গোশকট, কিংবা নদীবাহী জলযান, যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন, বাধ্য হয়েই তাই সাধারণ গৃহস্থের দিনযাপনের পৃথিবী সংকীর্ণ দিগন্তে নিয়ন্ত্রিত ; সামান্য নদী পেরিয়ে ভিন্‌দেশ থেকে গৃহবধূ আনতে হ'লেও অনুমতির জন্য গ্রামসভা আহ্বান করতে হতো। মাঝে-মাঝে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন গ্রামবাসীরা। দু'তিন বছর সময় ব্যয় ক'রে, বহু ক্লেশকৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ সাঙ্গ ক'রে ফিরতেন। কিন্তু তাঁরা ক'জন, ইংল্যাণ্ডের মানুষও তো সেই মধ্যযুগে কখনো-সখনো বেরিয়ে প'ড়ে জেরুজালেম পর্যন্ত তীর্থ সেরে আসতেন। ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের মানুষের সাক্ষাৎপরিচয়-আদানপ্রদান ছিল ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঘটনা। যে-মানুষ-

গুলির ভাষা আমাদের বোধের অগম্য, যাদের পরিচ্ছদ আমাদের থেকে ভিন্ন, যাদের আহার্য আমরা ঠিক মুখে দিতে পারি না, যে-মানুষগুলি আমাদের থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত, তারাও রামায়ণ-মহাভারত থেকে প্রেরণা-আনন্দ পায়, যেমন আমরা পাই, বেদ-উপনিষদ থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন আমরা করি, তাদের সংগীতে-ভাস্কর্যেও আমাদের ললিতকলার স্বাক্ষর, স্রেফ সেই কারণে, তাদের সঙ্গে আমরা অচ্ছেদ্য জাতীয়তাসূত্রে গ্রথিত : এই দাবি আতিশয্যদোষে দুষ্ট না হয়েই পারে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঋদ্ধ, সংগ্রামের-সংঘাতের-সহমর্মিতার অবগাহনে শুচিস্নাত, যে-জাতীয়তাবোধ, একান্ত ভাষাভিত্তিক যে-জাতিচেতনা, সাংস্কৃতিক-আচরিক সুষমানন্দিত যে-জাতিচেতনা, তুলনাগতভাবে তা উপেক্ষিত রইলো, আমাদের পূর্বসূরীরা তড়িঘড়ি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অভিসারে বেরিয়ে পড়লেন। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে 'সপ্ত কোটি' কেটে 'ত্রিংশ কোটি' বসানো হলো, 'দ্বিসপ্ত কোটি' কেটে 'দ্বিত্রিংশ কোটি'।

যা হলো তা খোদার উপর খোদকারি। যে-জাতীয় চেতনার অঙ্গীকার উনবিংশ শতকের পণ্ডিত মানুষেরা নিজেদের উপর চাপালেন, তা না বিজ্ঞান-সম্মত, না ইতিহাসসম্মত। ইওরোপীয়রা বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে রাজি হননি, প্রতিবারই তাঁরা পিছিয়ে গেছেন, বহুভাষী-বহুজাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। কিন্তু যেহেতু ইংরেজদের কীর্তিমাহাত্ম্যে ভারতীয় উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তরা উনবিংশ শতকের মধ্যবয়সে মুগ্ধ, তাঁরা বহুজাতিক রাষ্ট্রের প্রস্তাব অবলীলায় মেনে নিলেন : ইংরেজরা যদি বহুজাতিক ব্যবস্থাকে প্রশাসনের নিগড়ে বাঁধতে পারে, আমরা, ভারতীয়রা, নিজেরাই বা তা হ'লে পারবো না কেন, অনেকটা এ ধরনের যুক্তি। এই যুক্তির গোড়ায় গলদ : ইংরেজরা ডাণ্ডা মেরে প্রশাসন চালাতো, জাতীয়তাবাদীরা যে-শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের প্রতিমা কল্পনা করলেন, সেই ভারতবর্ষ তো পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ, সেখানে তো জোর খাটানো যাবে না কারো উপর, ডাণ্ডা ঘুরিয়ে টুঁটি চেপে ধ'রে তো কোনো নাগরিককে বাধ্যতামূলক জাতীয়তাবোধের তদ্‌গত উপাসনায় নিযুক্ত করা যাবে না।

একশো বছর আগে আমাদের গুরুজনরা যে-মারাত্মক ভুল করেছিলেন, তার খেসারৎ দিতে হচ্ছে এখন আমাদের। সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, এই অনুজ্ঞা মেনে নিয়ে আমরা, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্তে, ভারত-চেতনার চরণমূলে আমাদের সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিয়েছি, যে-জাতীয়তাবোধ আমাদের পরিচিত অভ্যাসের মতো, তাকে অহরহ শাসন ক'রে আমদানি করা গ্রন্থ থেকে আহৃত অন্য-এক জাতীয়তাবোধকে বরণ ক'রে নিয়েছি। অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি নাগরিকের দুই আলাদা সত্তা : ভারতীয় সত্তা, সেই সঙ্গে, পাশাপাশি, তামিল অথবা মালয়ালী অথবা তেলুগু অথবা গুজরাটি অথবা মারাঠি অথবা পঞ্জাবি অথবা রাজস্থানী অথবা মহাকোশলী

অথবা উড়িয়া অথবা বাঙালি অথবা অসমীয় সত্তা, কিন্তু প্রথম সত্তাটি প্রতি মুহূর্তে বন্দিত-অভ্যর্থিত হয়েছে, দ্বিতীয় সত্তা দুয়োরাণী, দুঃখই তার আবরণ, অবহেলা তার আভরণ। বঙ্গজননীকে উদ্দিষ্ট সংগীত আমরা ঠিকানা কেটে ভারতমাতার মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছি, ভারতবন্দনা করতে-করতে আমাদের বীর বন্দীরা আন্দামানে বছরের-পর-বছর কালাতিপাত করেছেন, শহীদরা ভারতলক্ষ্মীর শুভ স্তব করতে-করতে যূপকাষ্ঠের উদ্বন্ধনে আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই একপেশে আরাধনাব্যবস্থায় ঘোরতর গোলযোগেয় সূত্রপাত হয়েছে। জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে একমাত্র নিমগ্ন থাকো, ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ কোরো না, স্থানীয় সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার মতো মানসিক সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখো, অন্যথা তুমি তোমার অঙ্গীকার থেকে ব্রাত্য হবে: অঘোষিত, অলিখিত, অথচ অলঙ্ঘণীয় এ-ধরনের অনুশাসনের বেড়াজালে দশকের-পর-দশক ধ'রে দিন কাটছে কি কাটছে না আমাদের। ফল যা দাঁড়িয়েছে তা এখন সর্বসমক্ষে গোচরমান। দিল্লিই সব-কিছু, দিল্লির সরকারই সব-কিছু। আমরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সরকার গঠন করবো, কিন্তু দিল্লির পছন্দ না হ'লে সেই সরকার ভেঙে দেওয়া হবে। আমরা আমাদের মতো ক'রে ভূমিসংস্কার পর্যন্ত করতে পারবো না, জাতীয় সরকার নির্দেশ দেবেন কোন্ ধরনের ভূমি-সংস্কার বিশুদ্ধ, অন্য-কোন্ ধরনের অগ্রহণীয় ; সমগ্র অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত, এমনকি আমরা টাকা জমা রাখি যে ব্যাংকে, সেই টাকা সেই ব্যাংক কীভাবে ব্যবহার করবে তা পর্যন্ত নিরূপণ করবে জাতীয় সরকার। আমাদের সন্তানেরা কোন্ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করবে, আমাদের রেডিও-টেলিভিশনে কী সংগীতচর্চা-নৃত্যকলা-অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে সমস্ত নির্ণীত হবে দিল্লিতে, যেখানে জাতীয় সরকার সংস্থিত। আজ থেকে একশো বছর আগে তখনো-পর্যন্ত-অবাস্তব যে-জাতীয়তাবোধের কাছে নিজেদের সমর্পণ ক'রে দিয়েছিলেন আমাদের পূর্বসূরীরা, তার বেসামাল প্রবাহ অনুসরণ ক'রে এই জাতীয় সরকারের আত্মপ্রকাশ, সুতরাং কোন্ ঠাঁইতে আমরা নালিশ জানাতে যাবো ?

অথচ, আশঙ্কা হয়, দু'দিকেই ক্ষতি হচ্ছে। প্রাণী-তথা-উদ্ভিদ্ জগতে এটা হামেশাই ঘটে, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তা-ও সইয়ে-সইয়ে, একটু-একটু ক'রে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিশোধন-পরিমার্জন ক'রে নিয়ে, পরিবেশের সঙ্গে ধাতস্থ করা হয়, কোনো নতুন প্রাণী অথবা উদ্ভিদের জন্ম হয়, সেই জন্মবৃত্তান্ত অতঃপর স্বতঃসিদ্ধতা। কিন্তু তাৎক্ষণিক চিন্তাপ্রসূত, এবং প্রধানত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা প্রথম থেকেই অসহিষ্ণুতার জাতক ; ১৯৪৯ সালে রচিত সংবিধান, এবং সেই সংবিধান যে-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় গত সাঁইতিরিশ বছর ধ'রে প্রয়োগ করা হয়েছে, উভয়-ই উক্ত অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করছে। সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা সম্পদ্ যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত,

সেই সরকারের বিহারে-ব্যবহারে এক গর্বিত স্বৈরাচারের আভাস। এই স্বৈরাচার থেকে অন্য উপসর্গের আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয়: যে-একনায়কত্ব নিছক বিদূষকমণ্ডলীর চাটুকারিতার নির্ভরে আশ্রিত, তা ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

তা ছাড়া, চাটুকারিতাও তো অতিভক্তি থেকে সঞ্জাত। জাতীয়তাবোধের আরাধনায় আমরা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি; ভারতমাতা সমস্ত উপচার-মনোযোগ শুষে নিয়েছেন, পাড়ার দেবতারা কল্কে পাননি। কিন্তু ভারতমাতা তো বৈদেহী ব্যাপার, কোনো-এক পর্যায়ে ভক্তির বিভিন্ন উপচার-অর্ঘ্য ঈষৎ দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে ভারতমাতার রক্তমাংসের প্রতিভূদের পদতলে নিবেদিত হবার অধ্যায় শুরু হয়েছে, নেতৃবৃন্দ কালক্রমে ঈশ্বরের আসনে পূজিত হ'তে অভ্যস্ত হয়েছেন, চাটুকারদের স্তুতি তাঁদের কাছে এখন পরম গ্রহণীয় স্বাভাবিক ব্যাপার ব'লে বিবেচিত: স্তুতি শ্রবণে তাঁদের ঈশ্বরদত্ত, জন্মগত অধিকার, সুতরাং, এটা আর এমন কী বেশি কথা, ভ্রষ্টাচারবৃত্তিতেও তাঁদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার।

স্বভাবপ্রতিভায় জীয়ন্ত যে-জাতীয় চেতনা, ভাষাভিত্তিক, সমসংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধ, তা সেই সঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত। যা বিকশিত হবার, তা বিকশিত হ'তে পারছে না। যে-অধিকার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমগোত্রীয়, নিজেদের ভাষায় বাধাহীন পেখম মেলবার অধিকার, তা পর্যন্ত খর্বিত: নির্দেশের জটিলতা, নিষেধের অযুত ব্যাকরণ। সম্ভবত প্রগাঢ় ইংরেজপ্রেমিক ব'লেই, আমরা একটু বেশি নিয়মতান্ত্রিক, ভয়ংকর ক্ষেপে না-গেলে অনুশাসনের গণ্ডির বাইরে যেতে, এখনো পর্যন্ত, আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু এই প্রান্তে আমরা তৈরি নই ব'লে ইতিহাস তো আর ঠেকে থাকবে না। অন্যান্য অনেক অঞ্চলে যারা বিক্ষুব্ধ, অশান্ত, আমাদের মতো ভদ্রলোকজনিত আচরণে তাদের সায় নেই, তারা কালবৈশাখী ঝড়ের প্রসঙ্গ শুধু ভাবছে না, সেই ঝড়কে রূপ দিচ্ছে। ইতিহাসের প্রবহমানতা এটা, ঘাতের পিঠে প্রতিঘাত। ভারতবর্ষে আগামী কয়েক বছর অতএব উথালপাথাল অবস্থা যাবে।

কর্মফল ভোগ এড়ানো যায় না, কী কুক্ষণে কোন্ উৎসাহী বাঙালি 'বন্দে-মাতরম্' গানে আদি শব্দ কেটে নতুন শব্দ সংযোজন করেছিলেন, সেই অবিমৃষ্য-কারিতার পরিণাম অমোদের খণ্ডিত ললাটলিখন।

'অরসিকে কয় বাতুল'

'আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয়নিকো নজরুল।' একটু অতিশয়োক্তি কি চুঁইয়ে পড়ছে না? অবশ্য বছর-বছর জ্যৈষ্ঠের বিশেষ তারিখটি ঘুরে আসে, ঐ একটি দিনের জন্য প্রথাগত তর্পণ, 'বিদ্রোহী' কবিতা থেকে আবৃত্তি অথবা 'সাম্যের গান গাই', কিছু গলা-কাঁপানো আবেগ, নজরুলের একটি-দু'টি গান, হয় 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' নয়তো কোনো পিলু বা গজল, কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের মফঃস্বলে নজরুলের প্রতি কর্তব্য বছরকার মতো সম্পন্ন ব'লে ধ'রে নিই আমরা সবাই। কিংবা হয়তো কারো-কারো মনে ঈষৎ-একটি অপরাধবোধ কাজ করে, কর্তব্যে কোথাও গাফিলতি ঘটেছে এই অস্পষ্ট অনুভূতি থেকে সঞ্জাত অপরাধবোধ। কিন্তু ব্যস্ত মানুষ আমরা সবাই, আগামী বছর ফের এগারোই জ্যৈষ্ঠ হাজির না হওয়া পর্যন্ত সেই বোধ অতি সহজে বিস্মরণের শরীরে ঢ'লে পড়ে, বালিশে মাথা রেখে ঘুমোই আমরা।

অবশ্যই সাম্যের গান গেয়েছিলেন নজরুল। 'সঞ্চিতা' পেড়ে সেই বিবিধ গান-কবিতা, ফুরসুৎ হ'লে, আমরা মাঝে-মাঝে পড়ার অভিনয় করি। কিন্তু নজরুলকে বোঝবার চেষ্টা করেছি কি আদৌ? সাম্যের কথা বলতেন নজরুল। অজস্র গানে-কবিতায় তার নিদর্শন ছড়ানো, কিন্তু সেই সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে-ভাষার ব্যবহারে-প্রকাশনার বিভঙ্গে অন্য-একটি কথাও বলতেন, সাংস্কৃতিক-আচরণিক সংশ্লেষণের কথা। প্রধানত বাঙালি চেতনা-বাঙালি সমাজ নিয়েই তিনি উৎকণ্ঠ ছিলেন, বাঙালি চেতনার উপাদান, বাংলা সংস্কৃতির গঠন-প্রকরণ তাঁকে অহরহ ভাবাতো। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তা বছর কুড়ি-বাইশ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ১৯২০ সাল থেকে শুরু ক'রে ১৯৪২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, তারপর তো অন্ধকারের ঢল নামলো। খুব দ্রুততার মধ্যে ছিলেন নজরুল, কী ক'রে যেন বুঝতে পারছিলেন হাতে সময় বড়ো কম, কোনো-ক্রমে পড়শীদের, সহোদর-সহোদরাদের চেতনার গভীরে অনুপ্রবেশ ক'রে, তাঁদের বোঝাতে হবে কোন্ মৃত্তিকা থেকে আমাদের উৎস, কোন্ অবলম্বনের বাইরে আমাদের আশ্রয় নেই। হাতে সময় বড়ো কম ছিল নজরুলের, বাইরে সমুৎপন্ন সর্বনাশের পূর্বাভাস আকাশ ঘন ক'রে আসছে, বেপরোয়া উদ্দামতায় নিজের জীবনীশক্তিকেও তিনি ক্রমশ ক্ষইয়ে-ক্ষইয়ে এনেছেন, অথচ যাঁদের বোঝাতে চাইছেন, তাঁরা এই ত্রস্ততার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না, উপলব্ধিতে তদ্গত হওয়ার দিকে তাঁদের কোনো আগ্রহ নেই; নজরুল তাই সতত প্রতিহত হয়ে

ফিরছেন, ব্যর্থতা থেকে হতাশা, হতাশা থেকে গ্লানিবোধ, গ্লানিবোধ থেকে আত্মহননের প্রবণতা। হঠাৎ একদিন নজরুল নির্বাক হয়ে গেলেন। অভিমান থেকে এই নির্বাক হয়ে যাওয়া কিনা তা এখন আর কেউই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারবেন না।

একটি অতি সহজ কথা বাঙালিদের বলতে চেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। একজন-দু'জন গোপাল রাজা বা হুসেন শাহের হঠাৎ আবির্ভাব নেহাৎই ছুট্‌কো ব্যাপার, আসলে বাঙালিরা কোনো কালেই রাজার জাত ছিল না, সহজিয়া পরিবেশ তাঁদের প্রধান উত্তরাধিকার—যে-পরিবেশে ধর্মাচরণ-লোকগাথা ইত্যাদির সঙ্গে প্রাত্যহিক দিনযাপন ওতপ্রোত জড়ানো, ফকির আউল-বাউল মানুষগুলি সাধারণ গৃহস্থের চেয়ে আলাদা নয়, তাঁদের গানে-চর্চায় ভক্তির প্রকাশে দৈনন্দিন অস্তিত্বের সমস্যাগুলিই প্রতিভাত-পরিস্ফুট হয়। বাঙালি সমাজে সাম্যচেতনা প্রায় তাই ঐতিহ্যগত, ধর্মীয় চেতনাও অনুরূপ-ভাবেই ঐতিহ্যের শরীরে মিশে গেছে, ধর্মাচরণের বিকল্প ব্যাখ্যা তো ন্যায়াচরণ। ধর্মকে বড়োলোকেরা যে-বিবিধ উপকরণ-আচারের আবরণ পরিয়েছেন, তা কৃপাভরে, কখনো-কখনো প্রয়োজন হ'লে ঘৃণাভরে, পাশে সরিয়ে রাখতে হয় তাই, পাশে সরিয়ে রেখে ধর্মাচরণের গহনতম গভীরে পৌঁছে যেতে হয়। সেখানে ধর্মভেদ-বর্ণভেদ-পংক্তিভেদ অবান্তর প্রসঙ্গ, 'কাণ্ডারী, বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র'। উপদেশ এখানে কথকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে: 'চাষা ব'লে করো ঘৃণা! / দেখো চাষারূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কিনা। / যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল, / তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে, যা রবে চিরকাল'।

রামপ্রসাদী-শ্যামাসংগীত-কীর্তন-ভাটিয়ালী-সারী-গজল, ঝোঁক ও প্রক্ষেপণগুলি আলাদা-আলাদা, কিন্তু তারা তো একটি সংশ্লিষ্ট সমাজের অনুভূত আবেগের প্রকাশের মধ্যবর্তিতা হিশেবে কাজ করছে, তা হ'লে আমরা কেন পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হবো? নজরুল নিজেকে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হ'তে দেননি কোনোদিন, তিনি শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন, কীর্তনের আখর জুড়েছেন, ভাটিয়ালের উদাসী হাওয়ায় পাল লাগিয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি, একই সহজিয়া প্রেরণায়, গজলের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন: 'নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে। / ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন আসমানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে। / কে এলো কে এলো গাহে কোয়েলিয়া, পাপিয়া-বুলবুল উঠিল মাতিয়া, / গ্রহ তারা ঝুঁকে করিছে কুর্ণিশ, সুর-পরী হেসে পড়িছে ঢ'লে'। অথবা পৌঁছে গেছেন কাহারবা-কার্ফায়: 'বক্ষে আমার কা'বার ছবি / চক্ষে মোহম্মদ রসুল। / শিরোপরি মোর খোদার আরশ / গাহি তারি গান পথ-বেভুল। / লায়লির প্রেমে মজনু পাগল / আমি পাগল "লা ইলার"র, / প্রেমিক দরবেশ

আমায় চেনে, / অরসিকে কয় বাতুল'। নজরুলের কাছে অন্তত, সীমানা মানা-না মানার প্রশ্নই ছিল না, সীমারেখার অস্তিত্বই তাঁর কাছে অস্বীকৃত থেকে গেছে। সহজিয়া মানুষের কথা বলছেন তিনি, হাটে-মাটে-গাঁয়ে-গঞ্জে যে-মানুষ ধর্মের সঙ্গে প্রবচনকে জড়িয়ে অধিষ্ঠান করছে, 'হিন্দু' প্রবচন আর 'মুসলমান' প্রবচনে বাছবিচার করছে না, যেমন করছে না হিন্দু দেবতা আর মুসলমান পয়গম্বরের মধ্যে ; ঐ সহজিয়া পরিবেশে এটাই স্বাভাবিকতা, যে-অবলীলায় ডাইনে থেকে বাঁয়ে চ'লে আসা, সেই একই অবলীলায় বাঁদিক থেকে ডাইনে ফেরা।

নজরুল, ঐ একই কারণে, ভাষাব্যবহারেও সচেতন সংশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন, তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে খাঁজে-খাঁজে মিলিয়ে দিয়েছেন আরবি-ফার্সি থেকে আহরিত মুক্তামালা, সাতশো বছর ধ'রে প্রমাণিত বাঙালির পারস্পরিক সহিষ্ণুতার তথা পারস্পরিক গ্রহণীয়তার প্রমাণ হিশেবেই যেন তিনি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন এই ধরনের পংক্তির সমারোহকে : '...উমর-আলি-হাইদর / দাঁড়ি যে এ-তরণীর, নাই ওরে নাই ডর', 'দাঁড়িমুখে সারী গান : লা-শরীক-আল্লাহ্', 'ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ / তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানী তাকিদ্', 'ডালে তোর হানলে আঘাত দিস্ রে কবি ফুল-সওগাত', 'বুক খালি ক'রে আপনারে আজ দাও জাকাত,' 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় / প্রাণের বুলন্দ্ দরওয়াজায়'।

কিন্তু ব্যর্থমনোরথ নজরুল, যে-সহজিয়া বাঙালি সমাজের চিত্রকল্প তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, তা কবে উধাও হয়ে গেছে। বাঙালি সমাজ তারপর চতুরালি শিখেছে, শঠতা শিখেছে, হিশেব শিখেছে, সংস্কার শিখেছে, প্রভেদী-করণ শিখেছে। তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বাঙালি 'হিন্দু' সমাজ ইতিমধ্যে পঙ্ক থেকে পদ্ম উদ্ধারের কেরামতি রপ্ত ক'রে ফেলেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টায় এক সু-সম্পাদিত কাজী নজরুল ইসলাম প্রকাশিত হলেন, কীর্তনশ্যামাসংগীতের কাজী নজরুল ইসলাম, 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম / তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক প্রিয় নিও মোরও নাম'-এর কবি নজরুল, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবারে'র নজরুল, কখনো হয়তো বা 'চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'-গোছের গজলের চটুল চারণের নজরুল, যাঁর উদ্দাম অভিযাত্রার সংগীত 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল / নিম্নে উতলা ধরণী তল/ অরুণ প্রাণের তরুণ দল / চল্ রে চল্ রে চল' গাওয়া হ'তে শুরু হলো শেষের স্তবকটি সযত্নে পরিহার ক'রে, তাতে নাকি অনেক কটোমটো মুসলমানী শব্দ আছে।

সুতরাং যাঁরা বলেন নজরুলকে ভাগ করা হয়নি, ঘোর অনৃতভাষণ করেন তাঁরা। দেশভাগের পর বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজ নজরুলের সামগ্রিক সৃষ্টিকে

কেটে-ছেঁটে নিজেদের শৌখিন সংস্কৃতির মাপে গ্রহণযোগ্য করবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে বছরের-পর-বছর ধ'রে। ভাগাভাগির পরেও ফের আরো ভাগাভাগি ঘটেছে। যাঁরা রাগপ্রধান সংগীতের অনুরক্ত, তাঁরা নজরুলের কিছু-কিছু কবিতা-গান নিজেদের কুক্ষিগত করেছেন, যাঁরা পেশাদার আবৃত্তিবিশারদ, তাঁরা তাঁদের স্বভাব-অধিকারের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নজরুলের একটু উচ্চগ্রামের কাব্যাংশের দিকে, যাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন 'ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা'/ যুথীর চোখে আবেশ-মাখা / কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা / ভোর গগনের দর-দালানে / দর-দালানের ভোর গগনে' অথবা 'মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল / ভরি' ডালি দিনু ঢালি', দেবতা মোর / হায় নিলে সে ফুল, ছি ছি বেভুল / নিলে তুলি' খোঁপা খুলি' কুসুম-ডোর'-সদৃশ আপাতলঘুভার মজলিশি মেজাজই নজরুলের পরিচয়, তাঁরা আলাদা ক'রে তাঁদের আসর সাজিয়ে বসেছেন ; সব শেষে, যাঁরা কাজী নজরুল ইসলামকে সমাজ-পরিবর্তনের দিশারী হিশেবে ভাবতে শিখেছেন, 'বিষের বাঁশী' বা তাঁর একগুচ্ছ 'সাম্যবাদী' বা 'দেশপ্রেমিক' কবিতার ডোরে নিজেদের স্বেচ্ছাবন্দী করেছেন তাঁরা। বহুজনবিভক্ত কাজী নজরুল ইসলাম, খণ্ডিত কাজী নজরুল ইসলাম। দেশভাগ-উত্তর ভারতবর্ষের বাঙালি সমাজের বিভিন্ন শরিক তাদের আলাদা-আলাদা তাগিদে প্রগাঢ় স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে নজরুলকে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের প্রথম দিকের এক গদ্যরচনায় এক স্বগতোক্তি ছিল, 'আমি যেন এক বেওয়ারিশ মাল', স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের বাংলাভাষী সমাজ তাঁকে যেন যথার্থই সেই স্তম্ভিত পরিণতির দিকে পৌঁছে দিল।

আমরা প্রত্যেকে তাই ব্যবহার করছি নজরুলকে, তাঁকে সম্মান জানাচ্ছি না, তাঁকে অনুধাবনের চেষ্টা করছি না। সেই চেষ্টা করলে আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্যে পড়তে হবে ব'লেই করছি না। অনেক বুজরুকির মধ্যে বিহার করি আমরা, আমি নিজে একমাত্র নাকি সংস্কারমুক্ত স্বাধীনমনা, অন্য সবাই সাম্প্রদায়িক-সংস্কারাচ্ছন্ন-মধ্যযুগাসক্ত। একই মন্ত্র প্রত্যেকে প্রত্যহ আউড়ে যাই, অথচ দর্পণে মুখ দেখি না আমরা, বিবেকের সঙ্গে কখনো মুখোমুখি আলাপ করার সময় হয় না আমাদের। নজরুলকে টুকরো-টুকরো ক'রে আমাদের প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা ব্যবহারের উপযোগী ক'রে নিয়েছি যেহেতু, পরিপূর্ণ গ্লানিমুক্ত আমরা, আমাদের ভাটির তরী আর কোনোদিনই কোনো উপলক্ষেই ফের উজানে যেতে চাইবে না। এগারোই জ্যৈষ্ঠ প্রতি বছর ফিরে আসবে, ঐ একটি দিনের জন্য লোক দেখানো সমারোহ হবে, পণ্ডিতজনেরা বক্তৃতা দেবেন, আবৃত্তিকাররা গলা কাঁপিয়ে বলবেন, 'বলো বীর, চির উন্নত মম শির', কাজীদার গানের সাগরে ভেসে যাবেন প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকাকুল, কোন্ অভিমানে কাজী নজরুল ইসলামের কলম থেকে এই অনুযোগ উচ্চারিত হয়েছিল, 'মৌ-লোভী যত মৌলবী আর মোল্লারা কন্ হাত নেড়ে / দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও

পাজিটার জাত মেরে! / ...হিন্দুরা ভাবে, ফার্শি-শব্দে কবিতা লেখে ও পাত-নেড়ে', তা নিয়ে কারোরই কোনো উদ্বেগবোধ হবে না, চল্লিশ বছরের উপর দেশটা তো ভাগ হয়ে গেছেই, বাংলা সহজিয়া সংস্কৃতির ভ্রষ্টাবশেষটুকু পর্যন্ত এখন বোম্বেটেদের দৌরাত্ম্যে উবে যাওয়ার উপক্রম।

'থই থই জলে ডুবে গেছে পথ / এসো এসো পথভোলা, / সবাই দুয়ার বন্ধ করেছে / আমার দুয়ার খোলা'। নজরুলের সেই খোলা দরজার দিকে, সামান্য-একটু কৌতূহল নিয়ে, ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যও তাকানোর উৎসাহ থেকে আমরা আপাতত মুক্ত, হয় আমাদের সময় নেই, নয়তো আমরা ক্লান্ত, বালিশে মাথা রেখে ঘুমোতে চাই আমরা।

'আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে'

সম্ভবত ১৯৪৯ সাল, কোনো-এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় জীবনানন্দের বাড়িতে আমরা কয়েকজন। সব অবস্থায় ভিড় দেখে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষটি, অন্তরঙ্গদের সান্নিধ্যে নিজেকে, অন্তত খানিকক্ষণের জন্য হ'লেও, প্রসারিত ক'রে তৃপ্তি পেতেন। এ-কথা থেকে সে-কথা, এরকম কোনো কথার প্রসঙ্গের ভিতরে ঢুকে গিয়ে তোরঙ্গের অভ্যন্তর থেকে লাইন-টানা একটি এক্‌সারসাইজ খাতা বের ক'রে নিয়ে এলেন।

আগাগোড়া পেন্‌সিলে লেখা অনেক-অনেক কবিতার পাণ্ডুলিপি। কাটা-ছেঁড়া-বহুসংশোধিত। এরই মধ্যে, দ্বিধাজড়িত, বিশেষ-একটি কবিতা আমাদের পড়তে অনুরোধ জানালেন: 'এটা কি চলবে? ছাপতে দিতে পারি?'

পেন্‌সিলে লেখা, দু'-এক জায়গায় শব্দ বা শব্দাংশ মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম, কারণ আরো অন্তত দশ বছর আগে নাকি কবিতাটি রচিত। জীবনানন্দের বাড়ির আধো-উঠোন আধো-বারান্দার স্তিমিত আলো। ঘরের মধ্যে আমরা, সেই অন্ধকারের গর্ভে ফের বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য ত্রস্ত-অবসন্ন আকৃতির কথামালা পড়লাম। 'হে নর, হে নারী, / তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন; / আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই। / যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ, / সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ অনন্ত আকাশ-গ্রন্থি / শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে, / শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর; এইসব ভয়াবহ আরতি! / গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত; / আমাকে কেন জাগাতে চাও? / হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া, / আমাকে জাগাতে চাও কেন?'

অন্ধকারের মহাকবিতা, নিজের কাছে চুপি-চুপি আড়াল ক'রে রেখে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ, কী বলতে চাইছেন তিনি, তা ঠিক বলছেন কিনা তা নিজেই যেন জানেন না। সত্যিই কি ধানসিড়ির কিনারে শুয়ে থেকে অনব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠবার বাসনা স্তিমিত হয়ে এসেছিল, পৃথিবীর 'ভয়াবহ আরতি' অবলোকনে তিনি স্তম্ভিত, জাগবার, জানবার অবিরাম ভার থেকে মুক্তি পেতে উত্তীব্র-উৎসুক? কিন্তু এই মানুষই তো পেঁচার তুমুল গাঢ় সমাচারে কান ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নায় বিভোর থেকে বিভোরতর জীবনের প্রচুর ভাণ্ডার লুণ্ঠনে তাঁর অন্তহীন আসক্তির কথা অজস্র কবিতার শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস-রোদ-

মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশের স্তবস্তোত্র গেয়েছেন, এক অনাম্নী অথচ অনস্পষ্ট, দয়িতাকে সেই প্রথম প্রত্যয়ের মুহূর্তে অকপটে নিবেদন করেছেন : 'তুমি তো জান না কিছু, না জানিলে,—/ আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে !'

আমরা এখন আর ঘোরের মধ্যে নেই, আরো প্রায় চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত, জীবনানন্দের মর্মান্তিক মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে সময় তিন যুগ পেরিয়ে এসেছে। এখন স্বীকার করতে অনুশোচনাবোধ আছে হয়তো, কিন্তু অহংবোধ নেই, তাঁর জীবদ্দশায় কেউ-ই আমরা তাঁকে বুঝতে পারিনি। 'কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে ; / মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি / কেউ দেয়—বিনি দামে—তাতে কার লাভ— / এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।' এখন মনে হয়, এটা তাঁর পূর্বরঙ্গ, মানুষটি জানতেন, যেন জানতেন সমস্যা তাঁর নয়, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা-দ্বন্দ্বের হাত থেকে তিনি রেহাই পেয়ে যাবেন, কারণ ইতিমধ্যেই তো 'মৃত্যুর ওপার' তাঁর সত্তার চৈতন্যে ছায়া ফেলে গেছে। যন্ত্রণা আমাদের, এখন আমরা বলছি, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম, আর কেউই তাঁর মতো বাংলার হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে যেতে পারেননি, লক্ষ কবির রাজ্য এটা, কিন্তু, এখন আমরা বলছি, জীবনানন্দকে পেরিয়ে আমাদের অন্য-কোনো আনুগত্য নেই। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে অন্য কথা বলেছি আমরা, যেহেতু অজ্ঞ আমরা, অশিক্ষিত আমরা, অসহিষ্ণু আমরা, তত্ত্বসর্বস্বতায় মগ্ন আমরা। প্রায়ই প্রতিহত হয়ে এসেছি তাঁর কবিতা থেকে, অনুযোগ জানিয়েছি কেন তিনি হঠাৎ আমাদের পূর্বপরিচিত 'নির্জনতম কবি'র পরিভাষা থেকে স'রে এসেছেন, কেন তাঁর চিত্ররূপকল্প পাল্টে যাচ্ছে। আমরা মাথা খুঁড়ে মরেছি জানবার জন্য, কোন্ নতুন সংজ্ঞার উপত্যকায় তিনি আমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, যে-অভিনব দর্শনের ইঙ্গিত তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কবিতার পংক্তিতে-পংক্তিতে বিকিরিত, তা মায়া না মতিভ্রম ? এবং এই এতগুলি বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর, হয়তো এতগুলি বছর পেরিয়ে গেছে ব'লেই, এখন আমাদের বিবেচনায় সাবালকত্ব এসেছে। বিশের দশকের উপান্তে, কিংবা তিরিশের দশকের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে, সজনীকান্ত দাস যে-ভুল করেছিলেন, চল্লিশের দশকে কিংবা পঞ্চাশের দশকের সূচনায় প্রায় সে-ধরনের ভুলই আমরা অনেকে করেছিলাম। ইতিমধ্যে বড়ো জোর বাংলা ভাষার সমালোচনার গদ্যে কিছু বাড়তি শালীনতা এসেছিল, কিন্তু তেমন-কোনো চিন্তার গাম্ভীর্য অনুপ্রবেশ করেনি।

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'। অথচ এই দ্বন্দ্বোপাখ্যানই কবিকাহিনী। হায়, যদি নিজের মনে কবিতা লিখে, তারপর সেই কবিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যেত অনন্তকাল, সেই কবিতাকে ভুলেও থাকা যেত অনন্তকাল। কারণ কবিতাই তো যন্ত্রণা, কবিতা প্রেম, কবিতা উদ্বেগ, কবিতা সামঞ্জস্য, অথচ সেই সঙ্গে অসামঞ্জস্যও। কখনো সুষমার আনন্দবোধের প্রকাশ

তা, অথচ, অন্য-কথনো, কিছু মিলছে না-কিছু মেলানো যাচ্ছে না প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, জীবনযাত্রার অসংগতির সঙ্গে, সমাজপ্রবাহের অসংলগ্নতার সঙ্গে বিবেককে-বোধকে-আবেগকে মেলানো যাচ্ছে না, অতএব কবিতা জন্ম নিচ্ছে। 'সকল লোকের মাঝে ব'সে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা ? / আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ? / আমার পথেই শুধু বাধা ?' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, জীবনানন্দ প্রস্তুত হচ্ছিলেন, প্রেম-অপ্রেমের দ্বন্দ্বে তিনি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলেন, 'সে আগুন জ্বলে যায় / সে আগুন জ্বলে যায় / সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু'। তাঁর উত্তরদহনের অন্বেষণ একটি অসমাপ্ত অধ্যায়, জীবনজিজ্ঞাসার ছাই উল্টে যা চোখে পড়ে তাতে বোধ অথবা আবেগের সায় নেই, তাই হাৎড়ে যেতেই হয়। নিঃসঙ্গ প্রব্রজ্যা এটা, একাকী প্রব্রজ্যা, কারণ জলের মতো ঘুরে-ঘুরে যে একা কথা কয়, তাঁর নিভৃত সংকেত হাটের পরিভাষার সঙ্গে মিলবে না, এই একাকিত্বের যন্ত্রণার কোনো গতি নেই। কিন্তু এটা তো শুধু পারিভাষিক সমস্যা নয়, সামাজিক যন্ত্রণাও তো তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। কবিতা যদি মেলানোর অভিসার হয়, অমিলের উদ্ভট অসমতাও তো কাব্যের শরীরে উপস্থিত হয় সংকটাপন্ন আর্তি-বেদনাবোধ হিশেবে। 'স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্রসাধারণ / চেয়ে দেখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে / আরো বেশি কালো-কালো ছায়া / লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে / মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিশেব ডিঙিয়ে / নর্দমার থেকে শূন্য ওভার-ব্রিজে উঠে / নর্দমায় নেমে— / ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে / নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে। / এরা সব এই পথে ; / ওরা সব ওই পথে—তবু / মধ্যবিত্তমদির জগতে / আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে'। সমুৎপন্ন সামাজিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই আত্মবিদ্রূপ, কারো-কারো মনে হ'তে পারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পৃথিবী থেকে, বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখের আশ্রয়অলিন্দ থেকে, বহুদূর স'রে এসেছিলেন জীবনানন্দ। এ ধরনের মনে হওয়াটাই ভুল, কারণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্ব থেকেই তো তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের উথালপাথাল বোঝাপড়ার ঋতু শুরু—'হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল ? / বাল্‌টিতে টানি নি কি জল ? / কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে ?'

বাংলাদেশের আপাতনিস্তরঙ্গ মফস্বল শহরে, নিজের মনের পটে আঁকিবুকি কাটতে-কাটতে যে-মানুষ কবিতা মক্সো করতে শুরু করেছিলেন, রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার রঙ্ নিয়ে চিন্তা ক'রে নিজেকে যিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন, কান্তারের পথ ছেড়ে, সন্ধ্যার রূঢ় অন্ধকারে, তাঁকেও বাইরে থেকে কেউ এসে নির্দয় নির্দেশ জানায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে, দেশভাগ হয়, সংসার ছত্রভঙ্গ, অভ্যস্ত নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশ থেকে নির্বাসিত, অনেক রক্তের প্লাবন,

অনেক অশ্লীল হিংসার আস্ফালন। কবি স্তম্ভিত, কবি লাঞ্ছিত, উৎপাটিত-উৎপীড়িত। কোন্ গর্তে লুকোবেন, লুকোবার মতো গর্তও তো আর অবশিষ্ট নেই। জীবনানন্দের কাব্যে হরিণের প্রতীক বার-বার ফিরে এসেছে, এবং তাঁর অন্তর্লীন বেদনাবোধের চিত্রকল্প হিশেবে আমি শরবদ্ধ হরিণশিশুর হার্দ্যতার কথাই মনে আনতে পারি। এক অভিমানী আহত বিস্ময় তাঁকে শেষের কয়েকটি বছর কুরে-কুরে খেয়েছে। সংশয়. তা হ'লে অন্ধকারই একমাত্র সারাৎসার, অন্ধদের আচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর নির্ভরশীত থাকতে হবে আমাদের, সময়ের কুয়াশায় পৃথিবীর ভাঁড়ার থেকে হেমন্ত অবলুপ্ত, আর কোনো-দিন সেই সোনালি সূর্যের স্নিগ্ধতায় ফিরে যাওয়া যাবে না, তিমিরবিনাশে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই তিমিরবিলাসী? আমাকে এখনো তাড়া ক'রে ফেরে ১৯৯৯ সালের সেই গ্রীষ্মসন্ধ্যায় জীবনানন্দের উদ্‌ভ্রান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত প্রশ্ন: 'এই কবিতা কি ছাপতে দেওয়া যায়?' যেন ঘুরিয়ে আমাদের কাছ থেকেই জানতে চেয়েছিলেন 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুব মতো' মিশে যাওয়ার বাইরেও অন্যতর সত্য এখনো অপেক্ষা ক'রে আছে কিনা।

ঐ মুহূর্তে বাংলার অধিকাংশ সমালোচক জীবনানন্দের উদ্‌ভ্রান্ত জিজ্ঞাসার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে অসফল হয়েছিলেন, এমনকি আমার মতো আরো যাঁরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'বনলতা সেন'-এর মুগ্ধতার মৌতাতে বিলীন ছিলেন, তাঁরাও। এক প্রতীকী সন্ধাভাষার পৃথিবী থেকে যেন আরেক সংকেত-রহস্যের পৃথিবীতে, এক দর্শনের আবহলোক থেকে অন্য-এক দর্শনের আলোক-বলয়ে, আমাদের পরিচিত তেপান্তর থেকে কুয়াশা-জড়ানো সন্ধ্যালগ্ন আবিষ্ট অন্য এক অচেনা প্রান্তরে জীবনানন্দ দু'-হাতে বাধা ঠেলে যেন এগোতে চাইছেন, অথচ দ্বিধা, দ্বিধা তাঁর সকাতর প্রশ্নে, ভাষাতে-অভিব্যক্তিতে দ্বিরাচরণ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশ, কেউ-কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ-কেউ বিজ্ঞের মতো ফতোয়া জারি করেছি, কবি হয় পলায়নপর, অথবা নির্বাপিত। এই এতগুলি বছরের ব্যবধানে, আমাদের জ্ঞানশলাকা যেহেতু বিলম্বে উদ্দীপ্ত, বুঝতে পারি কোনো অসংগতিই ছিল না, জীবনকে, সমাজকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কোনো কবিরই নেই, জীবনানন্দেরও ছিল না। এমন কি বরিশালের শান্ত অতলনির্জন পরিবেশে যখন তিনি বনহংস-বনহংসীর উপাখ্যান উত্থাপন করছিলেন, মনে ক'রে দেখুন, তখনো তো তাঁকে পিস্টনের শব্দে প্রতিহত হ'তে হয়েছিল। তারপর তো তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিভাসে পৃথিবী গভীরতর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেছে: 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ। / মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর; / যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল / মানুষের লালসার শেষ নেই; / উত্তেজনা ছাড়া কোনো

দিন ঋতু ক্ষণ / অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ / অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ / নেই। / কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর / সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো'। কিন্তু সেজন্যই, এমনকি কবিকেও শুভ রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর হ'তে হয়। কবিরও দায়বদ্ধতা, কারণ ইতিমধ্যে কবিও তো আবিষ্কার করেছেন আবহমান ইতিহাসচেতনা, ষড়্‌রিপু আক্রান্ত মানুষও দ্বান্দ্বিকতার বীজগণিতের বৃত্তবহির্ভূত নয়: 'তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে, মানুষের মন / জানে জীবনের মানে: সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন'।

দ্বান্দ্বিকতার কবি জীবনানন্দ, এবং এই দ্বান্দ্বিকতা একেবারে প্রথম থেকেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে জড়ানো। আমরা যাঁরা ভাষার কুহকে, উপমার মোহিনী-মায়ায়, প্রসঙ্গসংস্থাপনার পরাকাষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছিলাম, অধিকাংশই একচক্ষু আমরা, তাঁর ইতিহাসচেতনা আমাদের উপলব্ধির বাইরে থেকে গেছে। দেবী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন, 'প্রগতি' পত্রিকার সময় থেকে শুরু ক'রে, 'শনিবারের চিঠি'র অনবচ্ছিন্ন আক্রমণের ঋতু আদ্যন্ত বিহার ক'রে, তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের নানা আলোচনা-সমালোচনা সংগ্রহ ক'রে, এমনকি রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির চিঠিপত্র সংগ্রহ ক'রে তিনি প্রায় এক সর্বসম্পূর্ণ জীবনানন্দ-সংহিতা সম্পাদনা করেছেন। যে-ইতিহাস হারিয়ে যেতে পারতো, তা হারাবার ভয় রইলো না আর। দেবীপ্রসাদবাবুর প্রতি প্রকাশক তেমন সদয় হননি, বইটি ছাপানোতে অযত্ন চোখে পড়লো, বহু পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় বক্তব্য ও উদ্ধৃতভাষণ একাকার হয়ে গেছে, অন্য-কোথাও পাদটীকার সঙ্গে মুখ্য পাঠের ভেদাভেদ আদৌ রক্ষিত হয়নি। মনে হলো দেবীপ্রসাদ-বাবু প্রধানত উপস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন, অন্যরা কে-কবে-কী উক্তি করেছেন তার বিশদ বিবরণ বিধৃত করাকেই সম্পাদকের ভূমিকা হিশেবে বেছে নিয়েছেন, তাঁর নিজের মতামত তেমন বেশি জায়গায় উৎক্ষেপণের কথা ভাবেননি। যেন উপাচার সংগ্রহ ক'রে পৌঁছে দিতে পেরেই তিনি কৃতার্থ, এবার গবেষকরা এসে উপাচার সাজিয়ে পরবর্তী কর্তব্যে নিবিষ্ট হ'তে পাবেন, তাঁদের জন্য সব প্রস্তুত।

তা হ'লেও আরেকবার বলি, মস্ত উপকার করলেন দেবীপ্রসাদবাবু। বিশেষ ক'রে এই কারণেও করলেন যে তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনানন্দ-সম্পর্কীয় মন্তব্য আলোচনাদি প'ড়ে এখন প্রায় প্রত্যেকটিকেই ভগ্নাংশিক বিচার ব'লে মনে হয়, অন্যথা একদেশদর্শী, নয়তো সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতারহিত। সুভাষ মুখো-পাধ্যায় নিশ্চয়ই লজ্জা পাবেন এখানে গ্রন্থিত তিনি আজ থেকে পঁয়তিরিশ বছর আগে জীবনানন্দের উপর যে-ঢালাও মন্তব্য করেছিলেন তা প'ড়ে। আরো অন্য-অনেকেও অনুরূপ লজ্জা পাবেন তাঁদের প্রায়-নিরক্ষরতার পরিচয় হঠাৎ

এত বছর বাদে প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত হ'তে দেখে। তবে গ্লানিবোধের হয়তো কারণ নেই আমাদের। কালোত্তীর্ণ কাব্য তাৎক্ষণিকের জালে তার সম্মোহন নিয়ে সাধারণত ধরা পড়ে না, সমাজচেতনাকে কিছু সময় দিতে হয়।

আমার ব্যক্তিগত আক্ষেপ অন্যত্র। দ্বান্দ্বিকতায় আজীবন দীর্ণ জীবনানন্দ, নিজের প্রতিটি কবিতা বহুবার সংশোধন করতেন, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, শুদ্ধতর থেকে শুদ্ধতম সোপানে তাঁকে উত্তীর্ণ হ'তেই হবে। এমনও হয়েছে একই কবিতা তিনি, অতৃপ্ত, আগাগোড়া বহুবার নতুন ক'রে লিখেছেন। তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করেননি, তাঁর বিবেচনায় কবিতাটি শুদ্ধতম স্তরে পৌঁছয়নি, এমন অনেক রচনা তিনি তোরঙ্গে পুরে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'রূপসী বাংলা' নামে যে-কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত, তার অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ কবিতাই, আমার সন্দেহ, জীবনানন্দ তোরঙ্গেই রেখে দিতেন। পুনঃপৌনিকতা দোষে দুষ্ট এই কবিতামালা, বহুক্ষেত্রে প্রাক্-পরিমার্জিত, অসংস্কৃত। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বাংলাদেশের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট এ-সমস্ত কবিতা, এবং, অনেকে হয়তো তির্যক মন্তব্য করবেন, লোকরুচি বিচিত্রতর, কবিতাগুলি অসংস্কৃত ব'লেই তাদের এত হৃদয়গ্রাহিতা। এই প্রসঙ্গে আমার প্রতিবাদের ভাষা যদি স্তব্ধ ক'রে আনতেও হয়, অন্য-একটি বীভৎস অশ্লীলতার কথা সরবেই উচ্চারণ করবো। বাঙালি হৃদয়ে জীবনানন্দ অনুপ্রবিষ্ট, অতএব, অব্যাহতি নেই, জীবনানন্দের কবিতা আধুনিক গানে রূপান্তরিত, বাংলাদেশের নগরে-প্রান্তরে, মফস্বলে-পল্লীগ্রামে হারমোনিয়ামের নীরক্ত আর্তনাদ সহযোগে, সানু-নাসিক স্বরে, শুনতেই হবে আমাদের : 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে —এই বাংলায় / হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল-শালিখের বেশে'।

জীবনানন্দ, তাঁর অতি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে নিরাপদ আলাপচারিতার মুহূর্তে, কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। বেঁচে থাকলে, এবং এই গান শুনতে হ'লে, হয়তো বলতেন : উঁহু, শাখচুন্নির বেশে, সুরকার তথা গায়ক-গায়িকাবৃন্দের ঘাড় মটকাবার উদ্দেশ্যে।

তবে, ভরসার কথা, নির্বুদ্ধিতা অথবা রুচিহীনতার দৃষ্টান্তগুলি সাধারণত কালোত্তীর্ণ হয় না।

জীবনানন্দ দাশ : বিকাশপ্রতিভার ইতিবৃত্ত। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারত-বুক এজেন্সি। ৬০'০০ টাকা।

'কে বিদেসী বন-উদাসী'

বিবেকদংশিত হচ্ছি, এমন বলাও হয়তো এক ধরনের অসাধুতা, যেন তাতেই দায় সারা হয়ে গেল, আর কিছু করবার দায় নেই, ব'লেইছি তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে, আর কেন ঘাঁটাচ্ছো। কাগজে খবর বেরোয়, উত্তর অথবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোনো গণ্ডগ্রামে এককালের বিখ্যাতা লেখিকা হাসিরাশি দেবী চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কী একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়, ওঁকে সামান্য স্বস্তি দিতে হ'লে আরো কিছু আশু করা প্রয়োজন। কার পক্ষে প্রয়োজন, কে এই দায়িত্ব মাথা পেতে নেবেন? রাজ্য সরকার, ভাতার পরিমাণ আরো-একটু বাড়িয়ে, কিংবা অতিরিক্ত অন্য-কোনো ব্যবস্থাদি নিয়ে? কিন্তু রাজ্য সরকার তো সহস্র শিরঃপীড়ায় ভুগছেন। তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হ'লে বাইরে থেকে কাউকে-কাউকে উদ্যোগ নিতে হয়, একটু সময় ব্যয় করতে হয়; কিন্তু সে-সময় কারই বা আছে? তা ছাড়া, খোলাখুলি বলা ভালো, ক'জনই বা মনে রেখেছেন হাসিরাশি দেবীকে, তিনি তো, তাঁর প্রসিদ্ধির দীর্ঘ সময়েও, অগ্রগণ্য লেখক ছিলেন না। তারপর তো পঞ্চাশ বছর গড়িয়ে গেছে। আমাদের দেশে অভাবগ্রস্ত মানুষের তো অভাব নেই। জ্ঞানীগুণীদের মধ্যেও নেই, সরকার আর কতদিক সামলাবেন?

মানি, এই প্রশ্নগুলির যুক্তিতে ফাঁক নেই। ইতিহাসের প্রক্রিয়া বড়ো নির্মম। হাসিরাশি দেবী খুব দুঃস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন এই খবরে বিবেকদংশিত হবার মতো লোকের সংখ্যাও এখন প্রায় হাতের আঙুলে গোনা যায়। একটি যুগ অতিক্রান্ত, পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান সংস্থানে দাঁড়িয়ে হাসিরাশি দেবীর আর্থিক অসুবিধা নিয়ে বিলাপ করা বাড়াবাড়ি ব'লেই বিবেচিত হবে। আমরা তো সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলি, আমাদের প্রধান কর্তব্য আকীর্ণ সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে সতত সংগ্রামশীল থাকা। সুতরাং আমাদের আবেগকে নৈর্ব্যক্তিক হ'তে হবে। ঘুণধরা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় দুঃখদুর্দশা-শোষণ অত্যাচারের অবধি নেই। এরই মধ্যে যতটা সম্ভব আমরা এঁর-ওঁর-তাঁর জন্য একটু আলাদা ক'রে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করি। কিন্তু, মেনে নেওয়া ভালো, আমাদের প্রয়াসে নানা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবেই। সম্ভ্রমসম্মান-যোগ্য যাঁরা, অবশ্যই তাঁদের কাছে শ্রদ্ধার-কৃতজ্ঞতার উপচার নিয়ে হাজির হওয়া আমাদের মস্ত দায়। কিন্তু এখানে-ওখানে ভুলভ্রান্তি ঘটবে। একজন-দু'জন-

বাদ প'ড়ে যাবেন, কিংবা সবাইকে তাঁদের যথাযথ প্রাপ্য নিক্তি মেপে আনু-পাতিক হারে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। হাসিরাশি দেবীর মতো কেউ-কেউ, পুরোপুরি না হ'লেও, খানিকটা উপেক্ষিত থেকে যাবেন।

তা হ'লেও নিজের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে রোখ চাপে মাঝে-মধ্যে। হাসি-রাশি দেবী, তাঁর নামের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যই যেন, হাসির গল্প লিখতেন, বাচ্চাদের জন্য, বড়োদের জন্যও। এবং যতদূর মনে পড়ে, গাঢ় চীনে কালিতে, অনেকটা গগনেন্দ্রনাথের ধরনে, ছবি এঁকে নিজের লেখা গল্পকে চিত্রিত করতেন। তিরিশের দশকে এমনধারা অনেক গল্প রচনা করেছিলেন তিনি। সেই সময়-কার বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মদিরতার ছোঁওয়া ছিল উক্ত রচনাগুলিতে। পরাধীন দেশ, পৃথিবী জুড়ে আর্থিক মন্দা, ভয়ংকর বেকারসমস্যা। কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরোনো বাঙালি যুবক-সম্প্রদায় জীবিকার জন্য কখনো হন্যে হয়ে ঘুরছেন, কখনো সুভাষ বসুর ডাকে সাড়া দিয়ে কারান্তরালে চ'লে যাচ্ছেন, কখনো বা আরো-কোনো গভীর উন্মাদনার আবর্তে প্রবেশ ক'রে বোমা-পিস্তলের মধ্যবর্তিতায় দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার স্বপ্নে বিভোর হচ্ছেন। পাশাপাশি এঁরাই গল্প-কবিতাও লিখছেন, শিশির ভাদুড়ীর নাটক দেখে আপ্লুত হচ্ছেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় প্রফুল্ল ঘোষ হেদুয়াতে তিন চারদিন ধ'রে অবিশ্রান্ত সাঁতার কাটছেন, তার তারিফ করছেন, মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইনকে কী ক'রে একটু পাকাপোক্ত করা যায় সেই চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন, সি. কে. নাইডুর ব্যাটিংয়ের চমৎকারিত্বে মোহিত হচ্ছেন। তা ছাড়া, তাঁদের সমস্ত চেতনা জুড়ে, রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, সেই সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামও। জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালিদের অবস্থান তখনও ঠিক ফেলনা নয়। কলকাতার আইনজীবী সম্প্রদায়-কলকাতার চিকিৎসক সম্প্রদায় গোটা ভারতবর্ষে দাপটের সঙ্গে নিজেদের জাহির ক'রে বেড়াচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে কৃষককুলের ক্রমবর্ধমান খিন্নতার খবর একটু-একটু ক'রে যদিও চেতনায় চুঁইয়ে পড়ছে, তেমন বেশি নয়, জমিদারি প্রথা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর তখনো মধ্যপন্থী মতামত।

সেই বাংলাদেশে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল, অনেক মলিনতাগ্লানি, অনেক প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অন্যায়। অথচ ইতিহাসের প্রবহমান প্রব্রজ্যাকে অস্বীকার করবার তো উপায় নেই। আমাদের শৈশব-কৈশোরের মানসিকতায় তো সেই সময়কার সমাজের পলিমাটিরই প্রলেপ। সেই মানসিকতাই তো এত পথ হেঁটে, এত ঘাট পেরিয়ে আমাদের চেতনাকে বর্তমান বিন্দুতে উপস্থিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লীগের আন্দোলন, দেশভাগ, শরণার্থী স্রোত, কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব। তারপর ধাপের পর অনেকগুলি ধাপ, আজ আমরা এই এখানে দাঁড়িয়ে, সামনে কী অপেক্ষা ক'রে আছে স্পষ্ট জানি না, পিছনে কী ফেলে রেখে এলাম তার কাহিনী ঝড়ে বৃষ্টিতে-কুয়াশায়-বিস্মৃতিতে প্রায় লেপে-

মুছে একাকার। আমাদের সন্তানেরা আপাতত গ্রহান্তরে আগ্রহী, পিতা-পিতৃব্যকুলের শৈশববৃত্তান্ত শোনবার মতো ধৈর্য তাঁদের নেই। যে-কোনো ধরনের অতীতবিলাসিতা তাঁদের অনেকের কাছেই হয়তো অযথা, প্রায় ক্ষমার অযোগ্য, সময়ক্ষেপণ।

সুতরাং, কাকে আর এখন বলা, আজ থেকে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে, মনে হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কোনো সংখ্যায়, হাসিরাশি দেবী একটি তির্যক ব্যঙ্গ-ছিটোনো লঘু ওজনের গল্প লিখেছিলেন, যে-গল্পে এক খলনায়ক, গলার সঙ্গে গামছা দিয়ে বেঁধে হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে, সেই হারমোনিয়মে বিকট শীৎকার তুলে, সেই শীৎকারের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়ে, খোলা গলায় দাপটের সঙ্গে রাস্তা কাঁপিয়ে, পাখিদের ভয়চকিত ক'রে নজরুলের গজল গাইতে ব্যস্ত : 'কে বিদেSী বন-উদাSী বাঁSের বাঁSি বাজাও বনে / Sুরসোহাগে তন্দ্রা লাগে কুSুম-বাগের গুলবদনে'। গীতমত্ত সেই খলনায়কের একটি ভাববিহ্বল ছবিও এঁকে গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন হাসিরাশি দেবী।

ঐ গল্পের, ঐ ছবির, নজরুলের পাড়া-মাতানো ঐ গানের পরিবৃত অনুলিখনের মধ্যে টইটম্বুর ছিল যে-রসাপ্লুতা, তার স্বাদ আমাদের এখনকার রুচিতে আর ধরা পড়বে না। কাজী নজরুল ইসলামের গানের মাদকতা এখন পুরাকাহিনীতে পর্যবসিত। অথচ তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার শহরে-শহরতলিতে, এমন কি ঠায় পাড়াগাঁয়ে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, দিনের ঝঞ্ঝাট অন্তত সেদিনের জন্য অবসিত, গৃহস্থ মানুষ নিজেকে একটু ছড়িয়ে দিতে চাইছে; তার গলায় সুর থাকুক না-থাকুক, সে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে হঠাৎ গাইতে শুরু করেছে: কে বিদেশী বন-উদাসী…। উচ্চারণে বিকৃতি ঘটতো, গজলের ঢঙ আনতে গিয়ে অনেকে হয়তো ইচ্ছা করেই বাঙালি জিভের চিরাভ্যস্ত শ-স বর্ণের উচ্চারণে ইংরেজি 'S'-এর আমেজ মেশাতেন, যা শুরু হতো চতুরালিতে তার সমাপ্তি ঘটতো মুদ্রাদোষে। হাসিরাশি দেবীর 'কে বিদেSী বন-উদাSী' অনুলিখনে সেই মুদ্রাদোষ নিয়ে নির্বিষ কৌতুক, যা এক ঝলকে সেই যুগের, সেই সময়ের, সেই বিশেষ শ্রেণীসংস্থানের পরিবেশ উপস্থাপন করে। এখন আর মনে আনতে পারি না, সম্পাদক জলধর সেন মশাই সত্যি-সত্যিই লেখিকার নাম রঙ্গভরে ছাপিয়ে ছিলেন কিনা: 'হাSরাS দেবী'; পরে কিন্তু গুজব রটেছিল সেইরকম।

পরাধীন দেশ, একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি ঘুণে-ধরা সমাজ, সেই সমাজের ক্ষণভঙ্গুরতার ইতিবৃত্ত, তার প্রতিস্বরূপ হাসিরাশি দেবীর 'বাঁSর বাঁSি বাজাও বনে' নিয়ে কৌতুক। ঐ সমাজব্যবস্থায় তেমন আনন্দের খোরাক ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। সীমিত সরঞ্জাম-উপকরণাদি থেকে নিজেদের তৈরি ক'রে নিতে হতো আনন্দরঙ্গকৌতুক, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের আনন্দ, সামনের দিকে তাকিয়ে যে অন্ধকার ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পায় না তার নিজের প্রতি

কটাক্ষ, আত্মজপ্রতিম পড়শীকে নিয়ে রঙ্গ। গানপাগল বাঙালি, রবীন্দ্রনাথের গান তখনো ঠিক শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রবাদিত আভিজাত্য পেরিয়ে ঘরোয়া হ'তে পারেনি, তা তখনো প্রধানত সায়াহ্নকালে কিশোরীকণ্ঠে 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে'-র গলা-সাধাতে আবদ্ধ, তবে ভুরি-ভুরি ডি. এল. রায়ের স্বদেশী গান পাড়া মাত করছে, এবং, সব-কিছু ছাপিয়ে, বাঙালি মধ্যবিত্তের নজরুলে-পাওয়া ঘোর, 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' জড়িয়ে ও অতিক্রম ক'রে, 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম'-এর অধ্যাত্ম অধ্যায়ের বুড়ি ছুঁয়ে তা শেষ পর্যন্ত ধাক্কা মেরে-মেরে নিজেকে হাজির করেছে 'সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুমবাগের গুলবদনে'র আবেষ্টনীতে।

কিন্তু কাল পাল্টেছে, পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো কাসুন্দিতে কারোরই তেমন আগ্রহ নেই। হাসিরাশি দেবী প্রায়-বিস্মৃত নাম। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের প্রয়োজনে যাঁরা লেখেন, তাঁরা হয়তো আরো পাঁচগণ্ডা নামের সঙ্গে, কোনো-একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে, হাসিরাশি দেবীর উল্লেখ করবেন। ভদ্রমহিলা আপাতত কিছুদিন প্রবচনের পাদটীকা হিশেবে টিঁকে রইবেন। তারপর, মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন 'কে বিদেশী বন-উদাসী'র এখনো উল্লেখ করেন, তাঁরা অপসৃত হ'লে, তাঁর নামও ধুয়ে-মুছে যাবে, প্রমাণিত হবে ইতিহাস নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক, আবেগউত্তাপহীন। ইতিমধ্যে, শারীরিক অর্থে, চব্বিশ পরগনার সেই গ্রামে, হাসিরাশি দেবী আরো হয়তো কয়েকটা বছর বেঁচে থাকবেন। হয়তো তাঁর আর্থিক দুর্গতি লাঘবের কোনো চেষ্টাই হবে না, কিংবা হয়তো বিবেকপীড়িত কেউ-কেউ নিছক নিজেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর ক'রে, নয়তো ফের রাজ্য সরকারকে ধ'রে-প'ড়ে, ঈষৎ সুস্থিত ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাতে সামাজিক বাস্তবতার কোনো হেরফের ঘটবে না। যুগ পাল্টায়, যুগের ভিতর থেকেই যে অন্য যুগের উদ্ভব সেই ধারণার প্রতি নিষ্ঠাও অবিকল থাকে না। হাসিরাশি দেবীর নাম অবলীলায় আরো হাজারটি নামের সঙ্গে মিলে তাই একাকার হয়ে যাবে: ইতিহাস তো ভাববিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

মৃত্তিকাদুহিতা

আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি। গত চল্লিশ বছর ধ'রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে· আগ্রাসী রূপ দেখতে আমরা অভ্যস্ত। সেই দেশের শাসকশ্রেণীর হিংস্র-করাল রূপ, এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় আন্তর্জাতিক পুঁজির নেতৃত্বদান, খুঁজে-পেতে প্রতিটি মহাদেশের প্রতিটি প্রান্তে যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে, তাদের অভয় ও রসদ জোগানো. ভিয়েতনামের কলঙ্কযুদ্ধের হোতা, মারণাস্ত্রের সম্ভারে সারা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়িয়ে-বেড়ানো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামোল্লেখমাত্র আমাদের চেতনায় এ-ধরনের ছবিগুলি ভেসে ওঠে। ইতিহাসের গতি রোধ করতে চায় সে-দেশের সরকার, গরিব এখনো-অনুন্নত দেশগুলির স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর এই সরকার, এই সরকার সর্বদা আমাদের সর্বনাশ চিন্তা করছে, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির মদে মত্ত, হিংসা ও অপ্রেমের অন্ধকারে পৃথিবীকে শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করতে চাইছে এই সরকার। সব দেশের খেটে-খাওয়া নীড়ের-স্বপ্ন-দেখা শান্তিকামী মানুষ তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠায়, মার্কিন সরকারের কুটিল ষড়যন্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য প্রতিদিন শপথ গ্রহণ করে।

আমরা ভুলে থাকি, স্বাভাবিক নিয়মেই ভুলে থাকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অন্য-আরেকটি পরিচয় আছে, অন্য-আরেকটি ইতিহাস আছে। বর্তমানে প্রতি-ক্রিয়াশীলদের নায়কত্ব দিচ্ছে মার্কিন সরকার, অথচ মাত্র দু'শো বছর আগে উপনিবেশবাদকে রক্তাক্ত সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্মেষ। একটি বিশেষ বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক এই দেশ। এই দেশের শাসনযন্ত্র পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত, বিশ্বব্যাপী শোষণের পরিকল্পনায় গভীর নিমগ্ন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকেই, এই দেশের শাসককুল। অথচ টমাস পেইন কিংবা ওয়াল্ট হুইটম্যানের উদাত্ত বিঘোষণার জন্মও তো এই দেশেই, গত দুই শতক ধ'রে কাতারে-কাতারে কবি-মনীষী-চিন্তানায়ক-লোকপ্রেমিক জন্মগ্রহণ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তাঁরা ন্যায়ের বাণী শুনিয়েছেন পৃথিবীকে, বুদ্ধির মুক্তির কথা বলেছেন, মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ নিজেদের জীবন দিয়ে দৃষ্টান্তিত করেছেন, বিবেকের কাছে মৃত্যুভয় কী ক'রে বার-বার পরাজিত হয়, তার বহু প্রমাণ পৃথিবীকে দাখিল করেছেন। মার্কিন দেশের আপাতপ্রাচুর্য সত্ত্বেও পুঞ্জীভূত যে-নানা সামাজিক অনাচার-অসাম্য, তাঁরা প্রতিনিয়ত তার দিকে দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন, বিবিধ জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি অসুবিধার ভ্রূকুটি আগ্রহ্য ক'রে এ-সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, দেশবাসীকে সাহসের নতুন সংজ্ঞা শিখিয়েছেন। পৃথিবীতে আমরা যে-যেখানেই থাকি না কেন, কতিপয় মার্কিনি নাম আমাদের কাছে তো চিরস্মরণীয়: আপটন সিনক্লেয়ার, থিয়োডোর ড্রেইজার, ড্যাশিয়েল হ্যামেট, পল রোবসন, পল ব্যারন, পল সুঈজী।

এবকম আরো-একটি নাম এ্যাগনেস স্মেডলী। শ্রীমতী স্মেডলীকে আমরা অনেকেই মহাচীনের বিপ্লবের সূত্রধর হিশেবে জানি। অনুকম্পায়ী এই মার্কিন মহিলা তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে চীন দেশে পৌঁছন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রচণ্ড সংকটের সময় সেটা, কুয়োমিনটাংয়ের নির্দেশে প্রদেশে-প্রদেশে কমিউনিস্ট হত্যালীলা সংঘটিত হচ্ছে, সাম্যবাদী কর্মীদের শহরে-গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, কিছুদিন বাদেই মাও ৎসে তুংকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো আপাতত পশ্চাদপসরণ, হাজার-হাজার মাইল পথ হেঁটে অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে ইয়েনেন প্রদেশে পৌঁছে সেখানে নতুন ক'রে ব্যূহরচনার সংকল্প। বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার সময় সেটা, দুঃখের দিন, সংকটের দিন। সেই দুঃখের দিনে উদারমনা আদর্শবাদী এই মার্কিন মহিলা চীনের সাম্যবাদীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, চীনের নেতাদের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকে কৃচ্ছ্রভাগ ক'রে নিয়েছিলেন তিনি। চীনে কী ঘটছে বাইরের পৃথিবীর তা জানবার উপায় ছিল না: শ্রীমতী স্মেডলীই প্রথম, এডগার স্নোরও কয়েক বছর আগে, চীনের গহন অভ্যন্তর থেকে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধ'রে কমিউনিস্ট কর্মীবাহিনীর ত্যাগের-তিতিক্ষার-বীর্যের-ধৈর্যের-অঙ্গীকারের কাহিনী মার্কিন পত্র-পত্রিকায় লিখে পাঠাতে শুরু করলেন। কোনো শৌখিন ভাড়াটে রিপোর্টারের এলেবেলে দায়সারা লেখা নয়, এ্যাগনেস স্মেডলী তাঁর প্রতিটি রচনায় হৃদয়কে ঢেলে দিলেন, আদর্শে দীপ্যমান সে-সব রচনা, তাদের মধ্যে নিহিত একটি প্রধান, স্পষ্ট বাণী: যে-দেশেই আমি-আপনি জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি না কেন, গোটা মানবজাতির অঙ্গীভূত আমরা, সুতরাং যে-কোনো মানুষের বেদনা আমার-আপনার বেদনা, আমাদের প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন-শোষণ আমাদের উপরই প্রত্যক্ষ অত্যাচার, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো মুক্তিযুদ্ধ আমার-আপনার-প্রতিটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। শ্রীমতী স্মেডলীর পাঠানো চীন বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্বের সে-সব বিবরণ পাঠান্তে বহু দেশের সাধারণ মানুষ উদ্দীপ্ত বোধ করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের পরিপার্শ্বে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য বাড়তি প্রেরণা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, মস্ত আদর্শের-রোমাঞ্চে-ভরা দিন ছিল সেই সব।

কিন্তু, চীন বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর খ্যাতি অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে পড়েছিল ব'লেই হয়তো, এ্যাগনেস স্মেডলীর আরেক পরিচিতি বিস্মরণের কুয়াশায় অনেকাংশে আচ্ছন্ন। চীন পৌঁছুবার পূর্ব মুহূর্তে, আজ থেকে ষাট বছর আগে, ইওরোপে কিছু সময় অজ্ঞাতবাসে তখন তিনি, শ্রীমতী স্মেডলী একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা করেছিলেন, ভেবেচিন্তেই যার নাম দিয়েছিলেন: 'মৃত্তিকাদুহিতা' (Daughter of Earth)। উপন্যাসটি উপন্যাস হিশেবে কতটা সার্থক তা নিয়ে পণ্ডিতেরা বিবাদে মেতে আছেন, কিন্তু আমাদের মস্ত লাভ 'মৃত্তিকাদুহিতা' পাঠান্তে শ্রীমতী স্মেডলীর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনেক ইতিহাস আমরা জানতে পারি। সাধারণ শাদামাটা মানুষের দিনচর্যার কাহিনীর বহিরাবয়ব হয়তো দেশে-দেশে একটু আধটু আলাদা হয়, কাহিনীর সারাৎসার কিন্তু সর্বত্রই প্রায় একইরকম: সাধারণ মানুষকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, এই সংগ্রাম কখনো হতাশায় সমাচ্ছন্ন, সংকটে আপ্লুত, অন্য-কখনো তা সংঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল। অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে এ্যাগনেস স্মেডলীর শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর পিতা গোড়া থেকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত: প্রথম অবস্থায় ভাগচাষী, সেখান থেকে এক ধাপ নেমে ক্ষেতমজুর, অতঃপর জন্মস্থান কানসাস রাজ্য থেকে সপরিবার ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে প'ড়ে ঘুরতে-ঘুরতে, বহু ঝড়-ঝাপ্‌টার মধ্য দিয়ে গিয়ে, নিউ মেক্সিকো রাজ্যে খনি-মজুর। উপার্জন সামান্য, পরিশ্রম প্রাণান্ত, জীবনধারণের গ্লানি স্মেডলীজনককে মদ্যাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়, ফলে দুরবস্থা আরো বাড়ে, তাঁর সর্বংসহা মা বিবিধ উঞ্ছবৃত্তি মারফত কোনোক্রমে সংসার টিঁকিয়ে রাখেন। গ্লানি-ভরা এই শৈশবস্মৃতি; কিন্তু শ্রীমতী স্মেডলী ভবিষ্যতের পাথেয় হিশেবে পাশাপাশি দু'টি অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত হলেন: শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীশোষণের চেয়ে বড়ো সামাজিক সত্য নেই; নারীপীড়নও শ্রেণীশোষণ-উদ্ভূত সামাজিক ব্যাধি, শ্রেণীভিত্তিক লাঞ্ছনার শিকার তাঁর পিতা, গ্লানিবোধের তিক্ততা থেকেই নিজের স্ত্রীকে অন্যায়, অযৌক্তিক উৎপীড়ন করতেন। সুতরাং নারীমুক্তির অন্বেষায় ব্রতী হ'তে গেলে উৎসের অনুসন্ধান প্রয়োজন, নারীমুক্তির আন্দোলনকে বৃহত্তর, মহত্তর শ্রেণীসংগ্রামের প্লাবনের সঙ্গে যুক্ত না করতে পারলে সফলতা অসম্ভব। এ্যাগনেস শিক্ষালাভ করলেন তাঁর মাসির অভিজ্ঞতা থেকেও। বাড়ি থেকে পালানো মাসি, রেখে-ঢেকে বলার সার্থকতা নেই, তথাকথিত কুলটাবৃত্তি থেকে জীবিকা আহরণ করেন, কিন্তু তা হ'লেও স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন এই মাসি, অন্তত তাঁর একান্ত সংজ্ঞা-অনুযায়ী তিনি পরিপূর্ণ স্বাধীন, কারণ স্বেচ্ছায় তিনি নিজের জীবিকা বেছে নিয়েছেন, এবং তাঁকে কারো মুখাপেক্ষী হ'তে হয় না। মাসির এই যুক্তি আমরা মানি কি না মানি, শ্রীমতী স্মেডলী কিন্তু মাসির দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা পেয়েছেন: শ্রেণীসংগ্রামের পথই একমাত্র মুক্তির পথ, কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করবেন তাঁর স্বাধীন

সত্তা নিয়ে, যে-সত্তা সমষ্টিকে স্বীকার করবে, তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে নয়, সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষ উভয়েই শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে তাদের পারস্পরিক সমাধিকার বিসর্জন না দিয়ে।

কিন্তু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো কোনো-একটি দেশের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, এই আন্দোলনকে তো ব্যাপ্ততর করতে হয়, বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু জাতি-প্রজাতি মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, তারা সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদের অত্যাচারে শীর্ণ-বিদীর্ণ, তাদের মুক্তি না ঘটলে মার্কিন দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের চরিতার্থতা কোথায়। শ্রীমতী স্মেডলী অভিজ্ঞতার সোপান বেয়ে এগোলেন, আন্তর্জাতিক অনুকম্পাবোধে দীক্ষিত হলেন, তাঁর তখনকার কর্মক্ষেত্র ক্যালিফর্নিয়ায় বেশ-কিছু নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তাঁদের সংগ্রামকে তাঁর নিজের সংগ্রাম ব'লে বরণ ক'রে নিলেন, একাত্ম হলেন তাঁদের সঙ্গে। 'মৃত্তিকা-দুহিতা'র অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে এই ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচ্ছন্ন কাহিনী ছড়ানো, অন্যত্র উল্লিখিত টীকা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি এঁদের মধ্যে লালা লাজপৎ রায় ছিলেন, ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, ছিলেন অন্য-এক বাঙালি বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, একটি বিশেষ চরিত্রে সরোজিনী নাইডু অনুজ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও প্রতিবিম্বিত, যদিও তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী স্মেডলীর আলাপ আরো অনেক পরে ইওরোপ মহাদেশে। যা মুগ্ধ করে তা তাঁর শ্রেণীচেতনার তীক্ষ্ণতা। ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে দেশ মানে ধুলো-মাটি-কাঁকরের কণা, দেশোদ্ধার তাঁদের কাছে বিদেশী দখল থেকে মাতৃভূমি-নাম্নী মৃত্তিকামণ্ডল ছিনিয়ে আনা, মানুষের অধিকারের প্রশ্ন তাঁদের কাছে আপাতত গৌণ। 'মৃত্তিকাদুহিতা'র একটি ভারতীয় চরিত্র কথা বলছেন: 'জানো, আমি দেশপ্রেমিক, দেশের প্রতিটি ধূলি-কণাকে আমি ভালোবাসি, পূজা করি। আমি অসুস্থ, আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়বার আগে আমার এককাত্র আকাঙ্ক্ষা দেশে ফিরে দেশের মাটিকে শেষবারের মতো যেন চুম্বন করতে পারি। তুমি মার্কিন মেয়ে, তুমি হয়তো আমার এই অনুভূতি ঠিক বুঝতে পারবে না'। স্মেডলীরূপিণী মার্কিন তরুণীর উত্তর: 'আমিও দেশকে ভালোবাসি, দেশের মাটিকে ভালোবাসি, দেশের পাহাড়চুড়োকে, এমনকি মরুভূমিকে পর্যন্ত। অথচ দেশপ্রেমের যদি ব্যাখ্যা বানানো হয় দেশের সরকারকে ভালোবাসা, মন্ত্রীশাস্ত্রীদের ভালোবাসা, তা হ'লে সে-দেশপ্রেম আমার জন্য নয়। তাদের আমি ভালোবাসি না, ঘৃণা করি। কিন্তু দেশের মাটিকে ভালোবাসি, দেশের ক্ষেতখামার, যে-ক্ষেতখামার বিপ্লবের পর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অধিকারে আসবে'। বিভ্রান্ত ভারতীয় বিপ্লবীর প্রতিভাষণ: 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি যদি বিদেশে প'ড়ে থাকতে, আর তোমার দেশ বিদেশী দস্যুদের দ্বারা সততলুণ্ঠিত,

তা হ'লে তুমি কি দেশকে মুক্ত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হ'তে না? দেশের কথা ভাবতে না, দেশের পর্যুদস্ত মানুষদের কথা, দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা, দেশের সুমধুর ভাষার কথা?' মার্কিন তরুণীর শ্রেণীচেতনায় এতটুকু জড়তা নেই: 'হ্যাঁ, এ-সমস্তই ভাবতাম, কিন্তু, সেই সঙ্গে, যদি আমি কৃষক হতাম, জমিদারের শোষণের কথাও চিন্তা করতাম। যদি কারখানার শ্রমিক হতাম, সেই সঙ্গে মালিকের অত্যাচারের কথা।'

হঠাৎ আবিষ্কারের মতো, এ এক অপ্রত্যাশিত আলোকচিত্র, ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের চরিত্রের সারাৎসার এ্যাগনেস স্মেডলীর জীবনী-উপন্যাসে যা নিটোল ধরা পড়েছে। শ্রেণীচেতনায় নিজে অবিচল থেকেছেন এই মহিলা, কিন্তু আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের মমতা থেকে তা হ'লেও নিজেকে বিচ্যুত করেননি কখনো, পরাধীন ভারতবর্ষকে, কোনোদিন-চোখে-দেখতে-না-পাওয়া ভারতবর্ষকে, ভালোবেসেছেন, মায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছেন ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের। খাদহীন ভালোবাসা, কিন্তু হয়তো সময় আসে যখন মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, গণ্ডির নিগড় অতিক্রম ক'রে উত্তুঙ্গতর কোনো স্তরে উপনীত হ'তে চায়। হয়তো ভারতীয় বিপ্লবীদের শ্রেণীচেতনাবিযুক্ত ভাববিলাস তাঁকে আর আকৃষ্ট করতে পারে না, এমনও হ'তে পারে কোনো-কোনো ভারতীয় বিপ্লবীর ব্যক্তিগত আচরণ তাঁকে বেদনাবদ্ধ করে। 'মৃত্তিকাদুহিতা'র উপসংহারে আমরা শ্রীমতী স্মেডলীর ভারতীয় অধ্যায়ের অবসান দেখতে পাই, তারপর ইওরোপ, এবং সেখান থেকে বিপ্লবের ঘোর-লাগা মহাচীন। পরবর্তী সে-কাহিনী আমরা অনেকে আগে থেকেই জানি।

পৃথিবীতে কতকগুলি রহস্যের তো সমাধান নেই, বোধহয় সমাধানের প্রয়োজনও নেই। শ্রীমতী স্মেডলীর চলার পথের সঙ্গে কেন চীনের পথ মিশে গেল, কেন ভারতবর্ষের জনপদে তাঁর পদার্পণ ঘটলো না, অনুমান-অনুভবে তার খানিকটা ব্যাখ্যা হয়তো আমরা উপস্থাপন করতে পারি, কিন্তু কী লাভ এই হেঁয়ালির মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে? বরঞ্চ তাঁর এই উপন্যাসবর্ণিত জীবনবৃত্তান্তে আদর্শনিষ্ঠা ও শ্রেণীচেতনাবোধের প্রতি অবিচল আনুগত্যের যে-উদাহরণ দৃষ্টান্তিত হ'তে দেখি, তা থেকে যথাযথ শিক্ষাগ্রহণে অনেক বেশি সার্থকতা। সংঘবদ্ধ মানুষের আন্দোলন ইতিহাস রচনা করে, কিন্তু মানুষকে সংঘবদ্ধ হ'তে সাহায্য করে চিন্তার ঋজুতা, আদর্শের দৃঢ়বদ্ধ প্রেরণা। সাম্যবাদী আদর্শ দেশ-কালের শাসন মানে না, এ্যাগনেস স্মেডলী তাঁর জীবনযাপনের ইতিহাসে মধ্যবর্তিতায় আরো-একবার বিশ্ববাসীকে তা বোঝাতে পেরেছিলেন, এখন কিংবদন্তীর মতো মনে হয় সেই কাহিনী। অসাধারণ মহিলা, নারীমুক্তি আন্দোলনে অন্যতম-প্রধানা-প্রথমা-অসিধারিণী, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, অসামান্যা সাম্যবাদী কর্মী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনীয় অনেক বীভৎস অন্যায়ের আমরা

সরবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রে থাকি, ভবিষ্যতেও করবো। কিন্তু, তারই পাশাপাশি, বরেণ্য পথপ্রদর্শক প্রবীণ মার্কিন লেখকশিল্পীভাবুকবিপ্লবী যাঁরা-যাঁরা আমাদের প্রেরণা দান করেছেন, করছেন, তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধায় বিনম্র হবো, সাম্যবাদী আদর্শ এই কথাই বলে।

কলকাতার কণ্ঠস্বর

অতি বালক বয়সে, আজ থেকে সম্ভবত তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন বছর আগে, 'মৌচাক' পত্রিকায় কোনো-এক ফেরিওলাকে নিয়ে লেখা একটি গল্প পড়েছিলাম। লেখকের নাম এখন আর মনে আনতে পারি না, এমনকি কাহিনীর সারাৎসারও যে তেমন স্পষ্ট তা-ও নয়। কোনো-এক ফেরিওলা, গ্রীষ্মের ঘামে মালের ভারে ক্লেদাক্ত, সে জিনিশ রেখে গেল, কিন্তু কোনো কারণে তাকে জিনিশের দাম ধ'রে দেওয়া হলো না সেদিন, তারপর সে আর আদৌ ফিরলো না, কী হলো তার কে জানে, গল্পে বর্ণিত ছোটো শিশুটির মনে একটি অব্যক্ত কাতরতা, জীবনানন্দের ভাষায়, জলের মতো একা-একা ঘুরে কথা কয়।

এই তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন বছর বাদেও, সেই গল্পের স্মৃতিতে এখনো দহিত হচ্ছি, অথচ আরো হাজার-হাজার গল্প, যা এই অন্তর্বর্তী সময়ে পাঠ করেছি, হারিয়ে গেছে কোথায়, অবচেতনায়ও কোনো ছায়া প'ড়ে নেই। হয়তো এটা অন্যতম প্রমাণ, বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা ফেরিওলা প্রসঙ্গে তার রোমান্টিক উন্মুখতাকে এলিয়ে দেওয়ার, ছড়িয়ে দেওয়ার একটি মস্ত সুযোগ পেয়ে কৃত-কৃতার্থ বোধ করে। বোধ হয় একই কারণে, কাবুলিওয়ালার প্রসঙ্গে তার খাতক-মহাজনরূপী শোষকের রূপ ছাপিয়ে মেওয়া-বা-হিং-সওদাকারী হাস্যময় ছবি আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে : রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর প্রভাব এড়িয়ে পালাবো কোথায়? বাঙালি মধ্যবিত্ত তার গণ্ডিতে আবদ্ধ, তার দৈনন্দিন দিনযাপনে বিপুল সুদূরের সামান্যতম আশ্লেষ নেই, তার কাছে অন্য দেশ-মহাদেশের রস-শব্দ-গন্ধের শিহরণ, অন্তত কয়েক যুগ ধ'রে, বেশ খানিকটা পৌঁছতো ফেরিওলার মধ্যবর্তিতায়। চেনার সঙ্গে অচেনাকে মিলিয়ে দেয় ফেরিওলা, সে আমাদের ভীষণ পছন্দের মানুষ। পছন্দের অন্য-একটি কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত বিবেকের আর্দ্রতালক্ষণ। সামাজিক ব্যবস্থা বড়ো জটিল-কুটিল ব্যাপার, তা নিয়ে আমাদের মাথা না-ঘামালেও চলবে, গভীরে যেতে-টেতে বাপু আমাদের বোলো না, তবে এই যে লোকটা রোদে পুড়ে খাক হয়ে এসেছে, দু'দণ্ড আমাদের বারান্দার শীতলতায় দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম ঝাড়ছে, তার প্রতি মায়াপরবশ না হয়ে উপায় কী বলো।

আমরা বাইরে যে-বিচিত্রবিভিন্ন বৃত্তিধারী হই না কেন, ফেরিওলা প্রসঙ্গে তাই কিন্তু সবাই খুব কাছাকাছি চ'লে আসি। ফেরিওলাদের নিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই, মনে-মনে অন্তত, গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ ফাঁদবার স্বপ্ন দেখি।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মশাইয়ের প্রথম বই, 'কলকাতার ফেরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'-এর প্রকাশন অতএব যুগপৎ পুলকিত ও ঈর্ষান্বিত হবার উপলক্ষ্য ঘটালো। আমাদের আনন্দ, অবশেষে এ-ধরনের একটি বই সংযোজিত হলো বাংলা সাহিত্যে। আমাদের অসূয়াবোধ, হায়, আমি নিজে কেন এমন-ধারা একটি বই মক্সো করলাম না, মওকা পেয়ে গুপ্ত মশাই কেমন আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তা হ'লেও রাধাপ্রসাদবাবুকে অকুণ্ঠ অন্যবাদ, তিনি ফেরিওলাদের নিয়ে গ্রন্থরচনার বউনি ক'রে গেলেন, এবার কুঁড়েমি ঝেড়ে অন্য আর কেউ-কেউও যদি নেমে পড়েন, সবাই উপকৃত হই তা হ'লে, আমাদের আনন্দের পসরা বাড়ে। এবং যত বই-ই এর পর লেখা হোক না কেন, রাধাপ্রসাদবাবুর কাছে আমাদের ঋণ অশেষই থেকে যাবে, অগ্রবর্তী পুরুষ হিশেবে তাঁর কীর্তির উজ্জ্বলতা কিছুতেই ম্লান হবার নয়।

তবে সমস্যাও আছে। রাধাপ্রসাদবাবুর মানসমণ্ডলে দু'টি সত্তা পাশাপাশি একত্রবিরাজ করছে। প্রথমত তিনি রোমান্টিক, রাস্তার হাঁক এবং ফেরিওলার ডাক কিশোর বয়সে তাঁকে উতলা করতো, এখনো করে, করে ব'লেই এমন বই তাঁর কাছ থেকে আমরা উপহার পেলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ভয়ংকররকম প্রাক্তনবিলাসী, পুরোনো দিনের কথা তাঁর মনকে মাতায়, বিশেষ ক'রে তা যদি গত শতকের কোনো ব্যক্তি-বা ঘটনা-জড়ানো কথা হয়, কলকাতার কি বাংলাদেশের কি ভারতবর্ষের। সুযোগ পেলেই তিনি, তাঁর এই বিশেষ স্বভাব-গুণে, উধাও হয়ে যেতে চান পুরোনো দিনের প্রসঙ্গে। আমি কোনো অভিযোগ কিংবা অনুযোগ করছি না, চরিত্রলক্ষণ বর্ণনা করছি মাত্র। 'কলকাতার ফিরি-ওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ' বইয়ের মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা একশো ছাব্বিশ; তার মধ্যে প্রায় আটাত্তরটি পৃষ্ঠা পুরাতনবৃত্তান্ত, পূর্বসূরীদের রচনা-রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে পুরোনো কলকাতার পথকাকলির তথা কচ্ছপুটবাণিজ্যের বিবরণ। উনআশি পৃষ্ঠায় পৌঁছেই তবে রাধাপ্রসাদবাবু আত্মস্থ হন, নিজের স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে কলকাতার ফেরিওলার ডাক ও রাস্তার হাঁক নিয়ে নানা জমাট বিবরণ পরিবেশন শুরু করেন। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে, নিজের কথা বলতে গিয়েও মাঝে-মাঝে সুড়ুৎ ক'রে তিনি ফের এঁর-ওঁর-তাঁর স্মৃতিচারণে বিহার ক'রে আসেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা শরৎচন্দ্র মিত্র কিংবা অন্য-কারো। ফলে প্রায়শই রোমান্টিক রাধাপ্রসাদ গুপ্ত হারিয়ে যাবার উপক্রম হন, মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়েন ইতিহাসজ্ঞাপক তথা বিখ্যাত-বিখ্যাত নামের পাঁচালী শুনিয়ে ধাঁধিয়ে-দেওয়া রাধাপ্রসাদ গুপ্ত।

তাতে যে মজার বিয়োগ ঘটেছে খুব তা মোটেই নয়। রাধাপ্রসাদবাবু ইতিহাস-বর্ণনায় অনেকাংশে নির্ভর করেছেন অমৃতলাল বসু ও শশীচন্দ্র দত্তের রচনার উপর। তা ছাড়া, যেহেতু প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে তাঁর জুড়ি

নেই. তিনি জাতককাহিনী শুনিয়েছেন, প্রাচীন গ্রীসের নাগর ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ করেছেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারিসের রাস্তায় কোন্‌-কোন্‌ ধরনের রঙ্গলীলা-কেলেঙ্কারি অনুষ্ঠিত হতো তার বিবরণ দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লণ্ডনের রাস্তায় কী-কী ধ্বনি-প্রতিধ্বনি প্রতিদিন রচিত হতো 'ট্যাটলার' পত্রিকার প্রবন্ধ থেকে তার ফিরিস্তি শুনিয়েছেন। নানা বিদগ্ধজনের উক্তি-মন্তব্যে বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এমনকি 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকা থেকে এডমাণ্ড উইলসনের উদ্ধৃতি পর্যন্ত বাদ পড়েনি। লণ্ডন-বৃত্তান্ত উত্থাপন ক'রে রাধাপ্রসাদবাবু চ'লে আসেন ইংরেজদের পত্তন-করা শহর কলকাতার ফেরিওলা প্রসঙ্গে, অষ্টাদশ শতকের উপান্তে শুরু ক'রে তাঁর নিজের কিশোরবয়স পর্যন্ত যে-যে বিভিন্ন ধরনের ফেরিওলার কথা পুরোনো ছবিতে বা বইতে ধরা আছে, তা চমৎকার মজলিশি কায়দায় তিনি তুলে ধরেছেন। প্রায়-অপ্রতিরোধ্য-ভাবেই শুনিয়েছেন রাস্তার হাঁক এবং ফেরিওলার ডাকের সঙ্গে জড়ানো প্রাচীন কলকাতা পরিচয়, যে-কলকাতা ইংরেজদের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে, যার চোখের অঞ্জনে উপনিবেশের ঘোর। উনবিংশ শতাব্দীর সেই বিখ্যাত সামাজিক মহিলা, লোলা মনতাজ, তাঁর স্মৃতিচারণেও কলকাতার রাস্তাঘাট-ঘরবাড়ি-সমাজজীবনের উল্লেখ, পাল্কি-বওয়া বেয়ারাদের উল্লেখ, রাধাপ্রসাদবাবুর বর্ণনায় এক বিশেষ আমেজের অতীতরোমন্থন, পাল্কি-বওয়া বেয়ারাদের সম্মিলিত হাঁকের গুঞ্জন ('ইনি মোটেই ভারি নয় / খবরদার / ছোট বাবা মিসি খবরদার / চটপট নিয়ে চলো খবরদার /মিসি বাবা খবরদার')। একটু-একটু ক'রে কলকাতার, সেই সঙ্গে কলকাতার রাস্তার, চেহারা পাল্টাতে শুরু করলো, পাল্কির পর ঘোড়া-জোতা গাড়ির যুগ এলো, যার ছন্দের বুলি, ধাক্কু-নাবড়-হেঁইয়া-নাবড়, রাস্তাকে মুখরিত ক'রে তুললো। ক্রমশ একটু-একটু ক'রে কলকাতার পথ-গুঞ্জন বিচিত্রতর হলো, তপসে মাছের ফেরিওলা, হাঁসের ডিম বিকনেওলা, গোরা পল্টনদের ব্যাণ্ডের কুচকাওয়াজ, গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করতে যাওয়া গিন্নি-বান্নিদের পরচর্চার সঙ্গে ঠাকুরের স্তোত্র আওড়ানো, কুয়োর ঘটি তোলা, দেশ-লাইওলা, টিকেওলা, রিপুওলা, শাখা-সিঁদুরওলা, সন্দেশ-মোয়ার ফেরিওলা, দইওলা, বাত-ভালো-করা-দাঁতের-পোকা-বের-করার ওস্তাদ কারিগর, চুড়ি-খেলনা-সাবানওলা, বাসনওলা, শিশি-বোতল-পুরোনো কাগজওলা, ইত্যাদি কর্তৃক সৃষ্ট সম্মিলিত শব্দের ঐক্যতান, অবাক জলপান, চাই খেজুর রস, নয়তো আরো অনেক-অনেক চরিত্রের শব্দের কলতান, জাঁতা ও শিল কাটাইওলা, ধামা বাঁধাইওলা, মিশি নিবি গো, চাই পাউরুটি বিস্কুট, সাড়ে বত্রিশ ভাজা, নকলদানা, মনোমোহিনী চপ। রাধাপ্রসাদবাবু, এই পর্যন্ত অন্তত, পরের মুখে ঝাল খেয়ে আমাদের খাওয়াচ্ছেন, মাঝে-মাঝে ইতি-উতি অন্য-কোনো প্রাসঙ্গিকতায় চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর বিবরণে শাসনের আঁটুনি নেই, কিন্তু আমরা সব-মিলিয়ে মস্ত

মজা পাচ্ছি, তিনি নিজেও মজা পাচ্ছেন ব'লেই আমাদের মজাও দু'কূল উপচে উঠছে। তিনি যে-মেজাজে বৃত্তান্ত শোনাচ্ছেন, অপরের কাছ থেকে ধার-করা বৃত্তান্ত হ'লেও, ঠিক সেই মেজাজে আমরা যদি বইখানা নিয়ে প'ড়ে থাকি, পাতা ওল্টাই, পুরোনো কলকাতা ও অন্যান্য শহরের প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক যে-নানা ছবির সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে এই বইতে, তা তাড়িয়ে-তাড়িয়ে দেখি, উপভোগের অন্ত থাকবে না, রাধাপ্রসাদবাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতারও অন্ত থাকবে না।

আমার আক্ষেপের কারণ অন্য। বইয়ের অর্ধেকের বেশি পেরিয়ে যাওয়ার পর রাধাপ্রসাদবাবু তাঁর প্রত্যক্ষ স্মৃতিচারণে নেমেছেন। কটকের ছেলে তিনি, ছুটি কাটাতে কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যে কলকাতায় এলে শিবনারায়ণ দাস লেনে মামার বাড়িতে থাকতেন। তখন যে-সমস্ত রাস্তার হাঁক শুনেছেন, কিংবা ফেরিওলার দেখা পেয়েছেন, তাদের কথা একটু সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। হাইড্র্যাণ্ট খুলে ক্যানভাসের নল লাগিয়ে নজ্‌ল চেপে ধ'রে করপোরেশনের লোকদের কাকভোরে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ থেকে শুরু ক'রে আরো হাজারো শব্দের সংগীত, কোন্ উদাসী পুরুষ রাস্তায় গান গেয়ে যাচ্ছেন 'মন চল নিজ নিকেতনে', 'মাটি লিবি গো', 'চুড়ি লিবি গো', 'জুতা-সিলাই-জুতা-রু-উ-উ-স', 'চাই বরফ', 'বুড়ির মাথার পাকা চুল', 'মাদারিকা খেল', 'বাসুনে নাম লেখাবে', 'লেপের-তুলো-ধোনা ধুনুরি', 'কেক্-টেক্-টেক্-নো-টেক্ নো-টেক্-নো-টেক-একবার-তো-সি'খ্যাত পসরা-সাজানো চীনেম্যান, 'সাবান, তরল আলতা চাই', 'চুলের ফিতে কাঁটা চাই', 'হেজলিন, পাউডার, পমেটম চাই', চানাচুর গরমাগরম, সন্ধ্যালগ্নে শঙ্খধ্বনি, 'চাই বেলফুল, চাই জুঁইফুল', এমনি, অহোরাত্র, শব্দের প্রবাহ। রাধাপ্রসাদবাবু বলেছেন, এই সমস্ত-কিছুর কথাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর ঝোঁক বলুন, মুদ্রাদোষ বলুন, নিজের একান্ত স্মৃতিকেও তিনি কোনো প্রাক্তন পুরুষের বর্ণিত সুষমায় ভূষিত করতে ভালো-বাসেন, কোন্‌টা-দুধ-কোন্‌টা ঘোল গুলিয়ে যায়, পাঠকের কাছে একাকার হয়ে আসে। অথচ তাঁর স্মৃতিপটে অন্তত ষাট বছরের শব্দের ঐশ্বর্য, যা কলকাতা শহরের গত কয়েক দশকের বিচিত্র-জটিল ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর রসিক নাগরদের প্রসঙ্গ একটু কম উত্থাপিত হতো, রাধাপ্রসাদবাবু যদি তাঁর হঠাৎ এ-গলি ও-গলিতে সিঁধিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত করতে পারতেন, তা হ'লে পাঠকদের মস্ত লাভ হতো ; দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময় থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত যে-দুই যুগ, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান-আরোহণ-অবরোহনের সঙ্গে যে-সময়সীমার অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক, যার ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতার গৌরব-গ্লানিপরাভবের কাহিনী আলিঙ্গনসূত্রে বাঁধা, সেই ইতিহাসের কতগুলি মোটা সূত্র আমাদের করতলগত হতো। কলকাতার রাস্তার শব্দবিন্যাসের প্রবহ-

মানতার মধ্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস বিধৃত। হায়, রাধাপ্রসাদবাবু যদি ঊনবিংশ শতকীয় পরকিয়াচর্চা পেরিয়ে শুধুমাত্র নিজের স্মৃতিতে স্থিত হ'তে সম্মত হতেন, আখেরে কত বাড়তি পেতাম আমরা! রাধাপ্রসাদবাবুকে প্রায় ভেংচি কেটেই তাই বলতে ইচ্ছা করে, কেন যে করো বঞ্চনা দাসেরে।

নেমকহারামি করবো না। তাঁকে আরেকবার কৃতজ্ঞতা জানাবো বইখানা কষ্টস্বীকার ক'রে লেখবার জন্য। এই বই অন্য কী বই হতে পারতো সেই চিন্তায় কালহেলনে, আর যা-ই হোক, রাধাপ্রসাদবাবুর মন সম্ভবত ভেজাতে পারবো না। দু'টি অন্তিম নিবেদনে অতএব এই আলোচনার ইতি ঘটাবো। রাধাপ্রসাদবাবু নিজেই হয়তো আগ্রহবোধ করলে নতুন-একটি গ্রন্থ রচনা করতে পারেন, সেই সাইমন কমিশনের সময় থেকে শুরু ক'রে আইন অমান্য আন্দোলন-রাজবন্দীদের মুক্তি-চাই-পর্ব অতিক্রম ক'রে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-ছেচল্লিশের দাঙ্গা-দেশভাগ-শরণার্থী আগমনের সব-ক'টি ঋতু পেরিয়ে, ষাট-সত্তর দশকের আরক্ত অধ্যায়ের পরিশেষে আজ আমরা যে-কলকাতায় কোনোক্রমে স্বেচ্ছাবন্দী, তার ধারাবাহিক-ক্রমানুক্রমিক শব্দের ইতিহাস যে-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হবে। আর যদি নিজে এই কর্তব্যসম্পাদনে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন, তাঁর বিশ্বস্ত কোনো সখা বা সহচরকে যদি এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেন, সমাজের বড়ো উপকার হয়।

আমার দ্বিতীয় নিবেদন, এটা তো সর্ববিদিত, রাধাপ্রসাদবাবু সেই চল্লিশ দশকের গোড়া থেকে বহুদিন পর্যন্ত কলকাতার দুই প্রসিদ্ধ কফিখানায় অনবচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় আড্ডাশীল ছিলেন, মধ্যবিত্ত বাঙালির বুদ্ধিগত চর্চার অনেক উদাহরণ সেই সূত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। এই স্মৃতিও মহামূল্যবান। খুব বেশি মানুষ আর এখন নেই যাঁরা পারম্পর্য বজায় রেখে, খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক সাধনা যুক্ত ক'রে, এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে পারেন। রাধাপ্রসাদবাবু পারেন। তিনি করুন না কেন? আমরা আশেপাশে যারা বিক্ষিপ্ত আছি, কিছু-কিছু সম্ভার-উপকরণ-উপচার তাঁকে জুগিয়ে যেতে পারবো, আমাদের দিক থেকে নিষ্ঠার ত্রুটি হবে না, কিন্তু প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্যতর পুরুষ নেই। আশা করি তিনি অনুরোধটি রক্ষা করবেন।

রসাপ্লুত স্মৃতিচারণ

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মশাই গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাতাত্তর বছর অতিক্রম করেছেন; আমি মাত্র ষাট পেরোবো-পেরোবো করছি। কিন্তু এই প্রায় দেড় যুগের তফাৎ সত্ত্বেও তাঁর স্মৃতিচারণে আমিও এক বিশেষ রোমন্থনসুখের আকর খুঁজে পাচ্ছি। ঢাকা শহরে তিনি যে-সরকারি স্কুলের ছাত্র ছিলেন, আমি সেখানে ছাত্র ছিলাম না, আমার পড়াশুনা শহরের অন্য সরকারি স্কুলটিতে, কিন্তু বছরে দু'মাস তাঁদের যেমন 'বি টি স্যার'দের কাছে পড়তে হতো, আমাদেরও হতো, বিশেষত যেহেতু সরকারি টিচার্স ট্রেইনিং কলেজটি আমাদের স্কুলের যথার্থই ঘাড়ে চেপে ছিল, একই দালানের দোতলায় কলেজের অধিষ্ঠান—আমাদের আরমেনিটোলা স্কুল একতলায়—, শ্রদ্ধেয় ভবতোষবাবুর বর্ণিত পরিবেশ খাঁজে-খাঁজে আমার স্মৃতির সঙ্গে মিলে যায়। তা ছাড়া তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পড়েছেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজে, আমিও তাই; তিনি 'কমবিনেশন' বেছেছিলেন এম এল ইসি—ম্যাথামেটিকস্, লজিক, ইকনমিক্স্—, আমারও তাই; তাঁকে কলেজে লজিক পড়িয়েছেন অধ্যাপক রেবতীভূষণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমাকেও। ঐ কলেজে অন্যান্য যে-যে অধ্যাপকদের তিনি উল্লেখ করেছেন—প্রবোধ 'গান্ধি', প্রফুল্ল রায় প্রমুখ—, তাঁরা আমার কাছেও অতিপরিচিত নাম। ঢাকাতে ভবতোষবাবুরা ওয়ারি পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন, আমি প্রথমে আরমেনিটোলায় পরে বক্সিবাজারে, কিন্তু পাড়াগত গুণপনা ছাড়িয়ে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মফস্বলের আবহ তেমন কিছু পাল্টেছিল ব'লে মনে হয় না, অন্তত তাঁর বর্ণনা থেকে তাই মনে হয়। বিশের দশকের প্রথম ভাগ, তিরিশের দশকের শেষ ভাগ, সময় যেন মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। পরাধীন দেশে হয়তো এমনধারা দাঁড়িয়েই থাকে। যাঁদের কথা তিনি লিখেছেন, যে-ঘটনাবলীর উল্লেখ করছেন, আমার তো ভয়ংকর-রকম চেনা। লীলা রায়-অনিল রায়-শ্রীসংঘ, মেজর সত্য গুপ্ত-বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স, লোম্যান সাহেবকে গুলি ছুঁড়ে মেরে বিনয় বসুর স্থির পদক্ষেপে মিটফোর্ড হাস-পাতালের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে ধীর গতিতে রাস্তা পেরিয়ে পিকচার হাউসের পিছন দিকের দেওয়াল ডিঙিয়ে অন্তর্ধান, যে-কাহিনী কে পি সাহা মশাইয়ের ওষুধের দোকানের প্রত্যক্ষদর্শী কর্মচারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বহুবার-বলা-বয়ানে আমাদের শৈশব জুড়ে শুনেছি। 'এক গুলিতে দশ সাহেব মারবো' আমাদের কল্পিত-বিক্রম-অধ্যুষিত ছেলেবেলার খেলার সূত্রে যে-কাহিনী, ভবতোষবাবুর বইতেও

তার বিশদ উল্লেখ, স্কুলে তাঁর কয়েক ক্লাস উপরে বিনয় বসু পড়তেন, আর দীনেশ গুপ্ত তো তাঁর আকৈশোর বন্ধু ও সহপাঠী।

অবশ্য ঢাকার স্মৃতিচারণের আগে তিনি দৌলতপুর ও ময়মনসিংহের বাল্য-স্মৃতি পেরিয়ে এসেছেন। মানুষগুলি আমার ঠিক চেনা নয়, কিন্তু বাংলাদেশের মফস্বলের আদল তো শহর থেকে শহরান্তরে তেমন তফাৎ হতো না সেই মন্থর সময়ে, সুতরাং তাঁর বর্ণনার সঙ্গে নিজের স্মৃতিকে মেলাতে কোনও অসুবিধাই হয় না। ভবতোষবাবু ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষান্তে কলকাতা চ'লে এলেন। ইডেন হিন্দু হস্টেল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পূর্ণ আলাদা এক পৃথিবী তাঁর লেখায় উদ্ভাসিত। আমি মফস্বল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁর ঐ পৃথিবী আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক- ও কর্মজীবনে যাঁদের-যাঁদের সঙ্গে স্বদেশে-বিদেশে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই তো আমারও পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ, যে-সমস্ত ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন, পরে আমিও তো কোনো উপলক্ষ্যে বা উপলক্ষ্যহীনতায় সে-সব পথে বেড়িয়ে এসেছি, তাঁর উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা আমার অভিজ্ঞতারও অন্তত খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে। সুতরাং ভবতোষবাবুর বইটি হাতে পেয়ে আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে ফেলেছি, প'ড়ে যে-আনন্দ পেয়েছি তা স্কুল বা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব থেকে আহৃত আনন্দের সঙ্গে তুলনীয়। উপভোগের আনন্দ, স্মৃতির সড়ক ধ'রে শৈশব-কৈশোর-যৌবনে পুনরায় ঘুরে আসার আনন্দ, 'আট দশক' থেকে যা পেলাম। ভবতোষবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা না জানানো মহাপাতক হবে।

কিন্তু এই এতটা আনন্দ যে পেলাম, তার মস্ত বড়ো অন্য কারণ উল্লেখ করতেই হয়। এত সুন্দর ঝরঝরে বাংলা গদ্যের সঙ্গে বহুদিন মুখোমুখি হইনি। মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্তও ভবতোষবাবুর সামাজিক পরিচিতি ছিল অর্থনীতিবিদ্ ও শিক্ষক হিশেবে। তাঁর যে-সব লেখা ইতিপূর্বে পড়েছি, সবই ইংরেজি ভাষায় রচিত। কার্যক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পরেই তিনি বাংলাতে লিখতে শুরু করেছেন, এবং শুরু করেছেন ব'লে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁর ভাষা সহজ, স্পষ্ট, কোনো পণ্ডিতি নেই, কালোয়াতি নেই, অথচ সাহিত্যরসসম্পৃক্ত। তিনি আনন্দ ক'রে লিখছেন, লেখা ব্যাপারটা উপভোগ করছেন, সেই উপভোগ পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, কেন যে এতদিন তিনি বাংলাতে লেখেননি, এই ধরনের জিনিশ লেখেননি, তা নিয়ে পাঠকদের মনে আক্ষেপ-অনুশোচনা-অনুযোগ সঞ্চার করছেন। তাঁর লেখা যে সার্থক তা তাই আর অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 'আট দশক' এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে শেষ করেছি আমি, যা আগেই বলেছি· কিন্তু সেই এক নিঃশ্বাসের অন্তে তো দীর্ঘশ্বাস উচ্চারণ করতে হয়েছে আমাকে: হায়, উনি কেন আরো লিখলেন না,

এঁর-ওঁর-তাঁর কথা আরো-একটু বেশি ক'রে, এই-ঐ ঘটনার আরো গহনে গিয়ে ?

যিনি নিজের সম্পর্কে পর্যাপ্ত মিতবাক্, স্মৃতিচারণে অন্যদের কথাই বেশি বলা পছন্দ করেন, প্রসঙ্গক্রমে কিন্তু তাঁকে বাধ্য হয়েই নিজের কথাও কিছু বলতে হয়, ভবতোষবাবুও বলেছেন। শিক্ষকতাবৃত্তিকে ওতপ্রোতভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন তিনি। নিজের বৃত্তির প্রতি তাঁর অবৈকল্য ও নিষ্ঠা, পশ্চিম বাংলায় অন্তত, প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছেছে। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় জুড়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন, ক্লাসঘরে এবং ক্লাসঘরের বাইরে তাঁর বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা এই এতগুলি বছর ধ'রে ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমদের মুগ্ধ করেছে। শিক্ষকতা তাঁর কাছে নিছক বৃত্তি নয়, নেহাৎ ধর্মীয় কর্তব্যও নয়, শিক্ষকতার সঙ্গে তাঁর অনুরাগ-উপভোগের বন্ধন। অর্থনীতিতে অবশ্যই তিনি বিশ্লেষণ ও আনন্দের আকর পেয়েছেন, কিন্তু, আমার সন্দেহ, ভবতোষবাবু অন্য-কোনো বিষয়েও যদি অধ্যাপনা করতেন, তিতিক্ষায় কোনো হ্রস্বতা ঘটতো না। বিষয় নয়, বিষয়ীই প্রধান ; তিনি তাঁর আহৃত জ্ঞানসম্পদ্ ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে চান, এটাই তাঁর অন্তত ব্রত, তাঁর জীবন-জীবিকার সার্থকতা। বাংলাদেশের মফস্বল কলেজে তাঁর শিক্ষকতার শুরু। মধ্যবর্তী কয়েক বছর কলকাতার রিপন কলেজ, তারপর ইসলামিয়া কলেজের বুড়ি ছুঁয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ, যেখানে বহু বছর ধ'রে উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রী পরিবৃত হয়ে তিনি পড়ানোর নেশায় মেতে থেকেছেন। তাঁর উক্তি যদি মানতে হয়, দিয়েছেন যা, পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। শিক্ষকতার এই অভিজ্ঞতার কথা 'আট দশকে'র অনেকগুলি অধ্যায়ে বিস্তারে বর্ণিত, আমার মতো যারা ভবতোষবাবুর ছাত্র ছিলাম না অথচ ঘটনাক্রম একটু অন্যরকম হ'লে হ'তে পারতাম, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা প'ড়ে উঠি, তাঁর আনন্দ আমাদের মধ্যেও বিকিরিত হয়। যিনি পড়ানো ভালোবাসেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন, অবশ্যই তিনি অসম্ভব ছাত্রবৎসল হবেন। এটাও এখন প্রায় প্রবাদে ঠেকেছে, ভবতোষবাবুর ছাত্রবৎসলতার তুলনা নেই। 'আট দশকে'র বিভিন্ন অংশে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অজস্র উল্লেখ, যা না থাকলেই অবাক হ'তে হতো। ছাত্ররাই তাঁর গর্ব, তাঁর অহংকার, তাঁর যতটুকু বাগাতিশয্য তা ছাত্রদের প্রসঙ্গেই। প্রায় প্রত্যেকেরই প্রশংসায় ভবতোষবাবু পঞ্চমুখ, কাউকেই এতটুকু খাটো ক'রে দেখতে তিনি রাজি নন। ছাত্রবাৎসল্যের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে তাঁর স্বভাবঔদার্য। এই ঔদার্যের অবশ্য ঈষৎ একটি নেতিবাচক দিকও আছে। যেহেতু তিনি সব-সময় সব-কিছুর ভালো দিকটা দেখতে চান, ভবতোষবাবু যখন গ্রন্থ সমালোচনা করেন, অবিমিশ্র প্রশংসার মাত্রা একটু বেশি থাকে, ফলে ঘোর লাগে, বাইরের কারো পক্ষে মুড়ি-মুড়কির মধ্যেকার পার্থক্য যাচাই করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাঁর ছাত্রদের

গুণপনার উল্লেখেও অনুরূপ দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যা 'আট দশকে'ও স্পষ্ট। সবাইকেই প্রশংসা করছেন, সবাইকেই তুঙ্গে তুলে দিচ্ছেন, বাইরে থেকে আমরা যারা আড়ি পেতে শুনি, আমাদের একটু বিভ্রান্ত হ'তেই হয়। তা হ'লেও. চরিত্রমাহাত্ম্য থেকে স'রে আসার জন্য তাঁর কাছে নিবেদন পেশ করবো কোন্ অধিকারে, তাঁর ব্যক্তিত্বের কোনো খণ্ডিত প্রকাশ তো সম্ভব নয়।

আনন্দ ক'রে লেখা বই, আনন্দের সঙ্গে অনেক কাহিনী শুনিয়েছেন ভবতোষ-বাবু 'আট দশকে'। বহু বিখ্যাত অধ্যাপককে নিজের ছাত্রজীবনে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের কথা লিখেছেন ; অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত-শিক্ষাবিদ্-সাহিত্যিক-কবিকে অধ্যাপনাজীবনে সহযোগী হিশেবে পেয়েছেন, তাঁদের কথাও লিখেছেন। বিশ-তিরিশের দশকের আর্থিক মন্দা, কলকাতার মেসবাড়ি, বেকারী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু, জাপানী বোমার আতঙ্ক, সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, লণ্ডনে গবেষণাকালীন অভিজ্ঞতা, পরবর্তী কর্মজীবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন শহরে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা, আরো পরে দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে পরিচয় ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি। তেমন-কিছু অসাধারণ জীবনচর্চা নয়, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তা ও বাচনভঙ্গির প্রসাদগুণে উৎকর্ষের প্রকোষ্ঠে উন্নীত। তাঁর কর্মজীবনের সায়াহ্নে বেশ কয়েক বছর অধ্যাপনা থেকে স'রে এসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে হয়েছিল ভবতোষবাবুকে। এই বছরগুলির কথা কৌতুক ও অনুকম্পা মিশিয়ে একটি আলাদা অধ্যায়ে তিনি বলেছেন। তাঁর বর্ণনায় মজার রসদ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাধারণভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, এবং বিশেষত শিক্ষাব্যবস্থায়, পশ্চিম বাংলায় আমরা যে-সংকটের মুখোমুখি, সে-সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগের অভিব্যক্তিও ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

এবং এখানেই কতগুলি বৃহত্তর জিজ্ঞাসা আমাদের দীর্ণ করে। কোনো পর্বেই তো বাংলাদেশে মহান্ শিক্ষকের অভাব ঘটেনি, সমাজের চরম দুর্দশার মুহূর্তেও বেশ-কিছু অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী তাঁদের আদর্শে অবিচল থেকেছেন, শিক্ষার ও শিক্ষকতার মান ঊর্ধ্বে তুলে রাখবার প্রয়াসে অপরাপরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছাত্র-সম্প্রদায়কে উৎকর্ষের সারাৎসার সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছাত্রসম্প্রদায়কে আত্মোৎ-সর্গের প্রেরণা যুগিয়েছেন। বাংলাদেশের এই প্রোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক সুশোভন সরকার-অমিয়কুমার দাশগুপ্ত-ভবতোষ দত্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ। কিন্তু উৎকর্ষের অন্বেষণ ও লোকায়তের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আকৃতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সংঘাত ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে, সংঘাত থেকে সংশয়, সংশয় থেকে জটলা-ঘনঘটা, পিছনের দিকে কী ছিল তা যেন আমরা আর মনে করতে পারছি না, সামনের

দিকে কোথায় গিয়ে পৌছবো তা, মাঝে-মাঝে, আশঙ্কা হয়, আমাদের প্রত্যেকেরই অজানা। এই অবস্থায় শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে-গোছের দম্ভোক্তিরও তেমন মানে হয় না ; সমাজে অশান্তি যদি পরিব্যাপ্ত, গ্রন্থাগার তথাচ ছিমছাম-নিটোল-নিরিবিলি থাকবে তা অবাস্তব কল্পনা।

'আট দশক' গ্রন্থের শেষ অধ্যায় প'ড়ে মনে হয়, ভবতোষ দত্ত মশাইও এই আকীর্ণ সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তিত-বিষাদগ্রস্ত। পশ্চিম বাংলায় যা ঘটছে তা অধিকাংশেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরিণাম হিশেবেই ঘটছে। কিন্তু তা হ'লেও, কিছু-কিছু অগ্রগামী অধঃপাতের জন্য অন্যত্র অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে লাভ নেই। আমাদের অনেক স্খলন-পতনের জন্য আমরা, বাঙালিরা, নিজেরাই দায়ী, এবং রাজ্য সরকারের বাজেটে শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক দেশজ, প্রাকৃত রাহুর ছায়া। ভবতোষবাবুর চেয়ে সতেরো বছরের কনিষ্ঠ আমি, আমাদের সমাজদর্শনেও কিছু আড়াআড়ি আছে, সুতরাং সংকটের হেতু হিশেবে তিনি যে-যে বিষয়গুলির ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমার বিবেচনায় তা যেন একটু অসম্পূর্ণ, আমাদের আরো অনেক ভাবতে হবে।

চেতনাকে গড়ে জীবনধারা

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রচুর আলোচনা-অনুষ্ঠান হয়েছে গোটা বছর ধ'রে, কলকাতায়, ব্যাঙ্গালোরে, দিল্লিতে, অন্যত্র। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ জড়িয়ে নতুন আলোক-পাতের চেষ্টা হয়েছে, অনেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে, দিশি শিল্পপতিদের 'বোম্বাই পরিকল্পনা'র পাশাপাশি, তাঁর অনুপ্রেরণায়, 'জনতা পরিকল্পনা' রচনা করা হয়েছিল, জাতির আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কত সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা ঐ সময়েই করতে শুরু করেছিলেন, তার সাক্ষ্য বহন করছে যা। মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ নিয়েও নতুন ক'রে যথেষ্ট বাগ্-বিস্তার হয়েছে এ-বছর।

এই সমস্ত কিছুই প্রাসঙ্গিক। ইতিহাস লেখকদের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি মানবেন্দ্রনাথ রায় হয়তো এখনো পর্যন্ত যথার্থই পেয়ে থাকেননি, তাই জন্মের শতবর্ষপূর্তির উপলক্ষে যদি কিছু আবেগঘন উপচার এই মুহূর্তে নিবেদন করা হয়, তার যৌক্তিকতা ও শোভনতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে না। বর্তমান আলোচকের বিস্ময় অপরাশ্রিত। এত-এত আলোচনা হলো, বহুভাবে এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা হলো মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদ থেকে কতটা এবং কেন দূরে স'রে গিয়েছিলেন, অথচ কোথাও পরোক্ষ ইঙ্গিতেও বলা হলো না যে, তাঁর জীবন মার্কস-কর্তৃক আরোপিত সমাজসূত্রের উজ্জ্বলতম প্রমাণ। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে যদি তার পরিবেশ পাল্টায়, পরিবেশই সৃষ্টি করে মানুষের চেতনাকে, সত্তাকে: মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর জীবনের ইতিহাস দিয়ে এই কথাগুলি প্রমাণ করে গেছেন।

নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি পুরোহিতকুলের সন্তান নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাড়িতে হয়তো সংস্কৃত চর্চার, এবং সেই সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার, ঈষৎ ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তেমন ভয়ংকর কিছু নয়। প্রথাগত লেখাপড়া বিশেষ করেননি, প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ব্যায়াম সমিতির, ও তথাকথিত সন্ত্রাস-বাদীদের, মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তারপর একের-পর-এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বাঘা যতীনের দলের জন্য অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে চীন-সিঙ্গাপুর-যবদ্বীপে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক মুহূর্তে যে-নাটকের শুরু, শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে, দৃশ্য থেকে দ্রুত দৃশ্যান্তর, অঙ্কের পর অঙ্ক, অনেক পরিচয়ের পর্যায়

অতিক্রম ক'রে নরেন্দ্রনাথ পরিশেষে মানবেন্দ্রনাথ রায় হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যে-কোনো অবস্থাতেই নিজেকে তলিয়ে যেতে দেননি, নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ধাতস্থ করেছেন, পরিবেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, প্রতি পরিস্থিতিতে প্রমাণ করতে পেরেছেন মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর কীর্তি কতটা স্বীকৃত হবে, তা নিয়ে যদি আমরা মাথা না-ও ঘামাতে চাই, এক নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি নিছক নিজের নির্ভরে কোন্ স্তর থেকে অন্য-কোন্ স্তরে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারেন, তাঁর জীবন দৃষ্টান্তিত এই চমৎকারিতা আমাদের অভিভূত করে। তাঁর শেষ বয়সে দেরাদুনে, কিংবা ক্বচিৎ-কখনো কলকাতায়, মানবেন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন —পণ্ডিত, পরিশীলিত, বহুকলাপারঙ্গম, আভিজাত্যে অভ্যস্ত, বিশ্বনাগরিকতাবোধে উদ্দীপ্ত—, তাঁদের পক্ষে এমনকি কল্পনাতেও মেলানো মুশকিল ছিল যে, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে এই মানুষটিরই দিন কেটেছে দারিদ্র্য-ঘেঁষা জরাজীর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে।

তাঁর শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিশেবে মানবেন্দ্রনাথের রচনাবলী বিভিন্ন সূত্র ধ'রে জড়ো ক'রে এনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, শুভ সংবাদ এটা। আলোচ্য গ্রন্থ প্রস্তাবিত রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ড, মানবেন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের রচনা, ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত, এখানে অন্তর্ভুক্ত, সেই সঙ্গে সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়ের একটি দীর্ঘ ভূমিকা, এবং বাড়তি পাওয়া কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, এবং তার অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে, মানবেন্দ্রনাথের তিন-চার মহাদেশ জুড়ে বিচিত্র ভ্রমণবিহারের স্মারক হিশেবে তিনটি মানচিত্রও গ্রন্থটিতে জায়গা পেয়েছে। ১৯৩১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মানবেন্দ্রনাথ লেখালেখির কাজ যা-যা করেছেন, তা পরিমাণে প্রচুর, অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা গবেষকের পক্ষে সে-সব সংগ্রহ করা তেমন কঠিন নয়। কিন্তু তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনাদি কুয়াশার আচ্ছাদনে ছিল এতদিন, ছাপা ছিল না ব'লেই শুধু নয়, এ-সময়কার বেশ-কিছু লেখা স্প্যানিশ বা জার্মান বা অন্য-কোনো ভাষায়। বর্তমান খণ্ডে স্প্যানিশ থেকে অন্তত একটি মূল্যবান রচনা —১৯২০ সালে লেখা 'ভারত: তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' —ইংরেজি অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরো যা গ্রন্থিত হয়েছে তা প্রথম মহাযুদ্ধকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে লেখা খোলা চিঠির অখণ্ড পাঠ, এবং বিশের দশকে ইওরোপ থেকে থেমে-থেমে প্রকাশিত দু'টি পত্রিকাতে—দি ভ্যানগার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ও দি অ্যাডভান্স গার্ড—ছাপা-হওয়া কিছু-কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ। কমিনটার্নের ১৯২০ সালের অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ প্রতিনিধি হিশেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় ও উপনিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, একটি দু'টি প্রশ্নে

লেনিনের সঙ্গে মৃদু-মন্দ বাদানুবাদ হয়েছিল তাঁর, তারও একটি বিবরণ এই খণ্ডে সম্পাদক কর্তৃক সন্নিবিষ্ট।

লেখকজীবন আরম্ভ করার মুহূর্তে মানবেন্দ্রনাথ প্রথাগত কমিউনিস্ট, সুতরাং ভারতবর্ষের তৎকালীন আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে তাঁর বক্তব্যে তেমন-কোনো চমক নেই, যদিও রচনার প্রসাদগুণ মন আঁকড়াবার মতো। তাঁর সমসাময়িক অন্য অনেক ভারতীয় বিপ্লবী, এমনকি বিদেশে ব'সেও যখন জাতীয় সমস্যা নিয়ে লিখতেন, কূপমণ্ডূকতা এড়াতে পারতেন না। মানবেন্দ্রনাথ আশ্চর্য ব্যতিক্রম: প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তায় আন্তর্জাতিকতাবোধ দানা বেঁধে আছে, যা যে-কোনো সাম্যবাদে-শপথ-নেওয়া বিপ্লবীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। উগ্র রায়পন্থীরা জাতীয় ও উপনিবেশ সমস্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে লেনিন ও মানবেন্দ্রনাথের মতপার্থক্য বিষয়ে অনেক তত্ত্বকথা অনেক জায়গায় ফেঁদেছেন, কিন্তু সেই তফাৎ, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল প'ড়েও মনে হয়, প্রকাশভঙ্গির, ভাবনাধারার নয়: অন্য সর্বত্র মানবেন্দ্রনাথ দীক্ষিত কমিউনিস্টের মতোই লিখছেন, দেশপ্রেম, দেশের অভুক্ত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত-হৃতভাগ্য-অপমানিত লক্ষ-কোটি মানুষদের জন্য অনুরাগ, ছত্রে-ছত্রে উদঘাটিত। সুতরাং চিমটি খাওয়ার, অথবা কাটার, আশা নিয়ে যাঁরা গ্রন্থটি পড়তে আগ্রহী হবেন, কিছুটা নিরুৎসাহী হবেন তাঁরা।

সম্পাদকের ভূমিকাতে অবশ্য অন্য অনেক প্রসঙ্গ এসে গেছে। সেখানে মানবেন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ আছে, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত ব'লে যথেষ্ট পরিমাণে তা একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। কমিনটার্ন থেকে মানবেন্দ্রনাথ কেন অপসৃত হয়েছিলেন সে-বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আরো অনেক কথা বলা যেতে পারে। লেনিনের সঙ্গে মতপার্থক্য তেমন-কিছু মস্ত ব্যাপার ছিল না, এবং জার্মানিতে বিভেদ-পন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন ব'লেই তাঁকে চরম শাস্তি পেতে হলো, এই একক ব্যাখ্যাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। চীনে নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেছিল, যা মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কমিনটার্নকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে কট্টর রায়পন্থীদের ধারণা পুরো মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। দোষেগুণে মিলে মানুষ, যে-কোনো মানুষ, এমন কি বিপ্লবী মহাপুরুষও। ভিক্টর সার্জ, অ্যাগনেস স্মেডলি প্রমুখ সমসাময়িকদের লেখা থেকে অন্য যে-চিত্র আমরা পাই, তা থেকে মানবেন্দ্র-নাথকে ঠিক ধোয়া তুলসীপাতা ব'লে মনে হয় না। হয়তো কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝি, কিছুটা উভপাক্ষিক গোঁড়ামি, কিছুটা ষড়যন্ত্র, সব মিলিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে ১৯২০ সালের সেই অক্টোবর মাসে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতমকে শেষ পর্যন্ত দূরে চ'লে যেতে হলো।

বাদে 'বিচিত্রা'র আবির্ভাব, এরই মধ্যে, দমকা হাওয়ার মতো, 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-'প্রগতি'। পাশাপাশি, চরিত্রগত পরিবর্তন, সাহিত্যচর্চা আর জমিদার-শৌখিন আইনজীবী-উপরতলার আমলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না, নাম-গুলি উচ্চারণ করুন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ। বিকল্প কিছু নামও যদি উচ্চারণ করতে চান, যায় আসে না: বাঙালির মধ্যবিত্ত পৃথিবী, মধ্যবিত্ত সমস্যা, মধ্যবিত্ত ভাবনার আকাশ, মধ্যবিত্ত আবেগ, মধ্যবিত্ত ব্যঞ্জনা।

যেহেতু মধ্যবিত্ত ব্যঞ্জনা, বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার জন্য তার অপ্রতিরোধ্য আবেগ। একই সঙ্গে অনেকগুলি শৃঙ্গ জয় করার মতো উৎসাহ, সেই সঙ্গে দুর্মর আত্মবিশ্বাস। প্রতিভা আধার ছাপিয়ে উপচে পড়তে চাইছে, গল্পে-কবিতায়-নাটকে-প্রবন্ধে-উপন্যাসে, কখনো-কখনো এমনকি সংগীতরচনায় পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা অবশ্যই খানিকটা ছিল, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক দৃষ্টান্তিত উদাহরণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাওয়ার, রবীন্দ্রনাথকে স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে গ্রহণ ক'রে নিয়েও তাঁর সমকক্ষতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার অবিমিশ্র সাহসও। সেই সাহসে অধিকন্তু এক অলৌকিক শক্তির ভর। আভিজাত্যের অহমিকা-সঞ্জাত নয়, প্রগাঢ়-প্রশান্ত এক আত্মবিশ্বাস, যা সব ধরনের জড়তা-অবদমন ইত্যাদি ঝেড়ে-মুছে সর্বসমক্ষে উপস্থিত। ঐ তিরিশ-পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বশ্বাস সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা মরুবিজয়ের আস্বাদ আবিষ্কার করেছিল, কোনো-কিছুই তার সাধ্যের বাইরে ছিল না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। অনেকাংশে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মতো অশিক্ষিত পটুত্ব। পরিশীলনের ঐতিহ্য নেই, যা ছিল তা নিছক পরিবেশ থেকে আহৃত প্রেরণা। এবং সদ্য আত্মস্থতায়-পৌঁছনো মধ্যবিত্ত অহংবোধ: একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তাঁর আভিজাত্য নিয়ে নয়, আমরা শাদা-মাটারাও পারি, বেকারত্বের জ্বালায় ধুঁকছি যে-আমরা, খোলাচালের বস্তিতে জরাজীর্ণ অস্তিত্ব কাটাচ্ছি যে-আমরা, দিশি মদ আর ঠাসা আবেগের তথা আবেগহীন নিরাসক্তির সংশ্লেষণে চেতনাকে শাণিত করছি যে-আমরা, শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর আরূঢ় অভিমানে জর্জর যে-আমরা।

পান্টাপাল্টি ফেলে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা ক'রে দেখুন, মিল নেই, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মিল নেই, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মিল নেই, মিল নেই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তী অথবা প্রবোধকুমার সান্যালের। বিন্যাস-বিভঙ্গ-চিন্তার উৎক্ষেপণ ভীষণরকম আলাদা। কিন্তু, তা হ'লেও, যুগের সাযুজ্যে তাঁরা মিলিত, দায়বদ্ধ, জোটবদ্ধ। পুনর্জন্মের

গন্ধ-ঘেঁষা ফরাশি শব্দটিকে ভুল উচ্চারণে আমরা বাঙালিরা অজস্র ব্যবহার ক'রে থাকি, অথচ ঐ বিশেষ সময়ে যা ঘটছিল তা বাঙালি সংস্কৃতির কোনো পুনর্জন্ম নয়, সেই মুহূর্ত প্রকৃতপক্ষে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির জন্মলগ্ন। মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আকাশ, কিন্তু একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের তেপান্তর জয়ের অভীপ্সা, কোনো-কিছুই মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রত্যয়ের আয়ত্তের বাইরে নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই 'সাগর সঙ্গমে' বা 'পোনাঘাট পেরিয়ে'র পর ইলেকট্রনের তামাশা নিয়ে মাতছেন। 'আমি কবি যত কামারের যত মুটে মজুরের' দম্ভোক্তির পর 'স্টোভ'-এর মতো আশ্চর্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংগোপন একান্ত মানসিকতামথিত গল্প লিখছেন, 'কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু, আমরা যে মরতেও চাই' এই প্রগাঢ় দার্শনিকতায় নিজেকে উত্তীর্ণ করছেন, কিংবা হঠাৎ 'কবিতা' পত্রিকার অধ্যায় অতিক্রম ক'রে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে 'নিরুক্ত' সম্পাদনা করছেন, অথচ পরমুহূর্তে কল্পবিজ্ঞানে পৌঁছে যাচ্ছেন, শ্রীমতী এমিলিয়া ইয়ারহার্টকে নিয়ে ভাঙা উড়ো-জাহাজে ভর ক'রে রহস্যের কোন্ অপরামণ্ডলে উধাও হয়ে যাচ্ছেন, চকিতে মনে পড়েছে পরাশর বর্মা বা ঘনাদার কথা, কিন্তু গানের পৃথিবী, নাটকের রোমাঞ্চ, ছায়াচিত্রের হাতছানি, ইত্যাদি সব-কিছুও কেন অভিজ্ঞতার বাইরে থাকবে: বনপথে বিভীষিকা-বিঘ্ন, কিন্তু আমাদের বল্লমও যে তীক্ষ্ণ।

তিন ভুবনের কোনো পার নেই, মাত্র তিন-চার দশকের সংকীর্ণ সময় জুড়ে, বাঙালি মধ্যবিত্ত এই স্থির বিশ্বাসে নিজেকে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, এবং তাঁর সমসাময়িক আত্মজনেরা, সেই প্রত্যয়কে প্রজ্ঞায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ধরার সঙ্গে অ-ধরাকে মেলানো যায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পলোককে, কবিতার সঙ্গে বস্তির মালিন্যের রূঢ়তাকে, গানের সঙ্গে সমাজচিন্তাকে, অতি-গভীরকে অতিপরিহসনীয়ের সঙ্গে। এখন হয়তো সন্দেহ হবে, এঁরা সবাই ছিলেন আলাদা-আলাদা এক-একটি ডন কীহোট। কিন্তু, যেটা ভুলে যাওয়া মস্ত অনৈতিহাসিক বিচরণ, জোটবদ্ধ কীহোটপ্রবৃত্তি ব'লে কিছু থাকতে পারে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রেরা ঘোর সামাজিক পুরুষ ছিলেন, একটি বিশেষ সামাজিক বিকাশের প্রতিভূ। মধ্যবিত্তের একদা-নিগড়ে-বাঁধা মন, একবার অর্গলমুক্ত হয়েছে। অতঃপর, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, কোথায়ও তার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। কাজী নজরুল ইসলাম কীর্তন থেকে ইসলামী ধর্মসংগীত, ইমন থেকে গজল, ধ্রুপদ থেকে খেমটা, কোনো বিহার থেকেই নিজেকে নিরস্ত করেননি। রবীন্দ্রনাথের পরমসংহত নটীর পূজাকে ব্যঙ্গ করেছেন 'শ্যাম হে শ্যাম হে এবার নামো হে নামো কদম্বের ডাল থেকে' মস্করা ক'রে, উদ্ধত সাহসের পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন 'হাইদরে'র সঙ্গে 'নাই ডর' অথবা 'নাদির শা'-র সঙ্গে 'যা ঈর্ষা' মিল জুড়ে দিয়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রও অনুরূপ যথেচ্ছ ভ্রমণ করেছেন, খোরাসান থেকে বাদকাসান, সুগম্ভীর থেকে সারল্যে, সারল্য থেকে তারল্যে, সর্বত্র তিনি সাবলীল। কালের

অনুশাসনে হয়তো হারিয়ে যাবে এই সব পংক্তিগুলি, কিন্তু 'মেঘেরা যা কিছু আঁকিয়া যাক/জানি আকাশে কখনো লাগে না দাগ' অথবা, একই উচ্চারণের ভিন্নতর লিখন, 'কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,/কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ। আকাশ কি সব মনে রাখে', এমন দর্শনের দ্যোতনাঘন উচ্চারণের ঠিক পরমুহূর্তে 'কুসুম না যদি পাই, কাননে মানা তো নাই' আপাতসহজ এই ঘোষণার মধ্যে মিলিয়ে-থাকা যে-নিগূঢ়ার্থ, তার আনন্দ, তার কৌতুক, এমনকি তার বিষাদও এক পরম-গভীর প্রতিভার পরিচয় বহন করছে, বাঙালি মধ্যবিত্ত, এই শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কয়েকটি দশকে, ধ'রেই নিয়েছিল সেই প্রতিভায় তার অখণ্ড-অনায়াস অধিকার, সেই প্রতিভার পক্ষীরাজে চ'ড়ে সে দিগ্বিজয় করবে।

কিন্তু, না মেনে এখন উপায় কী আমাদের, সেই প্রতিভা ছিল বড়ো একপেশে, ঘরকুনো; মধ্যবিত্ত প্রজ্জ্বলন হয়তো বড়ো বেশি হাউইর লক্ষণযুক্ত, ক্ষণিকের ফুৎ-কার, তারপর মিলিয়ে যায়। সেই প্রতিভার সঙ্গে অক্ষৌহিনী প্রতিজ্ঞার যোগ ঘটে না কোনোদিন। বাঙালি অহমিকা বাঙালি সৃষ্টিক্ষমতাকে একটি স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, কিন্তু তার পর ঢল নামে, ইতিহাসের অনেকগুলি দুরূহ সম-কালীন প্রক্রিয়া, সামাল দিতে পারে না বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিকাঠামো। ডাইনে আনতে বাঁয়ে টান পড়ে। কোনো-একটা সময়ে, ইতিহাসের নিয়ম মেনে, ধস নামে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে যা নেমেছে পঞ্চাশের দশক থেকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রেরা একটি যুগ রচনা ক'রে গিয়েছিলেন, সেই যুগকে অতিক্রম করিয়ে অন্য উপত্যকায় বাঙালি চেতনাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়ভার তাঁদের ছিল না। একটি যুগ শেষ হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রদের তিরোধানে যা হলো আমাদের ক্ষেত্রে, এখন আপাতত শূন্যতার অন্ধকার, প্রতিভাহীনরা নিজেদের মাজা-ঘষার কৌশল দেখাবেন, আর্যাবর্তের প্রকোপ থেকে এমনকি শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকেও টিঁকিয়ে রাখতে বাঙালিরা সম্ভবত অসমর্থ হবে।

কেন এ-কথা বলছি? অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে, এক সায়াহ্নে, কনক বিশ্বাস গত হলেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কলকাতা দূরদর্শনে বিশেষ-বিশেষ খবরের প্রারম্ভ-বাচন: বন্যার খবর, মিজোরামের মন্ত্রিসভায় সংকটের খবর, কোন্ পণ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক শতকরা পঁচাশি ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা পনেরো করা হয়েছে সেই খবর। কনক বিশ্বাসের মৃত্যু, কলকাতা দূরদর্শনের পক্ষে, বিশেষ প্রারম্ভোল্লেখসহ পরিবেশনযোগ্য খবর নয়। কয়েক মিনিট বাদে 'আকাশবাণী'র স্থানীয় সংবাদেও একই সাংস্কৃতিক মানসিকতার পুনরাবৃত্তি, কনক বিশ্বাসের দেহান্তর প্রধান সংবাদ হিশেবে উল্লেখের যোগ্য ব'লে বিবেচিত নয়। কে কনক বিশ্বাস? একদা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন বুঝি?

যুগান্ত ঘটেছে, ঘটছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র-কনক বিশ্বাসদের আর মনে রাখবেন না কেউ। মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রতিভার যুগাবসান ঘটেছে। আপাতত অন্ধকারের

অশ্লীলতা, সেই সঙ্গে অশ্লীলতার অন্ধকারও। কে জানে, হয়তো আরো কয়েক দশকের ব্যবধানে, অন্য-কোনো সামাজিক স্তর থেকে বাঙালির পুনর্জন্ম ঘটবে। ইতিমধ্যে আপাতত জড়বুদ্ধির ঋতু। কে জানে, হয়তো এটাও ইলেকট্রনের তামাশা।

'হলো না, ছিল যা অবধারিত'

একটা সময়ে সমর সেন-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়দের সম্পর্কে অসম্ভব হিংসাবোধ ছিল আমার। অন্য-কোনো কারণে নয়, আমরা যখন থেকে যেতে শুরু করেছি, তারও বছর দশেক আগে, 'কবিতা' পত্রিকা শুরু হবার পর্বে, যেহেতু তাঁরা 'কবিতাভবনে' আড্ডা জমিয়েছিলেন। সেই আড্ডার স্বর্ণ-যুগের সঙ্গে তাঁরা জড়িত, আমাদের কাছে যা কিংবদন্তীর রূপ পেল। তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পরে আলাদা-আলাদা অথবা সম্মিলিত আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু তা তো অন্যতর আড্ডা, 'কবিতাভবনে'র সবচেয়ে সুন্দর সময়ের রেশ তো তাতে ছিল না। সেই কিংবদন্তীর মানুষগুলির প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার পরে সৌহার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। হয়তো সেজন্যই, আমার কাতরতার পরিমাণ অধিকতর: এই আমার চেনা মানুষগুলি, যাঁদের সঙ্গে সামাজিকতায় প্রতিদিন মিশছি, তাঁরা অথচ একদা এক স্বর্গরাজ্যে বিচরণ ক'রে এসেছেন, যেখানে আমি নিজে কোনোদিন যেতে পারবো না। এঁরা কত সৌভাগ্যবান, কিন্তু, জীবনকলার এমনই নিয়ম, এঁদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মেশামেশি সত্ত্বেও সেই সৌভাগ্যের কণাটুকু পর্যন্ত আমি সংগ্রহ করতে পারবো না, একের সৌভাগ্য অন্য ব্যক্তিতে তো আরোপ করা যায় না। পৃথিবীতে কিছু-কিছু অভাববোধ উপশমের বাইরে, সান্ত্বনার বাইরে।

আমরা যারা চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ঋতুতে 'কবিতাভবনে'র আড্ডার সঙ্গে যুক্ত হলাম, বরাবরই মনে হতো আমাদের, আমাদের চেয়ে এই এঁরা—সমর সেন-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়রা—অনেক বেশি ধীমান ছিলেন, অনেক বেশি তুখোড় ছিলেন। এবং সেই উজ্জ্বলতা তথা চাতুর্য 'কবিতাভবনে'র আড্ডার পরিবেশজড়িত ব্যাপার; সেই আড্ডার জাদু তাঁদের ছুঁয়েছিল ব'লেই, আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, এই মানুষগুলি স্তরান্তরে উন্নীত হয়ে গিয়েছিলেন, পরে-আমার-সঙ্গে-আলাপ-হওয়া এই মানুষগুলিই। কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই তাঁদের প্রতিভা নিয়ে অবশ্য সংশয়ের অবকাশ ছিল না, কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকা ঘিরে যে-আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, তার অন্তঃস্থিত বিদ্যুতের গুণে সেই প্রতিভা তুঙ্গতম শীর্ষে পৌঁছেছিল। মানুষ সামাজিক জীব, মানুষের প্রতিভাও সামাজিক প্রক্রিয়াদির প্রভাবসমাচ্ছন্ন: 'কবিতাভবনে'র মোহিনী মায়ার ছায়া পড়েছিল এই এতগুলি মানুষের মনে-বুদ্ধিতে-সৃষ্টিতে-আচরণে। দশ বছর বাদে আমরা যারা এলাম, ঈর্ষান্বিত না হয়ে অতএব উপায় ছিল না আমাদের।

আরো কারা আসতেন সেই তিরিশের দশকে দু'শো দুইয়ের দোতলায়? ছুটিছাঁটায় ঢাকা থেকে চ'লে আসতেন মন্মথনাথ ঘোষ-পরিমল রায়-অমলেন্দু বসু, যাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে পড়িয়েছেন, যাঁরা 'প্রগতি' পর্বে বুদ্ধদেব বসুর নিকটসহযোগী ছিলেন। পরিমল রায়-অমলেন্দু বসুর ঈষৎ পরিচয় এখনকার সাহিত্যভোক্তারা সম্ভবত জানেন, কিন্তু ক'জন আর মনে রেখেছেন মন্মথনাথ ঘোষকে, যিনি, প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা চলে, বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের সর্বপ্রথম রচয়িতা, এবং সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যাঁর অধ্যাপনা, আমার কাছে অন্তত, বিকশিত পারিজাতের রূপ-গন্ধ-মাধুর্য-বিস্ময়-হাহাকার নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল? ধ'রেই নিচ্ছি ঐ সময়ে দু'শো দুইয়ের তেতলা থেকে আরো-অনেক ঘন-ঘন দোতলার আড্ডায় নামতেন অজিত দত্ত মশাই: আমরা যখন পৌঁছুলাম, 'দিগন্ত'-উত্তর পর্ব সেটা, উনি দোতলায় নামা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। আর আসতেন, আমার অনুমান, ভৃগুকুমার গুহঠাকুরতা, যিনি অকস্মাৎ অকালপ্রয়াণ করেছিলেন, 'কবিতাভবনে'র খুবই কাছের মানুষ, জনশ্রুতি, হৈ হৈ ক'রে জমাট আড্ডা দিতে পারতেন, যাঁর অনুজ প্রদ্যোৎকুমার গুহঠাকুরতার সঙ্গে অন্যত্র, এই সেদিন পর্যন্ত, আমি নিজে আড্ডা জমিয়েছি, অথচ প্রবাদপ্রতিম ভৃগুবাবুকে চোখে দেখিনি কখনো। নাকি আমি মস্ত ভুল করছি এখানে? ভৃগুবাবু তো 'কবিতা' পত্রিকা শুরু হবার আগেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। বহু বছর ধ'রে অবশ্য আমরা নিজেরাই দেখেছি নিউ থিয়েটর্সের সৌরেন সেনকে, পরে বোম্বাই গিয়ে যিনি পুরোপুরি হারিয়ে গেলেন।

সন্দেহ হয়, মাঝে মাঝে আসতেন, মৃদু-নম্র পায়ে সিঁড় উত্তরণ ক'রে, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, যিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, সকলের অগোচরে, গত হয়েছেন; কিন্তু অগোচরেই বলি কেন, সর্বসমক্ষেই গত হয়েছেন, কিন্তু কে আর ঐ নিঃশব্দ মানুষটিকে এতগুলি বছর পেরিয়ে মনে রেখেছেন? ক্বচিৎ-কখনো হয়তো আসতেন শ্রীহট্ট অথবা করিমগঞ্জ থেকে অশোকবিজয় রাহা এবং প্রজেশকুমার রায়, নয়তো ঢাকা থেকে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। কিংবা, যা এখন মস্ত বিস্ময়কর ব'লে মনে হ'তে পারে, মাঝে-মাঝে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে, ট্রামে কি বাসে চেপে, এমনকি স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন-দু'দিন শিবরাম চক্রবর্তীও কি আসতেন না মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের সঞ্চিত আলস্য ছেড়ে?

অন্য-একটি বিশেষ আদলের যুবকযুবতী সম্প্রদায়, যাঁরা হয়তো কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়সূত্র ধ'রে হাজির হয়েছিলেন, তারপর সাহিত্য পেরিয়ে 'মালামালঞ্চ' নাটক এবং আনুষঙ্গিক হৈহুল্লোড়ের সুবাদে 'কবিতাভবনে'র আড্ডায় সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন, তাঁদের কথাও তো বলতে হয়। আমার এই তালিকায় সম্পূর্ণতা অবশ্যই নেই, কিন্তু মোটামুটি একটি ধারণা রচনা করতে হয়তো তা যথেষ্ট: সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়,

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, তপতী চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী বসু, প্রায় কাছাকাছি সময়ে মণীন্দ্র রায়, রমা গোস্বামী (" 'ভুলিবো না' : এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে জীবন করে না ক্ষমা ; তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক," সেই রমা গোস্বামী), আরো খানিক বাদে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের নিজেদের সময়ে বহুবার দেখেছি আবু সয়ীদ আইয়ুবকে, ক্বচিৎ-কখনো অমিয় চক্রবর্তীকে, যিনি কবিতাচর্চার সঙ্গে, শেষের দিকে ভিয়েৎনামচর্চার সঙ্গে, নেস্‌লে চকোলেট-চোষা কেমন মিলিয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্যই দেখেছি সুধীন্দ্রনাথকে। মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় তাঁর উপর হামলা ক'রে পর-পর অনেক-গুলি কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলাম : 'আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করি যদি' থেকে শুরু ক'রে 'এখনো বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে' পর্যন্ত। কিন্তু এঁরা তো আমাদের আবির্ভাবের পাঁচ বছর আগেও যেতেন, দশ বছর আগেও, যখন সেই সঙ্গে আরো যেতেন, আমার ধারণা, এমনকি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এমনকি নীরেন্দ্রনাথ রায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় যেতে শুরু করেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়দের প্ররোচনায় প'ড়ে, সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ সাল থেকেই। জীবনানন্দ দাশকে, আমি অন্তত, কোনোদিন 'কবিতাভবনে' দেখিনি, আমাদের কয়েক বছর আগে যাঁরা আড্ডা দিতেন সম্ভবত তাঁরাও কোনোদিন দেখেননি : তাঁর বিশেষ স্বভাব-অনুযায়ী তিনি হয়তো যেতেন নির্জনতম সময়ে, পৃথিবীর নাগালের বাইরে নিজেকে নিশ্চিন্ত ক'রে নিয়ে। কিন্তু, প্রায় হলফ ক'রেই এটা বলা চলে, মাঝে-মধ্যে রিপন কলেজ-ফেরৎ, কিংবা কোনো শনি-রবিবার সন্ধ্যাবেলা, বিষ্ণু দে গিয়ে নিশ্চয়ই হাজির হতেন, হয়তো দু' একদিন ওঁর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও থাকতেন : 'কন্যকাদানে ধরারে করেছে ধন্য পিতা যে তোমার তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে', বিষ্ণুবাবুর এই কবিতা, যদি না আমার স্মৃতিভ্রম ঘ'টে থাকে, বুদ্ধদেব বসুর এক সদ্যোজাতা তনয়াকেই তো উদ্দিষ্ট। নাকি এখানেও আরেক দফা ভুল করছি, সেই কবিতার উপলক্ষ্য হীরেনবাবুর কন্যা ?

আমি প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু 'উদয়ের পথে'-পর্বের আগে, এবং বোধ হয় কিছুদিন পরেও, আসতেন জ্যোতির্ময় রায়, আসতেন সকলকলাপারঙ্গম খলিফাপুরুষ নীহাররঞ্জন রায়, প্রভু গুহঠাকুরতার অগুনতি সুন্দরী-রূপসী-গুণবতী বোনেদের মধ্যে কেউ-কেউ, আত্মীয়তার সূত্র ধ'রে যাঁরা তেতলায় অজিত দত্তের বৈঠকখানাও ঘুরে আসতেন একটু। তাঁর বিভিন্ন ব্যাধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শোনাতে মাঝে-মাঝে হয়তো আসতেন বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবনানন্দর মতোই, বিচরণে ভয় পেতেন, কিন্তু 'পূর্বাশা'-প্রকাশক সত্যপ্রসন্ন দত্ত এই-ঐ সমস্যার ছুতো ধ'রে মাসে একবার-দু'বার নিশ্চয়ই ঘুরে যেতেন। এবং তাঁর বহুধা আগ্রহের ভিড়ের মধ্যে সময় ক'রে নিয়ে, হয়তো একটু বেশি রাত্তিরে, হাজির হতেন হুমায়ুন কবির, সঙ্গে কোনো-কোনোদিন

হয়তো আতোয়ার রহমান। ধ'রে নিতে পারি নতুন-লেখা কবিতা নিয়ে দু'মাস-তিনমাস অন্তর-অন্তর আসতেন আবুল হোসেন ও আহ্সান হাবীব।

পণ্ডিচেরী থেকে দমকা হাওয়ায় হঠাৎ-হাজির-হওয়া, থিয়েটর রোডে সমাসীন, দিলীপকুমার রায়ও, ১৯৩৭-৩৮ সালে, বা তার কাছাকাছি সময়ে, একদিন-দু'দিন 'কবিতাভবনে' নিশ্চয়ই চড়াও হয়েছেন, গান শুনিয়েছেন বা শুনেছেন, কাব্যতত্ত্ব নিয়ে তর্ক জুড়েছেন, ঘর কাঁপিয়ে হেসেছেন। বুদ্ধদেব বসুর শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যিনি সেই সঙ্গে সুরেশ্বর শর্মা ও স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ও বটেন, তিনিও কি বছরে অন্তত একবার হ'লেও পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে দু' দণ্ড আলাপের জন্য হাজির হননি? সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, অদ্ভুত-অদ্ভুত সময়ে, তাঁর প্রাচুর্যে-ছড়িয়ে-পড়া অতি-অবিন্যস্ত চুল নিয়ে, শ্লথ-সহাস্য ঔদাস্যে হাজির হ'তে আমরাই দেখেছি, কিন্তু তিনিও তো যেতেন আরো-অনেক আগে থেকেই। যেতেন সংগীতজ্ঞ হিমাংশুকুমার দত্ত-অজয় ভট্টাচার্যরাও, এবং, উদয়শঙ্করের আত্মীয়া, নৃত্যপটিয়সী কনকলতা।

এলোমেলো, কোনোরকম পারম্পর্য বজায় না রেখে অনেকগুলি নাম আমি উল্লেখ করলাম। আমরা গিয়ে হাজির হবার কয়েক বছর আগে থেকেই এঁদের অনেকের 'কবিতাভবনে' যাওয়া শিথিল হয়ে গিয়েছিল, আমরা শেষের রেশটুকু শুধু পেয়েছি। এবং মনে-মনে আড্ডার পূর্বসূরীদের প্রতি ঈর্ষাজ্ঞাপন করেছি। তিরিশের দশকের শেষার্ধের 'কবিতাভবনে'র সেই আড্ডার আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিশেষ চরিত্রলক্ষণ ছিল না। কিন্তু এই লক্ষণহীনতাই, আমার বিবেচনায়, গভীর ভাবনাদ্যোতক ব্যাপার। দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তী ঋতুতে, বাঙালি উজ্জীবনের অধ্যায়ে, বিশেষ-একটি ঔদার্যের ছোঁওয়া ছিল। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনা, যুবকযুবতীদের দু' চোখের অঞ্জন জুড়ে স্বপ্ন-সাহস-চরম আত্মত্যাগের প্রতিশ্রুতি-পরিপূরণ, তারই পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজে অনেকগুলি অর্গল পর-পর খুলে দিয়েছেন, হাওয়া ঢুকছে, দুঃসাহসী দুর্ধর্ষ হাওয়া, সেই হাওয়া ভেদ ক'রে, অথবা সেই হাওয়ার সওয়ার হয়ে, আবেগের-কল্পনার বেপরোয়া প্রব্রজ্যা, যার প্রভাব কাব্যে, সংগীতে, নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে। এবং আড্ডায়। পরাধীন দেশ, বিশ্বজোড়া মন্দা, যার জের বাংলাদেশের সংগোপনতম গৃহস্থ-বাড়িকে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করেছে, হতাশা-অবসাদবোধ, অথচ তারই সঙ্গে পরম আত্মনিবেদিত বীরদের মরুবিজয়ের কেতন সুদূর ঊর্ধ্বে উত্তোলনের সংকল্প, এই সমস্ত-কিছু জড়িয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি সত্তা, সেই সত্তার উন্মোচন বাঙালি আড্ডায়, তিরিশের-দশকের শেষার্ধে 'কবিতাভবনে'র সেই আড্ডায়ও। সেই আড্ডায় কোনো শ্রেণীবিভাজন ছিল না। সবাই-ই আসতেন, মতের বৈচিত্র্য, মানসিকতার বহু বিভঙ্গ, অনেক-রকম ঝোঁক, আচারে-বিচারে পছন্দে-অপছন্দে বৈপরীত্য-অসংগতি। কিন্তু যে-আড্ডা আমার এই রচনার উপলক্ষ্য তা সমস্ত উচ্চাবচতা-অসংগতিকে মানিয়ে

নিতে পেরেছিল, মানিয়ে নিতে পেরেছিল ব'লেই 'কবিতাভবনে'র সেই আড্ডা একটি অখণ্ড কবিতার রূপ পেয়েছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে তখন আসন্ন সংকট, কর্মহীনতার বিস্ফারিত সমস্যা, আত্মজিজ্ঞাসার আর্ত আকুলিবিকুলি, কিন্তু, এই আপাতআবিলতার মধ্যেও, প্রজ্ঞার একটি স্থিতবিন্দু কী ক'রে যেন নিরূপিত হয়ে গিয়েছিল: আপাতত প্রতিভার সঙ্গে উৎসাহকে যুক্ত ক'রে যাওয়া যাক, আমরা যে-যেখানে থাকি না কেন, আমাদের বিকচনের লক্ষ্য আঁকড়ে থাকতে হবে, উত্তরণের লক্ষ্য, পরস্পরের কাছ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে হবে আমাদের। পরস্পরকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান, প্রতিভার সঙ্গে উৎসাহ, উৎসাহের সঙ্গে প্রেরণা, এই ত্রিসংগমের অধ্যবসায় আমাদের এক সহিষ্ণু বদ্বীপে পৌঁছে দেবে, আমাদের বাঙালি সত্তা সেখানে তার চরিতার্থতা আবিষ্কার করবে।

কেউ-ই কোনোদিন স্পষ্ট ভাষায় এ ধরনের বিঘোষণা করেননি, কিন্তু, সেই তিরিশের দশকে, মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচর্চার সঙ্গে এই অনুভাবনা যুক্ত হয়ে ছিল। কোনো-কিছুই অন্য কোনো-কিছু থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, পরাধীন সমাজে বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, বিভিন্ন প্রয়াসকে মেলাতে হবে। উদাহরণ হিশেবে বলা চলে, এমনকি সমর সেনের প্রথম দিকের কবিতার আকীর্ণ হতাশা-তিক্ততা পর্যন্ত চরিত্র-বহির্ভূত ছিল না, অন্য-কারো প্রায়-বন্য আস্তিক উদ্দামতার সঙ্গে একই সারিতে তার অবস্থান ক'রে দিতে আদৌ সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ঐ বিশেষ সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত চরিত্রপ্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছিল 'কবিতাভবনে'র আড্ডায়। সেই আড্ডায় সবাই আসতেন, সংশয়ের ঋতু তখনো ভবিষ্যঘটনা। নীরেন্দ্রনাথ রায়-হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে যেতেন, একই সঙ্গে যেতেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, হুমায়ুন কবির কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতার পরাকাষ্ঠা ১৯৪০ সালে 'কবিতাভবন'-কর্তৃক প্রকাশিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে ততদিনে পুরোপুরি দুই বিপরীত মেরুতে পৌঁছনো হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব, অথচ যুগ্মভাবে সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন, রুচিতে-পছন্দে অমিল থাকলেও নির্বাচনে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানকে অব্যক্ত রাখা অনুচিত মনে ক'রে দু'টি আলাদা ভূমিকা লিখেছেন। পরবর্তী সময়ে অন্য-এক মহান্ দেশের মহান্ নেতা বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে সহস্র ভাবনার পদ্মে বিকশিত হওয়ার যে-কল্পনা ব্যক্ত করে-ছিলেন, 'কবিতাভবনে'র এই কাব্যসংকলন তার একটি অবিমূর্ত বিপ্লব-পূর্ব দৃষ্টান্ত।

সেই সহনীয়তার ঋতু, আমাদের দুর্ভাগ্য, তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তখন পর্যন্ত প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ, এক বিশেষ পরিবেশে নিজের সত্তাকে লালন ক'রে আসছিল, যে-সত্তা অনেকটাই ছিল নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাইরের বিশ্বকে বিপুল সমারোহে এই সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে উপনীত করলো, যা ঘটলো তা যথার্থই খেলাভাঙার খেলা।

বাঙালিদের প্রাক্তন পৃথিবীতে জীবনযাপন কঠিন ছিল, কিন্তু কর্কশ ছিল না। এবার অথচ কর্কশতার গহ্বরে কেউ পিছন থেকে নির্মম ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আমাদের। আমরা বিযুক্ত হ'তে শিখলাম, মিলকে ছাপিয়ে অমিলকে যে প্রাধান্য দিতে হয় সেই জ্ঞানে উত্তীর্ণ হলাম, শ্রেণীপংক্তি-ভেদাভেদ সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে গেলাম। বাঙালির নিটোল আড্ডা এই অভিজ্ঞানের ফলে চৌচির না হয়েই পারে না। ১৯৪৩ অথবা ১৯৪৪ সাল থেকে আস্তে-আস্তে, একটু-একটু ক'রে, 'কবিতাভবনে'র ইতিহাসখ্যাত আড্ডা ভেঙে পড়তে শুরু করলো। 'দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক কিনা' এই কবিতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধবর্তী কোনো সময়ে, 'কবিতাভবন'-প্রকাশিত বার্ষিকী 'বৈশাখী'র একটি সংখ্যায় বেরিয়েছিল : আর কয়েক বছর গড়িয়ে যাওয়ার পরে, ঐ চরিত্রের কোনো কবিতা 'কবিতাভবনে'র তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হবার কথা অকল্পনীয় হয়ে গেল। বাঙালি সমাজ, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, অনেক টালমাটাল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে, শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে দীক্ষিত হলো, অনেকে বলবেন, ইতিহাসের নিয়ম মেনেই হলো।

ইতিহাসের নিয়ম মেনেই যদি যা হবার তা ঘ'টে থাকে, তা হ'লে পারস্পরিক কাদা-ছোঁড়া গাল-পাড়ার পর্যায়কে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক ব'লে বিবেচনা না ক'রে উপায় থাকে না। কিংবা, এমনও হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথই ঠিক, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। আমার মনে তবু একটি সংশয় থেকেই যায়। ইতিহাস অবশ্যই তার নিয়ম মেনে এগোবে, কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই তো দেখা যায়, কোনো বিশেষ আকস্মিকতা-অথবা ঘটনাসম্পাত-হেতু ইতিহাসের গতিবেগ হয় শ্লথতর নয় ক্ষিপ্রতর-তীব্রতর হয়েছে, নয়তো প্রধান সড়ক থেকে বেমক্কা বেরিয়ে গিয়ে কোনো তখন-পর্যন্ত-অখ্যাত-অপাংক্তেয় হাঁটা পথে নিজেকে পরিচালিত করেছে। 'কবিতা-ভবনে'র তিরিশ দশকের শেষার্ধের আড্ডা, আমার কাছে অন্তত, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজসত্তার পূর্ণিমায় পৌঁছুবার প্রক্রিয়ার প্রতিভাস। কোথায় যেন একটু অস্পষ্টতা-অব্যক্ততা ছিল, আরো খানিকটা বিস্তার পেলে সেই আড্ডা তার পরিপূর্ণতায় পৌঁছুতে পারতো : আরো খানিক সময় জুড়ে আদান-প্রদান, ভাব-বিনিময়, আঘাত-প্রত্যাঘাত, আরো ঈষৎ সময় জুড়ে সহনশীলতার অভ্যাস, সুরের সঙ্গে অসুরকে, বুদ্ধির সঙ্গে আবেগকে আশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে রসায়নের অনুশীলন, এই সব-কিছু থেকে বাঙালির সৃজনপ্রতিভা শাণিত থেকে শাণিততর প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ পেত। একটি পরিচিকীর্ষা চলছিল, কিন্তু বাইরের ধাক্কায় তার যবনিকা-পতন ঘটাতে হলো, বাঙালি সত্তা পরিণতির সম্ভাব্যতম স্তরে অতএব পৌঁছুতে পারলো না। এটা মস্ত ক্ষতি, যার জের এখনো আমরা টেনে চলছি : একান্নবর্তী সংসারের সম্পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করার আগেই আমরা পৃথক হয়ে গেছি।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন আমরা গিয়ে পৌছুলাম, 'কবিতাভবনে'র ভাঙা হাট তখন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একদা, নিশ্চয়ই সুরেশ্বর শর্মা অথবা স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের বকলমে, ছন্দ নিয়ে এক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, খুব সম্ভব 'কবিতা' পত্রিকার পাতাতেই, নয়তো অন্যত্র, যার এলোমেলো একটি-দু'টি পংক্তি অনেকটা এরকম : 'হয়নি হ'তে যা পারিত, হলো না, যা ছিল অবধারিত ; কেন বৃথা হনু প্রতারিত'। হয়তো অযৌক্তিক, কিন্তু চল্লিশের দশকের শেষার্ধের, অথবা পঞ্চাশের দশকের প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে, 'কবিতাভবনে' আমাদের নিজেদের আড্ডার উতরোল সময়ে, এই ছেঁড়া-ছেঁড়া পংক্তিগুলি আমাকে বিপর্যস্ত করেছে। কীসের যেন অভাববোধ, আবাহনের আগেই বিসর্জন ঘ'টে গেছে যেন ; বুদ্ধদেব বসুব চরিত্রঔদার্য, তাঁর অনাবিল শিশুসুলভ সারল্য, সৃষ্টিকর্মে তাঁব সর্বত্যাগী অঙ্গীকার, তাঁর পরিবারস্থ সকলের সান্নিধ্যস্নিগ্ধতা, এই সমস্ত-কিছুর জন্য আমি প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতাবোধ করেছি, কিন্তু তা হ'লেও একটি বিশেষ দৈন্যের নিরানন্দও আমাকে অহরহ তাড়া ক'রে ফিরেছে, আমরা যেন একটু দেরি ক'রে এসেছি। কে জানে, আমাদের এই চিন্তার পীড়াকে সমর সেনরা আমল দেবেন না, তাঁরা হয়তো বলবেন, তাঁদের আড্ডার ঋতুতে, তাঁরাও অনুরূপ এক অভাববোধের ভুক্তভোগী। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত কাতরতার কাহিনী তুলনার বাইরে, আমার আক্ষেপ তাতে কমবার নয়। সমর-সেন-কামাক্ষীপ্রসাদদের সম্বন্ধে উদ্রিক্ত ঈর্ষা আমার কিছুতেই দমিত হবার নয়, দশ বছর হলো কামাক্ষীপ্রসাদ গত হয়েছেন, তা হ'লেও না।

এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন

ঈষৎ-পড়তে-জানা বাঙালিদের হুজুগেপনার শেষ নেই। তা হ'লেও, গত চল্লিশ বছর ধ'রে তাদের আগ্রহ জুড়ে যে-সার্ত্রসমাচ্ছন্নতা, তার একটি আলাদা ব্যাখ্যা হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য ঔপনিবেশিক মানসিকতার ব্যাপার-টুকু পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না, পরের মুখে ঝাল বা নুন খেতে আমাদের বরাবর আগ্রহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কলেজ স্ট্রীট বা হগ বাজারে ফের বিদেশী বইপত্তর আসতে শুরু করলো, ইওরোপে সার্ত্র ও অস্তিত্ববাদ নিয়ে মহা হৈ চৈ, কলকাতার রকবাজদের পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন। তিরিশের দশকে যে-কারণে পাউণ্ড-এলিয়ট নিয়ে হুজ্জোতি, কিছুটা একই কারণে হয়তো বছর পনেরো বাদে সার্ত্র নিয়ে মাতামাতি। তারপর যা হয়ে থাকে, কখনো বা একটু বেশি সোর-গোল, কখনো একটু কম, পীঠস্থানে যেরকম ঘটছে তা অনুসরণ ক'রে।

কিন্তু এই শাদামাটা ব্যাখ্যান যথেষ্ট নয়। সমান্তরাল অন্য-একটি কার্যকারণ সম্পর্কের যুক্তিও ঠিক ফেলনা বলা চলে না। অস্তিত্ববাদের গহনে হুজুগপ্রেমিক বাঙালি, মাঝে-মধ্যে সন্দেহ হয়, একটি স্বভাবসাযুজ্যের খোঁজ পেয়েছে। অহ-মিকায় টইটুম্বুর বাঙালি। ইংরেজ বেনেরা একদা স্বয়ং তাদের বিদেশী অক্ষরমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, চালচুলো সব গেছে, কিন্তু সেই গর্ব কিছুতেই অপহৃত হবার নয়, এখনো বাঙালির আত্মম্ভরিতার তুলনা নেই, আজ পর্যন্ত তাদের ঘিরে পৃথিবী-সৌরমণ্ডল আবর্তিত হচ্ছে। শাপভ্রষ্ট দেবশিশু তারা, তাদের সত্তার উপর অন্য কারো দখলদারি নেই, তারা আলাদা ভাবছে, আলাদা ক'রে দল গড়ছে, খেয়াল চাপলে হঠাৎ দল ভাঙছে, কুচুটে বুদ্ধিতে বাঙালির তুলনা নেই। এই অহমিকার উপাদানের অনেকখানি জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক বিলাপবিলাস। সেই ইংরেজরাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদ দু'শো বছর আগে দান ক'রে গিয়েছিল। কালের ফেরে জমিদারি আর নেই, কিন্তু তদ্‌ঘটিত মনোবৃত্তি অব্যাহত। জমিদারি মানসিকতা, যা এখন শরিকি আচরণ-প্রবৃত্তিতে পর্যবসিত। আমার স্বার্থ-আমার আকীর্ণ অবিশ্বাস, যে আমাকে মায়ায় জড়াতে চাইবে তাকে আমি কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবো, হাত এতটুকু কাঁপবে না। আমি একা, আমাকে কেউ বশ্যতায় বাঁধতে পারবে না, নিগড়ে-ধরা-পড়ার চেয়ে বড়ো কলঙ্ক কিছু হ'তে পারে না। আমরা বাঙালিরা তাই বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেদের দীক্ষিত করেছি, কারো প্রত্যয়ে নির্ভর করতে আমাদের ঘৃণাবোধ হয়। যদি অন্য কেউ আমাদের উপর বিশ্বাস আরোপ করে, সে বা তারা ঠকবে।

কিন্তু, মানুষের মনের যন্ত্রপাতির বিন্যাসে হঠাৎ-কৌতুকের শেষ নেই, এই বাঙালিই সেই সঙ্গে কাব্যি ক'রে বলে: আমি চাই অপর সংহতি। দ্বান্দ্বিকতায় আবিষ্ট বাঙালি, স্ববিরোধিতার খেলাঘর তারা পেতে বসেছে মনের ভিতরে। সংকীর্ণ-সীমিত বুদ্ধির সঙ্গে তাদের অনতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে বাঙালিরা, তাদের অসহনীয় অহংবোধ সত্ত্বেও, একটি মহান্ সামাজিক প্রজ্ঞাতে উপনীত: লড়াই না ক'রে বেঁচে থাকা যায় না। কিন্তু একা লড়াই করা অসম্ভব, আমাদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখার জৈব প্রয়োজনে পড়শীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, জোট বাঁধতে হবে, আমাদের সত্তাকে জনসমুদ্রের বদ্বীপে পৌঁছে দিতেই হবে, অন্যথা তার মুক্তি নেই। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা, বাঙালি তাই এক দিকে তাদের অহংকারে টইটুম্বুর, কেউ যেন তাদের জ্ঞান দিতে না আসে, একমাত্র তাদেরই অপরকে জ্ঞান-বিলোবার প্রেম-বিলোবার প্রেম-প্রত্যাখ্যান করবার অখণ্ড অধিকার, এবং যেহেতু সব বাঙালিরই একই প্রকৃতি, তারা সারা প্রহর জুড়ে, বাহির বাড়িতে লণ্ঠন, ভিতর বাড়িতে ঠন্‌ঠন্‌, শরিকি বিবাদে মাতোয়ারা থাকবে। অন্য দিকে কিন্তু এই বাঙালিই জোট বাঁধবে, মিছিলে জড়ো হবে, সামাজিক অঙ্গীকারের কথা বলবে, বিপ্লবের বিলাসী স্বপ্নে মদির হয়ে এসে নিজেদের অলস ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

এই দ্বিরাচারী বাঙালিকে নিয়ে প্রবাদসিদ্ধ বিধাতাপুরুষ কী করবেন তা ভেবে পান না, শেষ পর্যন্ত মনে হয় তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বাঙালি তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শূন্যাশ্রয়ী একাকিত্বের যেমন পিঠ চাপড়াচ্ছে, পাশাপাশি, বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সমাজের কাছে আর্ত প্রার্থনাও জানাচ্ছে, জল দাও আমার শিকড়ে। এটা ঠিক গাছেরটিও-পাড়বো-তলারটাও-কুড়োবো গোছের মেকি অসাধু ব্যাপার নয়, বাঙালি যথার্থই দ্বান্দ্বিকতায় উৎপীড়িত, অহংকারী কবিতার সঙ্গে রাজপথ-জনপথ-কাঁপানো মিছিলকে তারা মেলাতে পারছে না, অণুর সার্বভৌমত্ব বুদ্ধি দিয়ে বরণ করেছে তারা, অথচ সেই বুদ্ধিই তাদের বোঝাচ্ছে আকাশ থেকে তো তা পড়েনি, সমাজের শরীর খুঁটেই অণুর কণিকা। যে-মুহূর্তে বাঙালি বলছে, আমাকে বাঁধবি তোরা সে-বাঁধন কি তোদের আছে, সেই একই মুহূর্তে তার প্রতীপ-উচ্চারণ, আমি যে বন্দী হ'তে সন্ধি করি সবার সাথে।

হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে চমক লাগে, সার্ত্র তথা অস্তিত্ববাদের সমস্যা খাঁজে-খাঁজে মিলে যায় এই বাঙালি উভসংকটের সঙ্গে। সত্তার সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত হ'তে দেওয়া যায় না, অথচ জনসমুদ্রে জোয়ার, কোন্ মূর্খ সেই জোয়ারে ভেসে যেতে অস্বীকার করবে? সত্তা পরিত্রাণ চাইছে, পরিপূর্ণতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সত্তা স্বয়ম্ভর, তাই জুড়তে গিয়ে সে ভাঙছে, পরিত্রাণের অন্বেষণে সে আরো যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে, সম্পূর্ণ হ'তে গিয়ে আরো বিশ্লিষ্ট হচ্ছে। তার সত্তার অভিভূত দান ছাড়া সমাজ পরিপূর্ণতা পেত না, বিন্দুতেই সিন্ধু, অথচ, বিপরীত উক্তিও তো সমান সত্য, তার

সামাজিক মহিমা, তথা সেই মহিমার স্মৃতি বাদ দিয়ে সত্তার পক্ষে তো কোনো কেন্দ্রস্থৈর্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব টানাপোড়েন, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের ন-যযৌ-ন-তস্থৌ প্রহরগুলি থেকেই। সার্ত্র জনতার কাছে আসছেন, শিহরিত হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগানে যোগান দিচ্ছেন, পার্টির অমুক সিদ্ধান্ত তমুক আচরণের বেপরোয়া নিন্দা করছেন, নাটক লিখছেন পার্টিকে গালমন্দ ক'রে, বছর অতিক্রান্ত না হ'তে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন, বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের মিছিলে জড়ো হয়ে পুঞ্জীভূত পাপবোধের প্রায়শ্চিত্ত খুঁজছেন, এরকম একটির-পর-আরেকটি অধ্যায়, কাছে আসছেন, দূরে যাচ্ছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী দূরে ঠেলছে, ভিয়েৎনাম কাছে টানছে, পার্টির সঙ্গে আছেন, অথচ নেইও। নিজের মনকে, সত্তাকে, বিবেককে, চিন্তা-শক্তিকে, আবেগপ্রেরণাকে বিসর্জন দেওয়া অধর্ম, তাই পার্টির নৈকট্য থেকে স'রে যাচ্ছেন, অথচ নিজের মন, বিশ্বাস, যুক্তি, অনুভূতি, চিন্তাশক্তি, সব-কিছু বলছে সব-কিছুরই উৎস সমাজের ইতিহাসপ্রবাহ। সেই ইতিহাসপ্রবাহের প্রতীক তথা প্রতিভূ কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টিকে এড়িয়ে, একা, কোথাও উত্তীর্ণ হবার প্রসঙ্গ বাতুলপ্রস্তাব। আমরা প্রত্যেকেই মুক্ত পুরুষ হ'তে চাই, সামাজিক বন্ধনের মায়া কাটিয়ে নিভৃততম পৌরুষপ্রোজ্জ্বল কোনো নির্ধারণ খুঁজি। কিন্তু, নিজেদের নিয়েই ব্যঙ্গ করতে হয় শেষ পর্যন্ত, মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা লাগে, কারণ সমাজচেতনা তো, মানি না-মানি, ইতিমধ্যে অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত, সমাজকে পাশে ফেলে রেখে পদক্ষেপ অসম্ভব, সমাজের ভাষাই আমাদের ভাষা-সমাজের আকৃতি আমাদেরও সংগোপন আকৃতি।

এই সার্ত্রীর সংকট একটু-আধটু-লেখাপড়া-মক্সো-করা মধ্যবিত্ত বাঙালির সংকটের সমার্থক। সমস্যার অন্ধগলিতে ভ্যাবাচ্যাকা ঘুরপাক খেতে-খেতে বাঙালি বামপন্থী আদর্শে চিন্তাধারায় নিজেদের সমর্পণ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু সত্তার সার্বভৌমত্বকে তো বিসর্জন দিতে পারেনি, তাই বিন্দুর মধ্যে গহনতর বিন্দু খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা: একমাত্র আমরাই সত্যকে খুঁজে বের করতে পেরেছি, আমরা অভ্রান্ত, আমাদের পড়শীরা আমাদের চেয়ে কম জানে, আমাদের ভাবের ঘরে ঐ লক্ষীছাড়াদের চুরি করবার সুযোগ দেবো না।

তবে আসল বিপদ এই উপহসনীয় শরিকি মনোবৃত্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিণামেই সীমাবদ্ধ নয়। সার্ত্র জনতার আন্দোলনের কাছাকাছি এসেছেন, সত্তার অহংবোধের তাড়নায় কখনো-কখনো একটু পাশে স'রে গেছেন তিনি। কিন্তু কদাপি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকেননি, আন্দোলন থেকে অন্যতর আন্দোলনে অস্তিত্বের চরিতার্থতা অনুসন্ধান করেছেন, ক্লান্তিহীন তাঁর প্রব্রজ্যা। উটকো-কোনো প্রতিবাদধর্মী মানুষজনের সমারোহ, কমিউনিস্ট পার্টি একটু সাবধানী-সন্দিহান,

কিন্তু যেহেতু অত্যাচার-অনাচারের গন্ধ পেয়েছেন সার্ত্র, তিনি গিয়ে জড়ো হবেনই, পার্টির সায় থাকুক না-থাকুক। ১৯৬৮ সাল, ছাত্রছাত্রীরা এই মুহূর্তে বিপ্লবকে বুলভার সাঁ মিশেলে এনে হাজির করবে, তাদের মিছিলে সাড়া না দিয়ে তাঁর উপায় কী; ১৯৭৬ সাল, এখানে-ওখানে-সর্বত্র গোঁড়া মাওপন্থীদের ধ'রে জবাই করা হচ্ছে; অন্যেরা প্রতিবাদ জানান না-জানান, যায় আসে না, সার্ত্র তাঁর যা বলবার বলবেনই, যদি পতাকা নিয়ে রাজপথে নেমে দেখেন, পুরোপুরি নিঃসঙ্গ তিনি, দমিত হবেন না আদৌ। তাঁর জীবনদর্শন তো ঠিক এই কথাই বলে: সত্তা একক, একাকী, অথচ সেই কারণেই নমস্ত।

মুস্কিল হলো মধ্যবিত্ত একটু-আধটু-ধারাপাত-ওল্টানো বাঙালি অস্তিত্ববাদ থেকে আত্মতৃপ্তির আস্বাদ যতটুকু নিংড়োবার তা নিংড়ে নিয়েছে, কিন্তু অস্তিত্ব-বাদের সঙ্গে যে-কর্মযোগের অধ্যায়টুকু সংযোজিত, তার প্রতি তাদের ঘোর অনীহা। বামাদর্শের প্রতি ঝোঁক, মিছিলে শরিক হওয়া, মিছিলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে যতটুকু ক্ষীর জোটে তাতে ভাগ বসানো, এই পর্যন্ত মোটামুটি অঙ্ক মেলে, তারপর কেমন যেন এলোমেলো হয়ে আসে। অহংচিন্তা বাঙালিকে মিছিলের ঘোর আরক্ততা থেকে কিছুটা আলাদা ক'রে দেয়। কোনো মহৎ আগুনের প্রত্যাশায় হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন সবাই, কিন্তু সত্তরের দশক যেহেতু চক্রান্তকারীরা বিপ্লবের দশকে পরিণত হ'তে বাধা দিল, হারাধনের দশটি ছেলে, তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রগাঢ়তা সত্ত্বেও তন্মুহূর্তের সংকল্প এমনকি স্মৃতি হিশেবেও আর বেঁচে নেই, মহত্ত্বের সম্ভাবনা অতএব শেষ পর্যন্ত এ শুধু অলস মায়া-এ শুধু মেঘের খেলা-এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন-ধরনের বেসাতির আড়ালে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত বাঙালি, তাদের সমাজবিবেক সত্ত্বেও, আগুন হয়ে জ্বলে না, শাদামাটা মিছিলে তাদের যদি আর রা নেই, মিছিলের সেই লগ্নে তারা কোনো বৃহত্তর, তীব্রতর, শাণিততর বিপ্লবের ছক আঁকতে নিযুক্ত করে না নিজেদের, বোনাসের বা বাড়তি মহার্ঘ ভাতার টাকা নিয়ে, যেহেতু এই শালার দেশে কিছু হবার নয়, তারা বাজার করতে বেরোয়। লক্ষ-কোটি বেকারদের প্রসঙ্গ, লক্ষ-কোটি ভূমিহীনদের প্রসঙ্গ, লক্ষ-কোটি দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ, নিঃসাড়, পাশে প'ড়ে থাকে।

এখন মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, কে জানে, ঐ ঘোর-নাস্তিক সুধীন্দ্রনাথ দত্তই হয়তো অস্তিত্ববাদবিলাসীদের আসল বুঝেছিলেন: মনস্তাপেও আর ফাটা ডিম জোড়া লাগবে না; অতএব সন্ধিতে ফেরা যাক, ফেরা যাক সুবিধাবাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে: তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে, তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি। হাতিবাগান থেকে বালিগঞ্জে-বেহালায় ট্রামে-চ'ড়ে-বেড়ানো অপেশাদার বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের সম্বন্ধে তাঁর কিছু রঙ্গিল ধ্যানধারণা ছিল, তাঁদের আপাত-সার্ত্রীয় ধর্মাচরণের গলিঘিঞ্জির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাই

তিনি দিতে পেরেছিলেন ঐ বেশ কয়েক দশক আগেই। যে-তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই বাঙালিরা আছে তা-ও বলা সম্ভব নয়, ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এসেছে, অন্তত মধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্রলোক বাঙালির পক্ষে। তারা সার্ত্রের নামকীর্তন করতে-করতে অবশেষে চিতায় চড়বে, হাড় জুড়োবে সমাজের। তারপর, এই বাঙালি সমাজেও, ইতিহাস নতুন ক'রে তার পথ তৈরি করে নেবে।

'তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল প্রিয়ে'

সংকট শব্দটি বহুব্যবহারে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ-ব্যবহারে, ধার হারিয়ে ফেলেছে। আপন্ন অবস্থায় মুস্কিলে পড়তে হয় তাই। বাংলা কবিতা, বেহদ্দ গালাগালের মুখোমুখি হ'তে হবে জেনেও বলছি, অন্তত গত পঁচিশ বছর ধ'রে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে, ভাবনা-উদ্ভাবনা-প্রাকরণিক প্রয়োগ সব-কিছুই এখন কেমন যেন ছকে বাঁধা, কবিতা না প'ড়েও যেন ব'লে দেওয়া চলে কেমন কবিতা লেখা হবে। অবশ্য এই সংকট, অনেকে বলবেন, শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই তো নয়, তা সর্বত্রগামী, সাহিত্যের প্রতিটি কক্ষে এক স্তম্ভিত ছায়া নিজেকে প্রসারিত ক'রে আছে। এবং এই সংকট সারা পৃথিবী জুড়ে: কথার গাঁথুনিতে, লিখিত কথার গাঁথুনিতে, মানবহৃদয়ের আকুলিবিকুলির অভিজ্ঞান, মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উন্মীলন, ধরা-পড়ার ঋতু শেষ, চলচ্চিত্র কিংবা ঐ ধরনের অন্য-কোনো মধ্যবর্তিতায় এখন থেকে নিজেকে প্রকাশের প্রয়োজন মেটাতে হবে সামাজিক মানুষকে, বিশেষ ক'রে কবিতা—ছন্দিত-নন্দিত শব্দের রহস্যের খাঁচায় মানুষের হৃদয়রহস্যকে বন্দী ক'রে আনার উপাখ্যান—এখন থেকে পুরোপুরি বাতিল, সেই রহস্যের প্রকাশ ঘটুক চিত্রযন্ত্রে-তোলা ছবির ইশারায়।

যাঁরা হাল ছেড়ে দেননি তাঁরা অবশ্য অন্য কথা বলবেন। তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট এবং সম্যক পরিমাণে ঝাঁঝালো। কে বলেছে কবিতার দিন ফুরিয়েছে, কে বলেছে সাহিত্যরূপী সৃষ্টিকর্ম একই জায়গায় থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে, একমাত্র অক্ষম বুড়োরাই এই গোছের প্রলাপোক্তি করতে পারে, নিজেরা যেহেতু সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারছে না, তাই তারা সংকটের কথা বলে, মরা নদীর উপমা মনে আনে; আসলে কবিতা, তথা সাহিত্য, তাদের সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে, গোটা পৃথিবীতেই পাল্টাচ্ছে, বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়, এই নতুন সাংকেতিক ভাষা প্রাচীনতা-বিলাসীদের পক্ষে অগম্য। এটা ঠিক, প্রযুক্তিবিপ্লবের প্রভাব সমাজে যেমনভাবে পড়ছে, আমাদের হতচ্ছাড়া দেশেও যেমনভাবে পড়ছে, তাতে কবিতা-সাহিত্যকেও আদল বদলে নিতে হচ্ছে, নতুন বিভঙ্গ রপ্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন, এরকম মানিয়ে নেওয়াটাই তো সামাজিক বিবর্তনের নিয়ম, এবং কবিতা-সাহিত্য তো সমাজের প্রতিচ্ছবি।

এই মুহূর্তে এই বিতর্কের অবসান নেই। হয়তো কোনো যুগেই নেই, কারণ বিতর্কটিতে বিশেষ-এক ধ্রুপদী প্রকৃতি উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ-উচ্চারিত সেই দার্শনিক নির্যাস—'তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে'—প্রতি যুগের উচ্চারণ।

আমরা বিন্দুতে স্থিত থাকবো, কিন্তু সেই সঙ্গে বিন্দু অতিক্রম ক'রে এগিয়েও যাবো : সাহিত্যের-কবিতার এটাই চিরকালীন আকৃতি। সমগ্র সমাজের সঙ্গে প্রতিটি সৃষ্টি-কর্মও তার অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম মেনে এগোচ্ছে, কিন্তু সার্বিক চরিত্র খোয়াচ্ছে না। সত্যশিবসুন্দরের সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে, অথচ পাল্টাচ্ছে না, কতগুলি চিরকালীন অভিজ্ঞান তাদের শুদ্ধতায় অবিচল, অবিকল থাকছে। কী পাল্টালো-কতটুকু পাল্টালো-কী প্রক্রিয়ায় পাল্টালো ইত্যাদি গালগল্প নিয়ে অহরহ ধারাবাহিকতার ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে, হ'তে থাকবে। সংকটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় যখন, হঠাৎ সন্দেহ জাগে, না, সত্যিই তেমন-কিছু সামনের দিকে এগোচ্ছে না, ভিড় হচ্ছে, আবর্ত চোখে পড়ছে, কিন্তু আবর্ত থেকে অন্তঃস্থিত কোনো প্রতিভা নির্গত হচ্ছে না, ভণিতাকে সৃষ্টি হিশেবে দাবি করা হচ্ছে, আসলে শিল্পকর্ম তার প্রকৃতি-অবয়ব নিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সংঘটিত চতুরালির মধ্যে অধ্যবসায় আছে, এমনকি হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধুতা পর্যন্ত আছে, কিন্তু তা-ই কি সব ?

এই কথাগুলি এলোমেলো মনে এলো 'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সর্বশেষ সংস্করণ হাতে পেয়ে। বিষ্ণুবাবুর প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে একগুচ্ছ কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে, যাদের বেশ কয়েকটি আজ থেকে অন্তত ষাট বছর আগে রচিত। আমি এদেরই মধ্যে বিখ্যাততর একটি কবিতাকে পুরোপুরি নিচে তুলে দিচ্ছি :

এ-আকাশ মুছে দাও আজ,
অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও,
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দাও অনিদ্রার ঘন কালিমায়।
দুই চোখ ঢেকে দাও, বাতাসের ব্যূহ ভেদ ক'রে
রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্রের পদক্ষেপধ্বনি
ঢেকে এসো দ্রুতপদে
রুদ্ধ ক'রে নিঃশ্বাস আমার
শব্দহীন চরণসঞ্চারে।
স্থিরতা নিঃশব্দ অন্ধকারে
অনিদ্রার শূন্যে হোক নিরালম্ব আমাদের
মুখোমুখি দেখা।
পৃথিবীকে চূর্ণ-চূর্ণ ক'রে
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার ॥

('বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃষ্ঠা ১৬)

বারবার ক'রে কবিতাটি আবৃত্তি করবার ইচ্ছা হয় আমার, দ্রুত অথবা থেমে-থেমে, পংক্তিগুলি কেটে-কেটে, প্রবহমানতা কখনো মেনে কখনো না-

মেনে। কারণ, অবাক হবার পালা আমার, কাকে আমি ধ্রুপদী কবিতা বলবো, কাকে বলবো আধুনিক, এই কবিতার শরীরে ধ্রুপদ ও আধুনিকতা তো মিলিয়ে-জড়িয়ে আছে। ষাট বছর আগেকার ভাষা, অথচ, কোনোরকম অস্বাচ্ছন্দ্য তো বোধ করছি না আমরা। এই কবিতার ভাষা তো একান্তই আজকের ভাষাও, বিভঙ্গ-ঝোঁক-বিন্যাস সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। যা ছয় দশক ধ'রে তার আধুনিকত্ব সংজ্ঞা বজায় রাখতে পেরেছে তা তো চিরায়তলোকে উন্নীত। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলন থেকে ইতস্তত পাতা খুলে যে-কোনো কবিতা পড়ুন, একই উপলব্ধির বৃত্তে ফিরে-ফিরে আসতে হবে। দীপ্ত, শাণিত অথচ ভাবনায় সমাহিত, কাব্যগুণে আপ্লুত এবং যে-কোনো প্রজন্মের মানুষের চিন্তার-আবেগের-যুক্তির-বিচারের-ভাষার-শৈলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'ঘোড়সওয়ার' কি 'পদধ্বনি' অথবা 'জন্মাষ্টমী', আরো একটু এগিয়ে 'অন্বিষ্ট', কোনোপ্রকার অবৈকল্যই নেই। ভাষা একই সঙ্গে সচ্ছল অথচ ঘনসংবদ্ধ, ভাবনায় ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সামাজিক স্বপ্নের সাযুজ্যসম্পর্ক স্থাপনজনিত উদ্বেগ-আনন্দ-বিহ্বলতা, ছন্দের বিভিন্ন-বিচিত্র রকমফের, মস্ত খলিফাপ্রতিভার পক্ষেই যা একমাত্র সম্ভব। এই শতাব্দীর চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দশকেই তো তা হ'লে বাংলা কবিতা বিশেষ-একটি পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছিল। তার পর আর গত পঞ্চাশ বছরে কতটুকু এগিয়েছি আমরা, কিছু-কিছু লোক-দেখানো ভড়ঙের বাইরে? মানছি, ঐ পর্যায়ে বিষ্ণুবাবু একমাত্র খলিফাব্যক্তি ছিলেন না, তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন আরো দু'-চারজন, তিনিও সাহস জুগিয়েছেন এই দু'-চারজনকে, তার পর তাঁদের সম্মিলিত সৃষ্টিঅভিযান। এই অভিযানের ইতিকথা তেমন গুছিয়ে এখনো কোথাও লেখা হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যের এতটা রূপান্তর তো এর আগে আর কেউ ঘটাতে পারেননি। এবং এই রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ থেকে, রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাব পেরিয়ে, এড়িয়ে, সেই যে মস্ত সংগ্রামের বিঘোষণা: 'তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে'। মোহিতলাল মজুমদার-কাজী নজরুল ইসলাম-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তরা পারেননি, রবীন্দ্রনাথের সামীপ্যে, কোথাও-না কোথাও, তাঁরা অর্গলবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুবাবুরা সফল হলেন, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে এলেন তাঁরা, বাংলা কাব্যের নবজন্ম ঘটলো।

বাংলা কবিতা যে সেই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মহত্ত্বের প্রকোষ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল, তার স্বাক্ষর একটি নিটোল সত্যে বিধৃত হয়ে আছে। এক সঙ্গে, একই সময়ে, এতগুলি প্রতিভা পাশাপাশি বিরাজমান—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সমর সেন, সব শেষে, আমি যোগ করবো, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—, কিন্তু বাংলা কাব্য এতটাই ব্যাপ্তিতে ইতিমধ্যে প্রবিষ্ট যে এঁদের কারো সৃষ্টিকর্মই অন্য আরেক জনের সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে না, আলাদা ক'রে চেনা

যায়, আলাদা ক'রে অনুসরণ-অনুকরণ করা যায়। গত তিরিশ বছরের কাব্য-কর্ম সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কারণও কিন্তু এর কাছাকাছি সংস্থান থেকে: বাঙালি কবিদের আর আলাদা ক'রে চেনা যাচ্ছে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, তাঁদের ভাবনা-অনুভাবনা-শৈলীভঙ্গিমুদ্রাদোষ ভীষণভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। এই সমকামী প্রভাব ক্লান্তি উদ্বেগ করে মাত্র; অন্তত আমাদের মতো হয়তো কয়েকজন, যারা বিষ্ণুবাবুর 'কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা'র মুগ্ধতায় এখনো বুঁদ হয়ে আছি, ক্লান্ত বোধ না ক'রে পারি না। এবং সেই ক্লান্তিজনিত খিন্নতা এড়াবার জন্য শেষ পর্যন্ত বারে-বারে ফিরে যাই সে-সমস্ত উপমাহীন পংক্তির আশ্রয়ে: 'তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ', 'দেখি নয়নে ভাস্বর তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর', 'সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই', 'তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া তোমারই ঘাটের গাছে', 'ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে', 'পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে, স্মৃতি আছে তার', 'আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি প্রৌঢ় এই বদ্বীপে মুখর', 'সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল'…। তালিকা তো ফুরোবে না, শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।

অন্য-কয়েকটি আলাপে জড়িয়ে যেতে হয় 'তুমি রবে কি বিদেশিনী' গ্রন্থটি প্রসঙ্গে। প্রায় বলা চলে, পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত, বিষ্ণু দে কৃত অনুবাদকবিতার প্রথম সংকলন, 'হে বিদেশী ফুল'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ 'তুমি রবে কি বিদেশিনী'। ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচির ব্যাপার এটা, আমার তো মনে হয় বিষ্ণুবাবুর নিজের দেওয়া প্রথম নামটি রেখে দিলেই প্রকাশক ভালো করতেন। অন্য পক্ষে, 'তুমি রবে কি বিদেশিনী' এই উচ্চারণে বিশেষ-একটি দ্যোতনা কাজ করছে, সেদিক থেকে বিচার করলে, কে জানে, হয়তো প্রকাশক মশায়ই জিতে যাবেন। বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসাহে বিষ্ণুবাবুর কৃত প্রায় সমস্ত অনুবাদ-কবিতা এই বইয়ে জায়গা খুঁজে পেয়েছে। প্রাচীন চৈনিক থেকে শুরু ক'রে মাও ৎসে তুং, হো চি মিন, তারই পাশাপাশি বদলেয়ার-মালার্মে-র‍্যাঁবো, আপলিনের-এলুআর, আরাগঁ-সেফিরিস, সেই সঙ্গে চসর-স্পেন্‌সর-শেক্‌সপিয়র-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলি-টেনিসন-ব্রাউনিং-হার্ডি, ওয়েন-পাউণ্ড-এলিয়ট-স্পেণ্ডার-অ্যালান ল্যুইস, লোরকা-নেরুদা-আলবের্তি, মাঝখানে হঠাৎ-বেমানান সরোজিনী নাইডু, একটু পেরিয়ে নেক্রাসফ-পাস্টারনক-এরেনবুর্গ, জর্মন কাব্যে পৌঁছে গ্যয়টে-হায়নে-রিলকে-ব্রেশ্‌ট, তারও পরে একগুচ্ছ বিভিন্ন সময়ের মার্কিন কবিদের কাব্যানুবাদ, আফ্রিকার একজন-দু'জনের, ল্যাটিন আমেরিকার অন্তত একজনের, এমনকি স্কাণ্ডিনেভীয় ছড়া পর্যন্ত। সুতরাং এই অনুবাদ-সম্ভার থেকে সামগ্রিক কোনো চরিত্র অনুসন্ধান অর্থহীন। এবং, সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য, সত্যি-সত্যি কোনো কবিতাই আর বিদেশিনী থাকেনি। যেহেতু

বিষ্ণু দে-র দ্বারা অনূদিত তারা, প্রায় প্রত্যেকটিই বাংলার আকাশলীন হয়ে গেছে, কবিদের নিজেদের বিশিষ্ট আবেগভাবনাশৈলীর পরিমণ্ডল আপ্লুত ক'রে বিষ্ণু-বাবুর কাব্যাদর্শ একূল-ওকূল অধিকার ক'রে নিয়েছে।

আমার দিক থেকে আনন্দের অবধি নেই। মূল কবিতাগুলির অধিকাংশের সঙ্গে আমার মতো অনেকেরই হয়তো পূর্বপরিচয় আছে, বিষ্ণুবাবুর অনুবাদে তাদের স্বকীয়ত্ব যদি খণ্ডিত হয়েও গিয়ে থাকে, আমরা অন্যমনস্কই থাকবো, বরঞ্চ অনুবাদের ভণিতাতেও যে বিষ্ণুবাবুর কবিকর্মের সঙ্গে ফের মুখোমুখি হওয়া যাচ্ছে, সেই সৌভাগ্যে বিকচিত হবো। যেমন ধরুন পিএর র‍ঁসারের একটি সনেটের অনুবাদ, যা নিচে আমি পুরো তুলে দিচ্ছি :

> যখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হবে তুমি, শাঁখের বাতিতে
> নক্সি-কাঁথা বুনে যাবে আনমনে, আসীন
> গুঞ্জরি আমারই গান, বলবে, 'হায় রে সেই দিন
> যখন বয়স ছিল, র‍ঁসার গাইত আরতিতে !'
> আমার সঙ্গিনী যত শোনামাত্র এই কথাটিতে
> অকৃত কর্তব্য ভুলে যাবে, হবে ক্লান্তিও বিলীন,
> উঠবে চকিত হয়ে, পুণ্যবতী তুমি মৃত্যুহীন
> প্রাতঃস্মরণীয়া ব'লে পূজা দেবে তোমায় ভক্তিতে।
>
> সে-সময়ে মৃত্তিকার নীচে আমি নিদ্রার সন্তাপে,
> করবীর পত্রছায়ে আমি শুধু ছায়া একখানি,
> ওদিকে তখন তুমি, দীপালোকে জরতী বড়ায়ী
> তোমার যৌবনগর্ব ভাবো মনে স্মৃতির বিলাপে—
> বরঞ্চ ভালোই বেসো, এখনও সময় আছে জানি,
> বর্তমান আজও হাতে, এসো তুলি গোলাপ ছড়াই।

('তুমি রবে কি বিদেশিনী,' পৃ ৩:)

একমাত্র চতুর্থ পংক্তিতে 'র‍ঁসার' এই স্বনাম-উল্লেখ কুলজী চিনিয়ে দেয়, নইলে ভঙ্গি-উৎপ্রেক্ষা সব-কিছুই বিষ্ণুবাবুর কাব্য, 'করবীর পত্রছায়ে' পর্যন্ত। কাকে সার্থক অনুবাদ বলবো তা হ'লে? বিশেষ-এক ভাষার কুহক, বিশেষ-এক পরিষঙ্গের আবেগ, বিশেষ-এক সময়ের প্রবণতা অন্য ভাষার মধ্যবর্তিতায় ছেঁকে-ধরার সামাজিক প্রয়োজনগুলি আমাদের বুদ্ধির অগম্য নয়। কিন্তু যিনি অনুবাদে নিজেকে নিযুক্ত করছেন, কী ক'রে এটা ভুলি তিনিও সামাজিক মানুষ। তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনায় উহ্য রাখা অবাস্তব। তাঁর স্বাধিকার-চেতনাকে সম্মান জানাতেই হয়। আমরা তো আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি না যে অনুবাদক নিছক দোভাষীর ভূমিকা পালন ক'রে যাবেন, বাড়তি কিছু করতে

গেলেই তাঁকে বধ্যভূমির দিকে প্রস্থানের নির্দেশ দেওয়া হবে। কোনো-একটি আকাশের অবয়বকে অনুবাদকের পছন্দ হয়েছে, এক হিশেবে যাকে অবয়ব বলা হচ্ছে তা বিমূর্ত, কারণ আমাদের ভাষার মালঞ্চে তার পরিচয় মেলানো যায় না। সুতরাং অনুবাদক একটু ব্যাপ্তি নিজের জন্য রচনা ক'রে নিয়েছেন। যা আপাত-বিমূর্ত, তাকে তো নিজের মতো ক'রে তিনি রূপবদ্ধ করতে পারেন. অনুবাদের মধ্যেও যে-'কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা'র আসা-যাওয়া. তা ঈষৎ সার্থকতায় সাক্ষাৎ পেয়ে তৃপ্ত হ'তে পারে তা হ'লে।

'তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল, প্রিয়ে, ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী' : একটি অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত ছিল—এবং আছে – বিষ্ণুবাবুর এই কবিতায়। অনুবাদের রহস্যেও কি, অনেকটা সেরকম, পুষ্প ও পুষ্পবাহিকার পারস্পরিক সম্পর্ক তথা উপস্থিতি এক হয়ে যায় না? যদি সব ক্ষেত্রে না-ও হয়ে যায়, বিষ্ণুবাবুর এতগুলি অনুবাদের মুখোমুখি হয়ে, আমি অন্তত, এই বিচারে পৌঁছুচ্ছি, হয়তো হওয়া উচিত। প্রাচীন চীনের পৃথিবীতে আমাদের কোনোদিন অনুপ্রবেশ ঘটবে না; আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার ঘটনাসম্পাত আমাদের কাছে ইতিহাসগ্রন্থের অথবা সংবাদপত্রের উপজীব্য হয়েই থাকবে। যে-অসংখ্য বিদেশী কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাদের আলোড়নে, না মেনে উপায় কী, এক ধরনের পরোক্ষতা উপস্থিত। তাদের নির্যাস থেকে আমাদের প্রেম-আনন্দ-প্রেরণা আহরণ প্রয়োজন, কিন্তু অনুবাদের ভিতর দিয়ে তাদের আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া একেশ্বরবাদী না-ও হ'তে পারে। 'তুমি রবে কি বিদেশিনী' থেকে তাই অন্তত দু'টো লাভ আমি তাৎক্ষণিক বিচারেই উচ্চারণ করতে পারি। বিষ্ণুবাবুর কাব্যের গহনে অনেকটা বিস্তার জুড়ে ডুবে থাকার আরেকটি সুযোগ উপস্থাপিত হলো আমাদের কাছে। সেই সঙ্গে. যেহেতু অনুবাদের বিশেষ এক প্রাকরণিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে, তা নিয়ে আলোচনা প্রচুর চলবে, যে-আলোচনার উপযোগিতা অনুপেক্ষণীয়।

দু'টি বইয়েরই ভবিষ্যতে সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হ'তে থাকবে। প্রকাশকসংস্থাকে সবিনয়ে বলবো, বিষ্ণুবাবুর কাব্যকীর্তির প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা কিন্তু প্রকাশনাব্যবস্থায় স্ফুট হয়নি, বিশেষ ক'রে 'তুমি রবে কি বিদেশিনী'-তে মুদ্রণ-প্রমাদের আধিক্য মনখারাপ করে, বইটির উল্লিখিত মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরো বেশি ক'রে করে।

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা, পঞ্চম সংস্করণ। নাভানা, কলকাতা। ৩০.০০ টাকা।
তুমি রবে কি বিদেশিনী। বিষ্ণু দে-কৃত বিদেশী কবিতার অনুবাদসংগ্রহ। নাভানা, কলকাতা। ৫০.০০ টাকা।

পৌঁছুতে চাই এক পরিবৃত্তে

রবীন্দ্রনাথের শত-সহস্র গানের চরণ আমাদের জীবনচেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশে আছে, আমরা যে আলোড়িত হয়েছি এমনকি নিজেদের কাছে তা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করতে হ'লেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হ'তে হয় আমাদের। এই শত-সহস্র পংক্তির মধ্যেও বিশেষ একটি আমাকে অহরহ তাড়া ক'রে ফেরে। 'তখন তারই আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়': এখানে যা বলা হয়েছে, তা যেন সমস্ত বচনীয়কে এক সঙ্গে গ্রন্থিত করে, মধুরতার সঙ্গে গভীরতার ঘন সন্নিবেশ, আমাদের পার্থিব বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের নিহিত অভিলক্ষ্য প্রত্যয়ের স্থির-বিন্দুতে পৌঁছে থরোথরো কাঁপছে। দু'হাতে ঠেলে, দু'পায়ে ক্লান্তির-হতাশার জড়তাকে অতিক্রম ক'রে আমরা এগোচ্ছি, আমরা পৌঁছুতে চাই এমন এক পরি-বৃত্তে যেখানে 'আকাশ ভরে ভালোবাসায়'। দিনযাপনের খিন্নতার ফাঁকে-ফাঁকে, উপস্থিত মুহূর্তের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে, আমাদের স্বপ্ন অমরাবতীর সেই রুদ্ধশ্বাস প্রাঙ্গণ, যেখানে 'আকাশ ভরে ভালোবাসায়'।

কী সেই ভালোবাসার সংজ্ঞা, তা নিয়ে সভ্যতার প্রথম সোপান থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত মানুষের পারস্পরিক প্রশ্ন-কানাকানির অন্ত নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান বিভিন্ন হ'তে হয়তো বাধ্য। আমার কাছে অন্তত, যে-ভালোবাসার প্রসঙ্গ সামগ্রিক মার্কসীয় দর্শনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, তার বিকচনের মধ্য দিয়েই মানুষের মহত্তম মুক্তি। ভগ্নাংশিক বিশ্লেষণে মার্কসবাদ ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। শুধু আকাট রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, শুধু নীরক্ত ধনবিজ্ঞান নয়, অবয়বহীন ইতিহাসবিচার নয়, নিছক ব্যাকরণগত দর্শনতত্ত্ব নয়, একপাক্ষিক সমাজচিন্তা নয়, যান্ত্রিক-কপ্‌চে-যাওয়ার মতো নন্দনশাস্ত্রও নয়, মার্কসবাদ এই সমস্ত-কিছুকে জড়িয়ে এক সামগ্রিক ঋদ্ধি, স্তবকে-স্তবকে যুক্তি সাজিয়ে ইতিহাস-দর্শন-সমাজজিজ্ঞাসা-ধনবিজ্ঞান ইত্যাদির সর্বগ্রাহ্য একটি নিয়মাবলীর কথা বলে: মানুষের ভাগ্য মানুষই রচনা করে, মানুষের বিকাশ সংঘবদ্ধ শ্রেণী-বদ্ধ দ্বন্দ্বপরিক্রমার মধ্য দিয়ে, মানুষের যাত্রা শুভ থেকে অমোঘ শুভতরের দিকে, তার প্রব্রজ্যার চরিতার্থলগ্নে যখন মানুষ পৌঁছুবে, অসূয়াহীন আনন্দঘন সাম্য-সুষমানন্দিত এক পরিমণ্ডল তাকে অভ্যর্থনা জানাবে; আকাশ ভালোবাসায় ভরবে, ভালোবাসার সেই মাধুরী তারপর ফুলের মত ঝরবে নিজেকে উজার ক'রে নিয়ে।

আপাতত এক অদ্ভুত অন্ধকার পরিবৃত্ত অবস্থার মধ্যে আমরা আছি, আমাদের

রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় এক ধরনের পরিপক্কতা হয়তো এসেছে, কিন্তু, মাঝে-মাঝে আশঙ্কা হয়, তাৎক্ষণিক পাওনা-গণ্ডা-হিশেব-মেলানোর দল যেন অপেক্ষাকৃত ভারি হচ্ছে, অথচ গভীরে গিয়ে আবেগের সঙ্গে ইতিহাসচেতনা-বিজ্ঞানচেতনাকে মিলিয়ে নেওয়ার উৎসাহ যেন ক্রমশ নির্বাপিত. এবং সম্ভবত সেই কারণেই, আদর্শে পাগল হয়ে ত্যাগের বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার উত্তাল-দুর্দম বাহিনীও ক্ষীয়মাণ। তোতা পাখির বুলি প্রচুর আওড়ানো হচ্ছে, কিন্তু উপলব্ধির ব্যাপ্তি অপরিসর। বাইরের অভিজ্ঞতার ঠোক্কর খাচ্ছি আমরা প্রায় প্রত্যেকেই, সামাজিক সংঘর্ষ যত বাড়বে আমাদের অভিজ্ঞতাও তত বেশি ভয়ংকব থেকে ভয়ংকরতর অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাবে, কিন্তু এক হিশেবে দেখতে গেলে অভিজ্ঞতাগুলির অপচয় ঘটছে, যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে অপারগ হচ্ছি আমরা, কারণ যে-জ্ঞানের পলিমাটিতে উপস্থিত জীবনযাপন থেকে চয়িত অভিজ্ঞতার বীজ বপন করতে পারলে সফলতা অপ্রতিরোধ্য, সেই পলিমাটিই আমরা সংগ্রহ করতে অক্ষম হচ্ছি। আমাদের মধ্যবিত্ততামণ্ডিত জীবনে নাস্তিকতার কীটাণু প্রবেশ করেছে, জ্ঞানচর্চায় বাঙালি সমাজে এই মুহূর্তে এক বেপরোয়া অনীহা, এমনি করেই যায় যদি যাক না।

আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে ও পরে, ঋতুর প্রকৃতি অন্যরকম ছিল। পরাধীন দেশে জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত, হয়তো সেই কারণেই জ্ঞানপিপাসার তীব্রতা ছিল উত্তুঙ্গ। মানছি, জানবার-পড়বার-শেখবার আগ্রহ একটি সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম ক'রে যাওয়া সে-সময়ে সম্ভব ছিল না। কারান্তরালে আদর্শবাদী যুবকেরা বছরের-পর-বছর অনিশ্চয়তায় কাটাচ্ছেন, তারই মধ্যে তাঁরা হঠাৎ, আলাদা-আলাদা কিংবা এক সঙ্গে, আলোর রেখা দেখতে পেলেন, অ-আ-ক-খ র মতো ক'রে, পুরোপুরি নিজেদের চেষ্টায়, তাঁরা মার্কসচর্চায় হাতেখড়ি ঘটালেন, একটু-একটু ক'রে নিজেরা শিখলেন, পরস্পরকে শেখালেন। সংঘ ছাড়া গতি নেই, এবং সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে হ'লে তাঁদের কাছেও পৌছে দিতে হবে মার্কসবাদের সারাৎসার, কারান্তরাল থেকেই মহা উৎসাহে রাজবন্দীদের মধ্যে কেউ-কেউ তাই প্রয়োজনানুগ পুঁথি রচনা করতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

সরোজ আচার্য মশাই ছিলেন এবংবিধ এক মহামহিম পূর্বসূরী। বাংলা ভাষায় মার্কসীয় চর্চা তাঁর মতো গুটিকয় মানুষ শুরু করেছিলেন বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকগুলিতে, কখনো কারাভ্যন্তর থেকে, কখনো কারাগার থেকে সদ্য বেরিয়ে এসে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে, কখনো হয়তো বা সাংবাদিকতা বৃত্তির আড়ালে, ক্বচিৎ-কখনো অধ্যাপনার সুযোগ ব্যবহার ক'রে। মানুষ হিশেবে সরোজ আচার্য তুলনাহীন, পরিস্বচ্ছ বিনয় দিয়ে নিজের জ্ঞানকে আড়াল ক'রে রাখতেন, ব্যক্তিসত্তা ছাপিয়ে সামাজিক সত্তাকে সম্মান জানাবার

তাগিদে নিজেকে তিনি নিঃশেষ ক'রে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় মার্কসীয় দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করবার সামাজিক প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি; সোজা সরল ভাষায়, যুক্তির সোপান ধ'রে-ধ'রে তত্ত্বকথা প্রাঞ্জল ক'রে বোঝানো সম্ভব, এই ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পর-পর কয়েকটি বই ও বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সেই যুগে। সে-সমস্ত রচনা জিজ্ঞাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল, তখন যাঁরা অজিজ্ঞাসু, তাঁদের আকর্ষণ করার মত জাদুও সেই লেখাগুলিতে ছিল। কিন্তু কাল অতি চঞ্চল, এবং ঐতিহ্যে আমাদের আগ্রহ তথা শ্রদ্ধা ক্রমশ ক'মে আসছে। সে-সমস্ত রচনা তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে, এতদিন, প্রায় অপ্রাপ্য ছিল। এই এতগুলি বছরের ব্যবধানে পার্ল পাবলিশার্স তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন; তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন। 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে সরোজ আচার্যের তখনকার-দিনে-বহুখ্যাত দু'টি গ্রন্থ —'মার্কসীয় দর্শন' ও 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান'—সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাড়িয়ে বলার কোনো অবকাশ নেই, মার্কসীয় তত্ত্ব নিয়ে অজস্র ইতস্তত এলোমেলো লেখা মধ্যবর্তী দশকগুলিতে পশ্চিম বাংলায় অবশ্যই প্রকাশিত হয়েছে, সে-সব কোনো রচনাই সরোজবাবুর প্রণীত গ্রন্থ দু'টির উৎকর্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। সাম্প্রতিক মার্কসীয় শাস্ত্রালোচনায় প্রচুর বিদেশী নাম ও বইয়ের খই ছিটোনো থাকে, অপ্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতার পরিচয় থাকে, বাক্যের-বাচনভঙ্গির চতুরালি থাকে, কিন্তু যদি সূত্রকথা জানতে চাই, আমি 'মার্কসীয় দর্শন' ও 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞানে'ই প্রত্যাবর্তন করবো। পাণ্ডিত্য আছে, পণ্ডিতিয়ানা নেই, এ ধরনের বিরল সৌভাগ্য তো হালে প্রকাশিত কোনো তাত্ত্বিক বই ঘেঁটে আর অর্জন সম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, 'সরোজ আচার্য রচনাবলীর'-র এই খণ্ড প্রকাশের উপলক্ষে, উভয় গ্রন্থের জন্যই আলাদা ক'রে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন; ব্যক্তি সরোজ আচার্য ও তাঁর কৃতিকর্মের নিটোল পরিচয়পূর্ণ ভূমিকা দু'টি। আশা ক'রে থাকবো, পরবর্তী খণ্ডে সরোজবাবুর নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পবিষয়ক রচনাগুলি গ্রন্থিত করা সম্ভব হবে। আরো আশা ক'রে থাকবো, কালের গতি যেমনই হোক না কেন, সেই গতিকে সামাজিক স্বার্থে অনু-শাসনযুক্ত করাও যেহেতু সমান কর্তব্য, মার্কসবাদী মহলে সরোজবাবুর গ্রন্থাবলী পাঠ তথা আলোচনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে, অন্তত কিছু-কিছু মার্কসবাদী মহলে। আশা কুহকিনী হ'তে পারে, কিন্তু আশার নির্ভর ছাড়া ইতিহাসের তো এগিয়ে যাওয়ার জন্য তেমন-কোনো উপায় নেই।

তবে মনে হয় আমাদের তুলনায় অপর বাংলায়, অর্থাৎ সরকারি সংজ্ঞায় যা বাংলাদেশ, সেখানে ভাষাচর্চার সঙ্গে আদর্শাশ্রয়ী বিষয়চর্চার অন্বিত উদ্যোগ অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। একটি বড়ো কারণ নিশ্চয়ই মাতৃভাষার প্রতি

মমতাবোধ ওখানে বহুগুণ তীব্রতর ; আমাদের কাছে যা সামাজিকতা, বাংলা দেশের মানুষের কাছে তা সংগ্রাম-ক'রে-জয়-ক'রে-আনা ধন। ভাষাকে ঘিরে তাই অনেক বেশি শ্রদ্ধা, অনেক বেশি পরিচর্যা-অভিনিবেশ। দ্বিতীয় প্রধান কারণ, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনো প্রাথমিক বিকাশের স্তর অতিক্রমরত ; কতিপয় মৌল অভিমান-আদর্শ এখনো এই শ্রেণীভুক্তদের নাড়া দেয়, নাস্তিকতা কিংবা নিরাবরণ বৈশ্যবৃত্তিতে পৌঁছুতে এখনো তাঁদের কিছু সময় লাগবে। মার্কসবাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবীক্ষণে জানবার যে-প্রেরণা আজ থেকে বেশ কয়েক দশক আগে কলকাতাকেন্দ্রিক পরিপার্শ্বে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, অনুরূপ প্রেরণার ঢেউ বাংলাদেশে বর্তমান মুহূর্তেও যথেষ্ট বহমান। বদরুদ্দীন উমরের সাম্প্রতিকতম প্রবন্ধসংগ্রহ, 'মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি', ভাষার প্রসাদগুণের সঙ্গে কী অনায়াস সাচ্ছল্যে সমাজচিন্তার তীক্ষ্ণতাকে মেলানো সম্ভব, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্পষ্ট বোঝা যায় ভাষা সামাজিক আন্দোলনের অতি-অভ্যস্ত তূণে পরিণত হয়েছে, সমাজজিজ্ঞাসা-সামাজিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদির তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণ ভাষাব্যবহারের সামাজিক বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে, বাংলাদেশে অন্তত, আর সম্ভব নয়, শ্রেণী সমস্যা ও ভাষা সমস্যা একাকার হয়ে গেছে। বদরুদ্দীন উমর বরাবরই অকুতোভয় পুরুষ। বহু আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে গেছেন, কোনোদিনই রেখে-ঢেকে তাঁর মতামত বলার অভ্যাস করেননি। বিশেষ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'ভাষা, শ্রেণী ও সমাজ' প্রবন্ধটির প্রতি : পশ্চিম বাংলার সমাজসচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীরাও, আমার গভীর বিশ্বাস, প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে বিশেষ উপকৃত হবেন, বীক্ষণের সঙ্গে কর্মযোগের সংশ্লেষণ-সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো রচনার কথা চট্ ক'রে মনে আনতে পারছি না। ভাষার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উমরের মার্কসীয় বেদ থেকে আহৃত লোকপ্রেম, যার উপান্তে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই অধরালোক, যেখানে 'আকাশ ভরে ভালোবাসায়'।

সবশেষে উল্লেখ করবো ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত আবু মাহমুদের 'মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা'। আবু মাহমুদ অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক, বদরুদ্দীন উমরের মতো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধকূপেও আর শান্তি নেই, জীবনানন্দীয় বিপন্ন বিস্ময় তার সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে যাচ্ছে, মাতৃভাষায় বিরাট আয়তনে মার্কসের সামগ্রিক মানববীক্ষা লিপিবদ্ধ করতে অধ্যাপক অঙ্গীকৃত। সরোজ আচার্য মশাই যে-তত্ত্বদর্শনকথা পরিমিত পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যক্ত করেছেন, আবু মাহমুদ তা-ই আরো অনেক বড়ো ক'রে, বহুধা টীকা জুড়ে, ব্যাখ্যা করতে নিজের কাছে প্রতিশ্রুত। বদরুদ্দীন উমরের রচনাগত ভাষা-উৎকর্ষ তাঁর নেই, অনেক জায়গায় মনে হয় অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ ইংরেজি থেকে অনূদিত, কোনো-কোনো জায়গায় বিশ্লেষণের অবয়বে মস্ত ছিদ্র চোখে পড়ে, কিন্তু নিহিত নিষ্ঠাকে অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই।

আলোচ্য প্রথম খণ্ডের পর আরো খণ্ড বেরোবে। এই পরিমাপের প্রয়াস, বাংলা ভাষা যেহেতু এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভাষা, হয়তো সেই হেতু সম্ভব হয়েছে, জঙ্গি একনায়কত্ব সত্ত্বেও সম্ভব হয়েছে। ইতিহাস যে তার নিয়ম মেনে এগোবেই, হাতের কাছে সামান্য আরো-একটি প্রমাণ পেয়ে গেলাম আমরা।

'কবিতার মুহূর্ত'

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন জুড়ে তাঁর পাঠকদের সঙ্গে অনেক বিভঙ্গের কৌতুক ক'রে গেছেন। 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে' : এই উক্তিরও হয়তো বহুতর ছদ্ম অর্থ বের করা সম্ভব। কিন্তু কবিতাকেও কি পাওয়া যাবে না তার ইতিহাসের বিশ্লেষণের গহনে? শঙ্খ ঘোষের সদ্যপ্রকাশিত রচনাগুচ্ছ, 'কবিতার মুহূর্ত', সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। যে-কবিতা সম্পূর্ণ নির্মিত অবস্থায় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তার রহস্যের ঘোর কখনোই ঠিক যেন কাটে না। সে কি বাইরে এলো, নির্মোকের উপর আরও নির্মোক জড়িয়ে, পরতের পর পরত, একগুচ্ছ ভাবনা-অনুভাবনাকে আরেক গুচ্ছ ভাবনা-অনুভাবনার শরীরে মিশিয়ে দিয়ে, স্তরের-পর-স্তর সংযোজন ক'রে নিয়ে? না কি প্রক্রিয়াটি উল্টো, কবিতা নির্মোকের পর নির্মোক খসাচ্ছে, পরতের পর পরত নির্মোহ নিষ্ঠায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, চিন্তাকে-ভাবনাকে-আবেগকে আরো, আরো, আরো স্পষ্ট, ব্যক্ত, অনাবৃত ক'রে-ক'রে এগোচ্ছে, তার একমাত্র অভীষ্ট অন্তিম কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছনো? অথবা একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে এটাও কি বলা চলে, কবিতার ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং প্রস্থানের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, আবরণ ও উন্মোচন অভিন্ন ঘটনাক্রম, সন্ধ্যা ও প্রভাতের একই সারাৎসার?

'কবিতার মুহূর্ত' এই প্রশ্নমালার নিটোল উত্তর ঠিক পরিবেশন করে না, কবিতা যে-কুহেলী সেই কিংবদন্তীকে দৃঢ়তর প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করাই, কে জানে, সম্ভবত তার লক্ষ্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কপটভাষণকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নেওয়া যে অসমীচীন এই গ্রন্থের মধ্যবর্তিতায় শঙ্খ ঘোষ তা অন্তত আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের কিছু প্রথাসিদ্ধ ধ্যানধারণাকে অপ্রমাণ করে ব'লেই অতীব বিস্ময়উদ্রেককারী 'কবিতার মুহূর্ত'-এ অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধাবলী। শঙ্খ ঘোষের কবিতার যে-রূপের সঙ্গে আমাদের বহির্পরিচয়, তা তার প্রায়বিমূর্ত পরিশীলা। কাব্যকে কথা বলতেই হবে, কিন্তু কবি যেন ত্রস্ত, তাঁর বচনে কোনো শিথিলতার স্থান নেই, এমন-কোনো বাক্য-বাক্যবন্ধন জায়গা পাবে না যা ন্যূনতম প্রয়োজনের বাইরে স্রেফ অলঙ্করণহেতু, আবেগের পরিমিতিই যে কবিতা তা যেন কারো বুঝতে অসুবিধা না হয়। এমনকি কখনো যখন তাঁর কাব্যে ছন্দের আপাত-চাপল্য চোখে পড়ে, তা-ও যেন কোথায় একটি গাম্ভীর্য বহন ক'রে বেড়াচ্ছে। হাত বাড়িয়ে আমরা কোনো বিশেষ আবেগ বা চিন্তাকে স্পর্শ করতে চাই, একটি প্রচ্ছন্ন বাধার আড়াল এসে দাঁড়ায়, আমরা প্রতিহত হয়ে ফিরি, নিজেদের মনকে

অতঃপর শাসন করি : বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যেতে নেই, কবিতাতে মুগ্ধ হও, আবিষ্ট হও, কবিতার তোড়ে ভেসে যাও ; কিন্তু কবিতাকে ছুঁয়ে-ছেনে দেখার প্রলোভনের ফাঁদে ধরা দিও না, তা কবির প্রতি অসম্মান হবে, মোহানার উন্মাদনায় মগ্ন থাকতে শেখো, উৎসের অনুসন্ধানে কী বাড়তি লাভ তোমার।

'কবিতার মুহূর্ত' প্রমাণ উপস্থাপন করছে, বাড়তি লাভ আছে, যা মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক তা নয়। শঙ্খ ঘোষ তাঁর পঁচিশটি কবিতা বেছে নিয়েছেন, তার পর প্রায় কথকতার মতো ক'রে তাদের জন্মের ইতিহাস শুনিয়েছেন। চমকে উঠি আমরা, এই স্বল্পবাক্ কবি, যিনি কথা ছাঁটতে পছন্দ করেন, অব্যক্তের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করার দিকে যাঁর ঝোঁক, যাঁর কুশলতার স্পষ্টতম সাক্ষ্য আবেগকে ঝেড়ে-পুঁছে সম্পাদনা ক'রে হ্রস্বতম করা, তিনিও আসলে সমাজের সঙ্গে তাঁর সমগ্র কবিসত্তাকে জড়িয়ে নিয়েই জীবন অতিবাহন করেছেন। আমি পৃথিবীর কবি : পাড়া ফাটিয়ে এই ধরনের বিবৃতি তাঁর কাছে প্রয়োজনের বাইরে মনে হয়, কিন্তু, 'কবিতার মুহূর্ত' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সমাজের প্রত্যঙ্গ নিয়ে কবিতা, সমাজের আকুলি-বিকুলি-আর্তনাদ-ক্রোধ-ক্ষোভ-অসহায়তা-বোধ-স্বপ্ন-আনন্দ-উপভোগের অনুকণা থেকে কবিতার জন্ম, সমাজই কবিতার আকার। কখনো একটি ঘটনা (যেমন 'যমুনাবতী'), কখনো একটি ছুঁড়ে দেওয়া বাক্য (যেমন 'ভিড়', 'সরু হয়ে যান, ছোট হয়ে যান'), কখনো একটি পরিস্থিতি (যেমন 'আপাতত শান্তিকল্যাণ'), কখনো খবর-কাগজের শিরোনামসমাস (যেমন 'খবর সাতাশে জুলাই'), সমাজের আর্তির-উদ্‌ভ্রান্তির-সংস্থানের প্রতিভাস হিশেবে মননকে-আবেগকে মোচড় দেয়, বোধকে কুরে-কুরে খেতে থাকে ক'দিন ধ'রে, তার পর হঠাৎ অনায়াস সাহসিকতায় বেরিয়ে আসে কবিতা। দেশভাগ থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশো পঁচিশ বছর তিথিউদ্‌যাপনের মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙালি সমাজসত্তার যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তীর্ণ হবার বিচ্ছিন্ন, অথচ পরম্পরাগ্রন্থিত, কাহিনীর রিক্ততা ঐশ্বর্য-অভিমান উচ্ছলতা-ব্যাপ্তি-সংকীর্ণতা ধরা পড়েছে পঁচিশটি কবিতার ইতিকথায়। এই কবিতাগুলি আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যেকটি আলাদা ক'রে পড়েছি, তাদের উপক্রমণিকা থেকে বিশ্লিষ্ট, একমাত্র কাব্যগুণের নির্ভরে দাঁড়িয়ে তারা তখন নিজেদের উপস্থাপন করেছে। তাদের অন্তঃস্থিত প্রদাহ কিংবা প্রশান্তির সঙ্গে আমাদের যে-পরিচয়, এখন যেহেতু তাদের ইতিহাসব্যাখ্যা আমাদের করতলগত, প্রতিটি ক্ষেত্রে পাল্টে যাবে তা, নতুন অভিব্যক্তির আভায় তারা স্নাত হবে। এ-ব্যাপারে শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় বিতর্কের প্রসঙ্গ অবান্তর, কোনো কবিতাই বিশুদ্ধ নয়, আমরা তাদের উপর বিশুদ্ধতা আরোপ করি আমাদের নিজস্ব সংস্কার-প্রবণতা-ব্যাকরণ-বুদ্ধি অনুযায়ী, মনের ঋতুর সঙ্গে-সঙ্গে তাই কবিতার স্বাদ বদলায়। শঙ্খ ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই আমাদের, বুকে চমক দিয়ে তাঁর কাব্যের টীকাভাষ্যের একটি নতুন দিক ধরিয়ে দিলেন তিনি,

সমাজ সম্পর্কে তাঁর ব্যাকুলতা ও অভিমানের তার চেয়ে বড়ো প্রমাণ কিছু হ'তে পারে না, যেন কবিতাই সমাজকাহিনী, সমাজই কবিতার ধারক। তার মানে এই নয় যে গাণিতিক মাপের হিশেবে সমাজের উৎকণ্ঠা কবিতার কায়া গ্রহণ করবে। কবির নিভৃত একাকিত্বে সমাজজিজ্ঞাসার প্রহার কোন্ বিশেষ বিন্যাসে আঘাত হানবে, কোন্ প্রক্রিয়ার আবর্তে সেই আঘাত একটি বিশেষ কবিতার আদলে নিজেকে উন্মোচিত করবে, তা আগে থেকে গুণে বলা অসম্ভব। বেলেঘাটার মাসিমা, মৃত্যুশয্যাগতা, ছেলে যার কংগ্রেসী অত্যাচারে পাড়াছাড়া, যিনি মৃত্যুর মুহূর্তে রুমালে-বাঁধা সামান্য কয়েকটি টাকা দিয়ে বলেছিলেন অর্ধেকটা ছেলের হাতে দিতে, আর অর্ধেকটা পার্টি ফাণ্ডে, তিনি তো পরোক্ষে একটি উত্তুঙ্গ সুমহৎ কবিতার জন্মদাত্রী ('হাসপাতালে বলির বাজনা'), কিন্তু মৃত্যুমুহূর্ত কী ক'রে জন্মমুহূর্তে রূপান্তরিত হয়, সেই জাদুতে একমাত্র কবিপ্রতিভারই অখণ্ড অধিকার, এবং এই রূপান্তরের ইতিবৃত্ত প্রতিটি কবিতার ক্ষেত্রে আলাদা হ'তে বাধ্য।

'কবিতার মুহূর্ত' অপর একটি সত্যও উদ্‌ঘাটিত করে। গদ্যও কবিতা, অন্তত গদ্যও কবিতা হ'তে পারে সে-গদ্য যদি শুদ্ধতম কোনো কবিসত্তার কন্দর থেকে নিঃসৃত হয়। কবিতা পড়বো, না সেই কবিতার পূর্বপ্রান্তে-সাজানো গৌরচন্দ্রিকা পড়বো, আকর্ষণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, কারণ ইতিকথা-বহন-করা গদ্যে-বিধৃত কাব্যগুণ হ্লাদিনী জিভকে অবিশ্রান্ত লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। পাশাপাশি মিলিয়ে পড়ুন, 'বাবরের প্রার্থনা', ঠিক তার আগে স্তবকে-স্তবকে সাজানো গদ্য: 'শেষ হয়ে আসছে ১৯৭৪ সাল। বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন,...শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তখন তার ফুটে ওঠার বয়স। /মন্থর হয়ে আছে মনটা'। এখানে যে কাব্যোপাখ্যানের শুরু, সে কেন প্রতিযোগিতায় হ'টে যাবে, কেন তাকে আমরা ফুলঝারি দিয়ে অভিনন্দন জানাবো না?

আমার একটি বিশেষ অস্বাস্তির কথা তা হ'লেও নিবেদন করি। গভীর কথা কবি গভীর সুরে বলবেন, না কোনো বিকল্প অনুষঙ্গের আশ্রয় নেবেন, তা নিয়ে কোনো বহির্নির্দেশ চাপানো অনধিকার চর্চা হবে। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ মশাইকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো: যে-ভয়ংকর সব সমস্যায় দীর্ণ-জীর্ণ-বিশীর্ণ হ'তে-হ'তে গেছে বাঙালি সমাজ গত কয়েক দশক ধ'রে, স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের লঘু অবয়ব কি তাদের ভার বইতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্ষম, ভিলানেলের বেপরোয়া ঘোড়সওয়ারগিরি বাঙালি অভিজ্ঞতার সংগোপন নির্যাসকে সত্যিই কি পাহাড়-উপত্যকা-নদী-হ্রদ ডিঙিয়ে পৌঁছে দিতে পারবে আবেগের মহাসমুদ্রে? 'কবিতার মুহূর্ত' পড়তে গিয়ে আমার অন্তত কোনো-কোনো জায়গায় মনে হয়েছে, গদ্য বিজয়ী বীর, কবিতা পরাজিত, কারণ কবিতার প্রকরণে যথাযথ আবেগের ধৃতি নেই।

সংশয় নয়, একটি অকপট আপত্তির কথাও সেই সঙ্গে বলি। 'কবিতার মুহূর্তের

লেখালেখির সঙ্গে সাযুজ্য বিদ্যমান বিবেচনা ক'রেই তিনটি নিবন্ধ গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে। এই ত্রয়ীর অন্যতম, 'প্রবাহিত মনুষ্যত্ব', বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের দুর্জয় কবিত্বতে সন্নত অভিবাদন জানানোর সামাজিক তাগিদে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুরুষালির মতোই রচনাটি নিঃসংকোচ, স্পষ্টভাষী, অকুতোভয়। কিন্তু অন্তিম নিবন্ধটি ('বিশেষণে সবিশেষ') উহ্য থাকলেই যেন ভালো হতো। বিশেষ একটি ব্যক্তি কী সামাজিক কারণে অশ্রদ্ধেয়, তা বোঝাবার প্রয়োজনে নিবন্ধটি রচিত হয়েছিল : এই গ্রন্থে লেখাটির জায়গা ক'রে দিয়ে ঐ অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে বড়ো বেশি সম্মানই যেন জানানো হলো।

কিন্তু, সব শেষে, যে-মন্তব্য যোগ না করলেই নয় : অসাধারণ গ্রন্থ 'কবিতার মুহূর্ত', যা আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করছি।

খেলা আর খেলা

ক্রিকেট খেলা আমাদের ধরিয়ে গিয়েছিলেন ইংরেজ প্রভুরা। এখানেও ধরিয়েছিলেন, যেমন ধরিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ইংরেজীভাষী কৃষ্ণকায়দের জাত্যভিমান জেগে ওঠার ইতিহাসের সঙ্গে এখন ক্রিকেটে দক্ষতা-সফলতার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী মিশে গেছে। আমাদের গোলাম ক'রে রেখেছে, আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, ন্যূনতম মানবাধিকারাদি থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি, আমরা খেটে কালাতিপাত করছি ইক্ষুক্ষেত্রে ও অন্যত্র, কিন্তু সেই শ্রমের ফলে আমাদের অধিকার নেই, শাদা প্রভুরা তা দিয়ে মুনাফার-ঐশ্বর্যের-প্রাচুর্যের-বিলাসের পাহাড় গড়েছেন। ইতিহাসের নিয়মকলা বলে এই দিন যাবে, শোষিত-বঞ্চিত মানুষ আস্তে-আস্তে সমাজচেতনার সঙ্গে নিজেদের অন্বিত করতে শিখবে, তারা তারপর আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজবে, অন্তঃস্থিত প্রতিভা হঠাৎ উপলব্ধি হবে, অবশেষে এক মহান্ কৃতিত্বের সংস্থানে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাছে, পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করবে শোষণকে পরাহত করেছে তারা।

কোনো-না-কোনোভাবে আমরা নিজেদের প্রমাণ করবো, আমাদের যারা গোলাম ক'রে রেখেছে তাদের দেখিয়ে দেবো তাদের চাইতে আমরা কোনো অংশে কম যাই না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এই হৃদয়াভিমান কিন্তু রূপ পেল প্রভুরা-যে-খেলা-ধরিয়ে-দিয়েছিলেন তাকে অবলম্বন ক'রেই। ইংরেজদের ক্রিকেটেই ঘায়েল করবো, যে-খেলা ওরা একদা শিখিয়েছিল সেই খেলাতেই ওদের নাস্তানাবুদ করবো, তাই হবে ইতিহাসের প্রতিশোধ। বস্তিতে-মাঠে-সমুদ্রের উপকূলে ঘুরে বেড়াত যে-ছেলেগুলি, তাদের ক্রিকেট খেলবার সরঞ্জাম-উপকরণ ইত্যাদি ছিল না, কুছ পরোয়া নেই, গাছের ডাল ভেঙে ব্যাট, ছোটো শুকিয়ে-যাওয়া নারকেলের বল, তা দিয়েই অনুশীলন-অধ্যবসায়ের শুরু। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও ক্রিকেটানুরাগ এক সঙ্গে জড়িয়ে গেল, ওরা যে-খেলা আমাদের শিখিয়ে গেছে সেই খেলাতেই ওদের নাক ঘ'ষে দেবো, লিয়ারি কনস্টানটিন ও জর্জ হেডলিকে নিয়ে, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, যে-স্বপ্নের বুনন শুরু হয়েছিল, আস্তে-আস্তে তা বাস্তবের পরিপূর্ণতা পেল। ক্যারিবিয়ানের ইংরেজীভাষী দেশগুলি এখন স্বাধীন, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতায় তৃপ্তি ছাপিয়ে সেখানে অন্য-একটি পরম সফলতার আস্বাদও: আমাদের রিচার্ডস, আমাদের লয়েড, আমাদের মার্শালের ভয়ে একদা-প্রভুরা এখন জড়োসড়ো, মাঝে-মাঝে প্রভুদের দেশে গিয়ে

ওদের গো-হারা হারিয়ে দিয়ে আসি আমরা। ওরাও যখন পাল্টাপাল্টি আমাদের এখানে খেলতে আসে, তখন আরেক-দফা যুগের-পর-যুগ ধ'রে সঞ্চিত অপমানের শোধ নিই পাঁচদিনের টেস্টেই হোক, কিংবা একদিনের প্রতি-যোগিতায়ই হোক, ওদের তুলোধোনা করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খুদে-খুদে দেশগুলি যদিও রাজনৈতিক দিক থেকে এখন আলাদা, প্রত্যেকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য, তাদের পারস্পরিক ভৌগোলিক দূরত্বও ঠিক ফেলনা নয়, তা হ'লেও ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু নিজেদের তারা ভাগ হ'তে দেয়নি। আমার সন্দেহ, অন্তত ক্রিকেটের মাঠে সাংগঠনিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার সিদ্ধান্তেও একই মানসিকতা কাজ করছে: যদি আমরা আলাদা-আলাদা দল গঠন করি, শাদা চামড়াদের হয়তো তা হ'লে হারাতে পারবো না, তা তো হ'তে দেওয়া যায় না, ক্রিকেটে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতেই হবে যে-ক'রেই হোক, অতএব অন্যত্র আমরা বিভক্ত হ'তে পারি, কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের অখণ্ডতা অব্যাহত থাকবেই, তা না হ'লে ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা ফের সুযোগ পেয়ে যাবে।

আমাদের নিজেদের ইতিহাস অবশ্য একটু অন্য খাতে বয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মুহূর্তে খেলার মাঠে ক্রিকেট ধ্যান-জ্ঞান-প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়নি, সেই স্থান অধিকার করেছিল ফুটবল। ফুটবল সরঞ্জামনির্ভর খেলা নয়, মাত্র একটি বর্তুলাকার উপকরণ হ'লেই হলো, গ্রামে-গঞ্জে অচিরে ছড়িয়ে পড়লো সেই খেলা। ফুটবলের আন্তর্জাতিক মান সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধ্যান-ধারণা ছিল না, ভারতবর্ষের লক্ষ-লক্ষ নিস্তেজ-নিষ্প্রদীপ অভুক্ত-অস্বাস্থ্যতাচ্ছন্ন-মানুষে-ঠাসা গ্রামে বাইরের পৃথিবীর প্রয়োজনও ছিল সেই অবস্থায় প্রায় শূন্য, পরিবেশের বর্ণনা করতে গেলে রূপকল্প হিশেবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার ক'রে বলতে হয় 'ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র সুখ'। সেই ছোটো-ছোটো জাত্যভিমান-ঘেরা আশা ব্যক্ত হয়েছিল ফুটবলে ঘরোয়া কৃতিত্বের মারফৎ, মোহনবাগান দল কোথায় কীভাবে গোরা দলকে হারালো, খালি পায়ে আমাদের ছেলেরা কী ভেল্‌কিই দেখালো বুট-পরা লালমুখোদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইতে যে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট পর্যন্ত তারিফ না ক'রে পারলো না। বাঘা-বাঘা সব নাম, আমাদের শিশুদের কাছে আশ্চর্যের জাদু-ছুঁইয়ে-যাওয়া: গোষ্ঠ পাল-মন্মথ দত্ত-বলাই চাটুজ্যে-উমাপতি কুমার-সামাদ। আর জানেন, সেই সেবার করুণা ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্বে আমাদের ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া না কোথায় খেলতে গিয়েছিল, রাইট আউটে বেঁটে-খাটো প্রসাদের ক্ষিপ্রতা দেখে সাহেবরা মুগ্ধ, আদর ক'রে তার নাম দিয়েছিল 'মিকি মাউস'। গ্রামের মাঠে, পুকুরপাড়ে, গঞ্জের দোকানে, শহর-পাড়ার রকে যে-সব গল্প হতো, সেগুলি প্রধানত ফুটবলকে ঘিরে, স্বাদেশিকতা ও ফুটবল সমার্থক হয়ে গিয়েছিল, তুলনায় ক্রিকেট, মানে ব্যাটবল খেলা, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পয়সাওলা লোকদের খেলা ক্রিকেট, হ্যানো-ত্যানো

অনেক কিছু চাই, ব্যাট, বল, উইকেট, প্যাড, স্কোর বই; ওসব ঘোড়ারোগে দরকার নেই আমাদের।

তবে ইংরেজ-আশ্রিত বড়লোকেরা তো ছিলেনই, সুতরাং ক্রিকেটের পত্তন হয়েই ছিল যথানিয়মে, প্রধানত নেটিভ রাজরাজড়াদের, নয়তো জমিদারদের, পৃষ্ঠ-পোষকতায়। নবনগরের জামসাহেবরা মস্ত জমকালো দল গড়েছিলেন, সেই পরিবার থেকে বেরিয়েছিলেন রঞ্জিত সিংজী-দলীপ সিংজী-অমর সিং; পাতিয়ালার মহারাজার দল, যে-দলে খেলতেন উজির আলি-নাজির আলি বিখ্যাত এই দুই ভাই, মহম্মদ নিসারও; হোলকাররা পুষতেন সি কে নাইডু-সি এস নাইডু-মুস্তাক আলিদের। তা ছাড়া, বিজয়নগরমের মহারাজকুমার, কুশলতার ছিটেফোঁটাও নেই, দলেই পড়তে পারেন না যোগ্যতার বিচারে, কিন্তু তাতে কী, তাতে কী, সাম্রাজ্যবাদের প্রচ্ছায়ায় সামন্ততন্ত্র তখনও পরমবিক্রমে বহাল, বিলেতে সফর করতে যাবে ভারতীয় দল, তিনি বাঁধা দলপতি। বড়োলোকেরা এবং বড়োলোক-আশ্রিতেরা, প্রধানত ক্রিকেট খেলতেন ইংরেজ আমলে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কেউ-কেউ মাঠে গিয়ে কমলালেবুর কোয়া অথবা চীনেবাদামের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে অলস রোদ্দুরের মোহ-মাখানো মন্থর শীতের দুপুরে সেই খেলা মাঝে-মধ্যে দেখতে যেতেন।

জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা ক্রিকেটকে কখনোই আচ্ছন্ন ক'রে আসেনি, যেমনটি হয়েছিল ফুটবলের বেলায়। তবে সাবধানের মার নেই, ইংরেজরা সাম্রাজ্য-শাসনের অন্ধিসন্ধি জানতো, ভাগ করো আর ছড়ি ঘোরাও, ক্রিকেট থেকে আশঙ্কা কম, তা হ'লেও ওসব জাতীয়তাবোধটোধের ব্যাপারে আগে থেকে তৈরি থাকা ভালো। ছক কেটে তাই পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা চালু করা হলো; ইওরোপীয়, হিন্দু, মুসলিম, পার্সি ও অবশিষ্ট, এই পাঁচ-পাঁচটি দলে ভাগ ক'রে দেওয়া হলো ক্রিকেট খেলোয়াড়দের। এমনি ক'রে প্রভু আমায় মারো, আরো মারো: হিন্দু দলের সঙ্গে মুসলিম দলের খেলা, হিন্দু দলের অধিনায়ক সি কে নাইডু, মুসলিম দলে তাঁর অপত্যস্নেহে পালিত মুস্তাক আলি, কিন্তু হ'লে কী হবে, এক মুসলমান আম্পায়ারের নাকি এত বড় স্পর্ধা, সি কে নিজে বলেছেন, তিনি ব্যাটে বল ঠেকিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে এল বি ডব্লু আউট দেওয়া হয়েছে। খেলার মাঠ ছাপিয়ে খবরকাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মারদাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক হুংকার, আড়ালে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর মুচকি হাসা।

এসব ছুটকো-ছাটকা ঘটনাবলী ঠিক তুচ্ছ করবার নয়, তা হ'লেও আমাদের দেশে ক্রিকেটটা জমেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী অধ্যায়েই। তার অনেকগুলি কারণ হাৎড়ে বের করা যায়। ইংরেজরা যদিও প্রস্থান করেছেন, ইংরেজমনা ব্যক্তিদের প্রভাব দেশের প্রশাসনে-সমাজব্যবস্থায় গত চল্লিশ বছরে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে-শাসককুল অপসৃত হলেন, তাঁদের সংস্কৃতি, আচারকলা ইত্যাদি অনুকরণ-

অনুসরণের আগ্রহ ভারতীয় সমাজের পয়সাওলা মানুষদের মধ্যে প্রায় নেশার রূপ নিয়েছে। উচ্চবিত্তরা সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা তো তাঁদেরই হাতে, তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ সমাজের সর্বত্র প্রভাব না ফেলে পারে না। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তেরাও এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় উপরতলার মানুষদের, প্রায় প্রাণের দায়ে, নকল করতে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হন, রেডিও-টেলিভিশনের মোহিনীমায়া এড়ানো প্রায় অসম্ভব। দশ হাজার মাইল দূরের ক্যারিবিয়ান থেকে প্রেরণা ঈষৎ প্রবাহিত হবার সম্ভাবনাও পুরোপুরি অস্বীকার করি কী ক'রে? হয়তো অন্য-একটি মানসিকতাও সামান্য কাজ করছে। অন্য কোনো খেলায় আমরা কলকে পাচ্ছি না, বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দল, পাঠিয়ে হাস্যাস্পদ হচ্ছি, অন্তত ক্রিকেটে তা-ও কখনো-সখনো একটা-দু'টো খেলা জিতি আমরা, অতএব এই খেলাকে ধ'রেই ঝুলে পড়া যাক। আরো বেশি-বেশি দেশ যদি একবার কোমর বেঁধে ক্রিকেট খেলা শুরু করে, তা হ'লে ক্রিকেটেও আমাদের ফোঁপরদালালির দিন শেষ হবে, সেই চিন্তা এখনো আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে আনেনি। একটু-একটু ক'রে বিজাতীয় ক্রিকেট ভারতীয়দের ধাতে ঢুকে গেছে। তবে আঞ্চলিক উচ্চাবচ্চতা এখনো যথেষ্ট। ক্রিকেট নিয়ে বরাবরই পশ্চিমাঞ্চলে যে-উৎসাহ, আমাদের বাংলা দেশে তা অনেকাংশে নিষ্প্রভ। অথবা হয়তো, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তদের মধ্যে উৎসাহের অভাব নেই, কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে স্বভাবপ্রতিভার কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। স্বাধীনতা-পূর্ব পর্বে সরকারি টেস্ট দলে কদাচ এমনকি একজন বাঙালিরও জায়গা হয়নি। অধ্যক্ষ সারদা রায়ের সময় থেকে শুরু ক'রে, হেমাঙ্গ বসুদের অধ্যায় পেরিয়ে, কার্তিক বসু-গণেশ বসুরা চেষ্টা কম করেননি, কিন্তু কোথায় যেন শূন্যতা থেকে গেছে। ক্ষণস্থায়ী ঋতুতে বাঙালিরা তাই শ্যামবাজার ইউনাইটেডের শুটে বাঁড়ুয্যেকে নিয়ে শোরগোল তুলেছে—সেই যে ১৯৪৬ সালের সফরে সারবাতের সহযোগিতায় সারের বিরুদ্ধে দশম উইকেটে বিশ্বরেকর্ড—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এবং খোকন সেন-পঙ্কজ রায় অনুচ্ছেদান্তে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের দীর্ঘ সময়ে কোনো বাঙালিরই ভারতীয় ক্রিকেট দলে বাঁধা জায়গা হয়নি।

স্বাভাবিক কারণেই বাংলা সাহিত্যেও ক্রিকেট তাই তেমন কোনো ছায়া ফেলেনি। খেলাধুলোর প্রসঙ্গে যখন প্রধানত কিশোর সাহিত্যেরই উল্লেখ করতে হয়, সেই 'সন্দেশ' যুগ থেকে শুরু ক'রে কিশোর পত্রপত্রিকা ঘেঁটে দেখুন, যে-সমস্ত গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে পেড়ে-পড়ে দেখুন, ক্রিকেটের বিশেষ নাম-গন্ধ নেই, হয়তো ক্বচিৎ-কোথাও বুদ্ধদেব বসুর কোনো গল্প, নয়তো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা অন্য কারো একটি-দু'টি ছড়া, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু একেবারে হালে, সামাজিক আচারকলার ঋতুপরিবর্তন হেতুই, একটু অন্যরকম হচ্ছে, আস্তে-ধীরে ক্রিকেট বাংলা সাহিত্যের শরীরে অনুপ্রবেশ করছে। এটা ঘটছে প্রায় একজনের

একক চেষ্টায়। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সব্যসাচী পুরুষ, পেশায় তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, কিন্তু তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী চলচ্চিত্র থেকে ভারতীয় ক্রিকেটের নাড়িনক্ষত্রের ইতিহাস পর্যন্ত। নিজে খেলোয়াড় না হয়েও ক্রিকেটে তদ্গতপ্রাণ: অন্য সমস্ত কর্তব্য বিসর্জন না দিয়েও ভূরি-ভূরি বই লিখে যাচ্ছেন ক্রিকেট নিয়ে, প্রবন্ধ-গল্প-ছড়া কিছুই বাদ যাচ্ছে না। বিশেষ ক'রে ক্রিকেট নিয়ে তাঁর গল্পগুলি আমাকে ফের শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে যেতে ভীষণ প্রলুব্ধ করে। বইয়ের নামগুলিই কেমন মনোমুগ্ধকারী: 'খেল সমাচার', 'দুর্জয় সফর', 'স্কোয়ার কাট', 'ওভার বাউণ্ডারি', ফুসফুস ভ'রে ক্রিকেটের আঘ্রাণ নিচ্ছি যেন। মানবেন্দ্রের গল্পগুলির জাদু হলো প্রত্যেকটি ঘরোয়া পরিমণ্ডলের কাহিনী, চরিত্রগুলির মধ্যে আমাদের সংসারের ছেলে-মেয়েদের যথাযথ চিনতে পারছি, তাদের ঘিরে ক্রিকেটের রোমাঞ্চ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিছুটা বিবাদ কিছুটা আনন্দ, কখনো হতাশা, কখনো সাফল্যে জ্ব'লে-ওঠা, সব-কিছু যা বাস্তবে ঘ'টে থাকে, মেশানো উপলব্ধি, মেশানো অভিজ্ঞতা, ক্রিকেটের গল্প, কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত, ক্বচিৎ-কখনো উচ্চমধ্যবিত্ত, সমাজের গল্পও।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ ক্রিকেটকাহিনী অবশ্য আমাকে আরো অনেক বেশি মাত ক'রে দিয়েছে। ক্রিকেট খেলতে তেমন পটু হইনি আমরা এখনো, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন দেখবার অধিকার তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মানবেন্দ্র তাঁর এই গল্পে সেই স্বপ্ন দেখবার সাহস দেখিয়েছেন, আমাদের সবাইকে সেই স্বপ্নের ভাগীদার হবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভাবতে পারেন, তাঁর এই রোমাঞ্চকর গল্পে, ভারতীয় টেস্ট দলে, একজন নয়, দু'-দু'জন বাঙালির সমাবেশ, তাঁদের মধ্যে একজন, পবন দাশ, তুখোড়তম ব্যাটসম্যান, এবং সেই সঙ্গে, বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি নিশ্চয়ই ফুলে উঠবে আপনাদের, টেস্ট দলের ক্যাপ্টেনও, অন্য জন, অভীক চ্যাটার্জি, দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার, ম্যালকম মার্শালের প্রতিভাকেও ম্লান ক'রে দেওয়ার মতো তার বলের গতি ও ধার। এই স্বপ্নবিলাসিতার প্রেমে ম'জে গিয়ে 'কানামাছি' আমি দু-দু'বার পড়েছি, দ্বিতীয়বার প্রথমবারের চেয়েও বেশি ভালো লেগেছে। তা ছাড়া, মানবেন্দ্রের গল্পে কাহিনীর বুনন নিটোল, আঁটোসাঁটো, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবনের কান্নাহাসির বস্তুনিষ্ঠ ছায়া পড়েছে তাতে। সেই সঙ্গে তাঁর সুতীক্ষ্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনা ক্রিকেটের গল্পকেও অন্যতর স্তরে তুলে নিয়ে যায়। টাকার লোভে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যাওয়ার দিকে যে-খেলোয়াড়রা ঝোঁকেন, তাঁদের ব্যাপারস্যাপার কাহিনীর একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে 'কানামাছি'তে।

জয় হোক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, ক্রিকেট নিয়ে তিনি আরো-আরো অনেক লিখুন। সমাজপরিবর্তনে বিশ্বাস করি ব'লে রোমান্টিক হ'তে আমাদের

বাধা কোথায়, রোমান্টিক ব'লেই তো আমরা সমাজপরিবর্তনের স্বপ্নের প্রেমে ভেসে যাই। আসলে আমাদের যে-কোনো স্বপ্নেরই অবলম্বন প্রয়োজন, সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্ন-দেখার অবলম্বন থেকে তা আলাদা নয়। ক্রিকেটের কল্পকাহিনীর উপর ভর ক'রে মানবেন্দ্র আমাদের সমাজচেতনারই অন্যতর এক স্তরে তুলে নিয়ে যান, তাঁকে তাই অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় কী।